গৃহস্থালী।

(প্রথম ভাগ।)

"চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্।"

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত।

কলিকাতা—১৫৫।১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্ হইতে
ডাক্তার শ্রীহরনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন্,
গ্রেট ইডেন প্রেস
শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৯৩ সাল।

সূচী।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
গার্হস্থ্য	...	১
বর্ষাকালে স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি	...	৪
সূতিকা গৃহ	...	১০
গো-জাতির উদরাময় রোগ	...	১৪
সুবর্ণের অলঙ্কারে রঙ করিবার নিয়ম	...	১৯
মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার নিয়ম	...	২০
আম্রের যোড়কলম বাঁধিবার নিয়ম	...	২২
নাসিকা হইতে হটাৎ রক্তস্রাব	...	২৫
গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর কর্ত্তব্য	...	২৯
গো-জাতির রক্তামাশয়	...	৩৫
দিক্ নির্ণয়	...	৩৮
মুষ্টিযোগ	...	৪১।৮২।১৬৫।২৮৫
কাচ অথবা চিনের পাত্র জুড়িবার উপায়	...	৪২
ছারপোকা মারিবার উপায়	...	৪৪
কৃষি কার্য্যে গৃহস্থগণের দৃষ্টি রাখা উচিত	...	৪৫
গর্ভস্রাব সম্বন্ধে সাবধানতা	...	৪৯
জলমগ্ন	...	৫৭
জুতা ব্রসের কালী ও বস্	...	৬২
ইট প্রস্তুত করিবার নিয়ম	...	৬৭
বেলের গুণ ও রোপণ প্রণালী	...	৭৫
গবাদি পশুর এঁসে ঘা	...	৭৮
বাতাবী লেবুর রোপণ প্রণালী	...	৮৪
চিনি প্রস্তুত	...	৮৯
বিবিধ তত্ত্ব	...	৯১।১৬৮।২৮৮
কৃষি ব্যবহার্য্য-সার	...	৯২

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

গার্হস্থ্য।

"চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্।"

আর্য্য ঋষিগণ চতুর্ব্বিধ আশ্রম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্ব প্রধান। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুবর্গ সাধনের স্থল গৃহস্থাশ্রম। গৃহস্থাশ্রমে সকল প্রকার সাধনা হইতে পারে। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা এই আশ্রমকে অতি আদরের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক গৃহস্থাশ্রমের কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর। বিশেষ পারদর্শী না হইলে এই আশ্রমের উন্নতি সাধন করা অত্যন্ত কঠিন। গৃহস্থের একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সীমা নাই। এই জন্যই কোন বহুদর্শী পণ্ডিত গার্হস্থ্যের সহিত রাজত্বের তুলনা করিয়া গিয়াছেন। অল্প সংখ্যক পরিবারের উপর কর্ত্তৃত্ব গার্হস্থ্য এবং বহু সংখ্যক পরিবারের উপর আধিপত্য করাকে রাজত্ব বলা যায়। সুতরাং এক একটী পরিবারকে এক একটী ক্ষুদ্র রাজত্ব বলিলেও বড় দোষ হয় না। রাজার হস্তে যেরূপ বহু সংখ্যক পরিবারের সুখ দুঃখ—উন্নতি অবনতি নির্ভর করে, সেইরূপ—গৃহের কর্ত্তার প্রতিও তাঁহার অধীনস্থ পরিবারমণ্ডলীর শুভাশুভ নির্ভর করিয়া থাকে। ফলতঃ গৃহস্থের কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর; গৃহের কর্ত্তাকে কথন রাজার ন্যায় কর্ত্তৃত্ব করিতে হয়—কথন ব্যবস্থাপকের ন্যায় ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হয়—কথন বিচারপতির ন্যায় বিচার করিতে হয়—কথন শিক্ষকের ন্যায় শিক্ষাদান করিতে হয়—কথন সুচিকিৎসকের ন্যায় রোগের চিকিৎসা করিতে হয়—কথন দাস দাসীর ন্যায় পীড়িতদিগের সেবা সুশ্রূষা করিতে হয়—কথন ধর্ম্মযাজকের ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ দিতে হয়—কথন ধাত্রীর ন্যায় বালক বালিকাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়—কথন গৃহনির্ম্মাতার ন্যায় গৃহাদি নিম্মাণ করাইতে হয় এবং কথন কৃষকের ন্যায় উধ্যানাদির

কার্য্যে মনোযোগ দিতে হয়। এইরূপে সাংসারিক সমুদায় ব্যাপারে গৃহস্থের অধিকার। তাই বলি গৃহ-কার্য্য—অতিশয় গুরুতর।

গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যেক পরিবারের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার অর্পিত থাকে। যাঁহার প্রতি যে কার্য্যের ভার অর্পিত থাকে, তিনি যদি তাহাতে পারদর্শী এবং কার্য্য-পটু হয়েন—তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রম যে, আনন্দ-ধাম হইয়া উঠে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

গৃহস্থাশ্রম মনুষ্যের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত শিক্ষার স্থল—কার্য্য-ক্ষেত্রে—সুখদুঃখের রঙ্গ-ভূমি এবং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের ক্রীড়া-ক্ষেত্র ; যত প্রকার আশ্রম আছে, তন্মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বপ্রধান। সুতরাং যাহাতে সেই আশ্রমের উন্নতি সাধিত হয়, তাহার চেষ্টা পাওয়া—গৃহ কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করা—গৃহস্থাশ্রমকে জীবনের একমাত্র শান্তি-পূর্ণ আশ্রয় করিবার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক গৃহীর যে, একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার কবিবেন।

গৃহস্থের কার্য্যের সীমা নাই, যে দিকে দৃষ্টি কর—সেই দিকেই গৃহস্থের কার্য্যক্ষেত্র—অনন্ত সংসারের গৃহস্থের অনন্ত কার্য্য বর্ত্তমান। এইজন্য মানব আজীবন কার্য্য করিয়াও গৃহ-কার্য্য শেষ করিতে সমর্থ হয়েন না।

মনুষ্য-লোকে সভ্যতালোক যে পরিমাণে বিকীর্ণ হইতে থাকে—গৃহস্থাশ্রমও যে, সেই পরিমাণে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়—তাহা জগতের ইতিহাসে অতি জলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মনুষ্যগণ আদিম অবস্থায় অত্যন্ত অসভ্য ছিল—পশুদিগের ন্যায় সংসারের সমুদায় কার্য্যে নির্লিপ্ত থাকিয়া—যদৃচ্ছালব্ধ ফল, মূল এবং মৃগয়া-লব্ধ আম মাংস ভক্ষণ করিয়া কোন প্রকারে মানব জীবন প্রতিপালন করিত। সুতরাং সভ্যাবস্থায় সাংসারিক যে সকল সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে—তাহারা সে সকল সুখের ছায়াও স্পর্শ করিতে সমর্থ হইত না। ভক্তি-ভাজন পিতা মাতা, প্রীতি-দায়িনী সহধর্ম্মিণী, স্নেহাকর্ষক পুত্র কন্যা, জীবনের সহায় ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি পরিবারবর্গের অকৃত্রিম সহবাস-জনিত সুখ তাহারা স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারিত না। এক

একটী পরিবারের উন্নতি বা অবনতির উপর যে, এক একটী রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর হইয়া রহিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই কোন একটী সমষ্টি হইয়া থাকে, যদি সেই প্রত্যেক ক্ষুদ্রাংশ নানা প্রকার গুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে সমষ্টিও যে, সেই গুণ-রাশির আধার হইবে, ইহা এক প্রকার জ্যামিতির অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত স্বরূপ। সেইরূপ যখন প্রত্যেক পরিবার-লইয়াই দেশ বা রাজ্য অথবা মানবজাতি, সুতরাং প্রত্যেক পরিবারে যে সকল অসাধারণ গুণগরিমা বা উন্নতির চিহ্ন দেখা যাইবে, তাহাদের সমষ্টিস্বরূপ জাতীয় জীবনেও যে, তাহার পূর্ণভাব প্রকটিত থাকিবে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

স্ত্রী ও পুরুষ লইয়াই গৃহস্থাশ্রম—সুতরাং গৃহের প্রত্যেক কার্য্যের জন্যই যে, উভয়েই সমান দায়ী—তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা প্রায় সর্ব্বদা দেখিয়া থাকি, অনেক অর্ব্বাচীন গৃহস্থের দোষে সোণার সংসার অল্প দিনেব মধ্যেই ছারখার হইয়া থাকে। কেহ কেহ অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়াও সংসার সুখের স্থান করিতে পারেন না, আবার কেহ কেহ দারিদ্র্যা-বস্থায় থাকিয়াও সুব্যবস্থার গুণে গৃহস্থালী সুখেব স্থান করিয়া তুলেন। গৃহস্থালীর উন্নতি শিক্ষা সাপেক্ষ। প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে মনুষ্য কখন কার্য্য-কুশল হইতে পারে না। মনুষ্য জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া থাকে—যে শিক্ষা দ্বারা সেই আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারা যায়—তাহা শিক্ষা করা যে, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই কর্ত্তব্য তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আজ কাল অনেক প্রকার পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকার প্রচার আরম্ভ হইতে দেখা যায়, কিন্তু যাহাতে গৃহস্থালীর প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে, এরূপ পত্রিকাদির সম্পূর্ণ অসদ্ভাব দেখিয়া গৃহস্থালীর প্রচার আরম্ভ হইল। গৃহস্থালীতে গৃহস্থের শিক্ষোপযোগী প্রত্যেক বিষয় অতি বিশদরূপে লিখিত হইবে। এরূপ প্রয়োজনীয় পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায়—এই—নূতন।

স্বাস্থ্য অর্থাৎ শরীর-পালন, গৃহ-চিকিৎসা, গর্ভিণীর গর্ভাবস্থায় কর্ত্তব্য, শিশু-পালন, গৃহপালিত গো, অশ্ব প্রভৃতি পশু এবং নানা প্রকার পক্ষীদিগের রক্ষণ, প্রতিপালন ও চিকিৎসা, রোগীদিগের সেবা-সুশ্রূষা, পথ্যাদির ব্যবস্থা, গৃহস্থের উপযুক্ত কৃষি, শিল্প, শুভাশুভ দিন নির্ণয়, হাট বাজার করা, গৃহ নির্ম্মাণ এবং গৃহব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি রক্ষণ প্রভৃতি মনুষ্য জীবনের যাহা কিছু শিক্ষণীয় তৎসমুদায় গৃহস্থালীতে প্রকাশিত হইবে। প্রতিগৃহে যদি নূতন পঞ্জিকার আদর হইতে পারে, তবে গৃহস্থালী যে, সকলের নিকট আদরনীয় হইবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই।

বর্ষাকালে স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি।*

এদেশে বর্ষাকালে অনেক প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষার জলীয় বায়ু, মৃত্তিকার আর্দ্রতা এবং জল সংযোগে নানা প্রকার পদার্থ পচিয়া এক প্রকার দূষিত অস্বাস্থ্য-কর বিষবৎ বাষ্প উত্থিত হইয়া স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। জ্বর, পেটের পীড়া, বাত, কর্ণমূল-ফোলা এবং সর্দ্দি, কফ, কাশি প্রভৃতি নানা প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এইকাল শিশু এবং জীর্ণ রোগীদিগের পক্ষে অত্যন্ত পীড়া-জনক।

গৃহস্থগণ একটু মনোযোগী হইলে বর্ষা-জাত রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। প্রত্যেক গৃহস্থের স্ব স্ব আবাস বাটীর চতুর্দ্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। বাড়ীর জল নিকাশের পথ অর্থাৎ পয়ঃনালীগুলি বহতা রাখা কর্ত্তব্য। বৃষ্টির জল উঠানে অথবা গৃহের পার্শ্বে যেন সঞ্চিত হইয়া ঘরের মেজে প্রভৃতি আর্দ্র অর্থাৎ স্যাঁতা করিতে না পারে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি প্রত্যেক গৃহস্থ এই সময় বালক বালিকা প্রভৃতি পরিবারগণের

* বর্ষাকালে যে সকল পীড়া হইয়া থাকে, সেই সকল পীড়ার লক্ষণ ও চিকিৎসা পরে লিখিত হইবে।

চিকিৎসা, ঔষধ এবং পথ্যাদিতে যে ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার অর্দ্ধেক খরচে যদি ঐ সকল পরিষ্কার বিষয়ে ব্যয় করেন, তাহা হইলে অর্থের সাশ্রয় এবং রোগ শোকের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন।

স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হইলে যে, অনেক প্রকার রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই মনে রাখা উচিত।

আমরা প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, অনেক গৃহস্থের দোষে অনেক প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। বাড়ীর যাবতীয় আবর্জ্জনাদি দূরে না ফেলিয়া অনেকেই প্রায় উহা উঠানে জমা করিয়া রাখিয়া থাকেন। বর্ষাকালে তাহাতে জল সঞ্চিত হইয়া তাহা যে, নরক-তুল্য এবং নানা প্রকার রোগের জন্মভূমি হইয়া উঠে, তাহা মনে রাখা কর্ত্তব্য। অতএব ঐ সকল আবর্জ্জনা আবাস-বাটীর দূরে নিক্ষেপ করাই উচিত। যে আবর্জ্জনা আমাদের পীড়া-দায়ক, তৎসমুদয় আবার যত্ন করিয়া রাখিতে জানিলে, তদ্দ্বারা গাছপালার সারের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বাড়ীর দূরে একটী স্থানে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া রাখিলে, সমুদায় আবর্জ্জনা পচিয়া উদ্ভিদের সার হইতে পারে।

কেবলমাত্র যে, আবর্জ্জনা দূরে ফেলিলেই হইল, এরূপ মনে করা উচিত নহে। গৃহের সম্মুখে মূত্রাদি ত্যাগ করাও আর একটী অস্বাস্থ্যের কারণ মধ্যে গণ্য করা কর্ত্তব্য। উঠান একটু উচ্চ অর্থাৎ ঢালু করিয়া প্রস্তুত করা এবং তাহাতে আগাছা দ্বারা জঙ্গল হইলে তাহা পরিষ্কার রাখা এবং ঘরের মেজে শুষ্ক করিবার ব্যবস্থা করা গৃহস্থের গুরুতর কার্য্য। স্যাঁতা মেজেতে শয়ন করা, আর রোগের ক্রোড়ে আশ্রয় লওয়া দুই সমান। বর্ষা কিম্বা অন্য কোন ঋতুতে মাটীর উপর বিছানা না করিয়া তক্তপোষ, তাহার অভাবে খাটিয়া অথবা মাচা বাঁধিয়া শয়ন করা অতি সৎপরামর্শ। বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা পশ্চিম প্রদেশ-বাসী এবং ভারতের অন্যান্য অসভ্য জাতিরা এ বিষয়ে অনেকটা ভাল। তাহারা খাটিয়া ভিন্ন প্রায় মাটীতে শয়ন করে না। মাটীতে শয়ন করার আর একটী

প্রধান শত্রুও সর্পজাতি। বর্ষাকালে মাঠ ও গৃহস্থের বাটীর পার্শ্বের স্থান সমূহ এবং শুষ্ক গর্ত্তাদি জলে ডুবিয়া যায়, এজন্য সর্প গৃহের অভ্যন্তরে ও দেওয়ালের গর্ত্তে এবং ভগ্ন অথবা পুরাতন অট্টালিকাদিতে আশ্রয় লইয়া থাকে। তজ্জন্য অন্যান্য সময় অপেক্ষা ঐ সময় অধিক সর্প ভয় দেখা যায়। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, পল্লীগ্রামের অনেক লোকই বর্ষাকালে সর্পদংশনে প্রাণ হারাইয়া থাকে। শয়ন-গৃহ উত্তমরূপ পরিষ্কার রাখা উচিত এবং তথায় খাদ্য দ্রব্য রাখা সম্পূর্ণ অন্যায়, খাদ্যাদির গন্ধে সর্প উপস্থিত হইয়া থাকে। গৃহে বিড়াল ও নেউল পুষিলেও সর্প নষ্ট হইতে পারে।

রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার সময় মস্তকের সম্মুখে এবং পশ্চাতের জানালা খুলিয়া রাখিলে রাত্রির শীতল বাতাসে নানারূপ পীড়া জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথমে গরমের জন্য হয় ত জানালা খোলা হইয়াছিল, কিন্তু নিদ্রা-কালে বৃষ্টি হইয়া বাহিরের শীতল বাতাস গায়ে লাগিয়া নানা প্রকার অপকার করিতে পারে। তবে শিশুকাল হইতে যাহাদিগের ঐরূপ বাতাস সহ্য থাকে, তাহাদিগের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা।

আর্দ্র অর্থাৎ ভিজে কাপড় কিম্বা জুতা আদৌ ব্যবহার করা উচিত নহে। উহাতে সর্দ্দি ও কফ, কাশি এবং জ্বর হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব। কোন কারণে বৃষ্টির জলে ভিজিলে শুষ্ক বস্ত্রে গাত্র পুঁছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। সামান্যরূপ জল লাগিলে স্নান বন্ধ করা আবশ্যক। রাত্রিকালে অন্নের পরিবর্ত্তে রুটি আহার করা ভাল। সামান্যরূপ জ্বরবোধ হইলে গোল-মরিচের গুঁড়ার সহিত টাটকা মুড়ি, খৈ, পুরাতন ধানের চিড়া ভাজা আহার করা উচিত। কেহ কেহ এই অবস্থায় চা খাইয়াও থাকেন, কিন্তু তাহাতে চিনি ও দুগ্ধের পরিবর্ত্তে অল্প পরিমাণে লবণ দিয়া পান করিলে উপকার হইতে পারে। এই সময় গরম কাপড় ব্যবহার করিলেও সমধিক উপকার হইবার কথা।

শিশুগণ যেন ভিজা জমিতে সর্ব্বদা অবস্থিতি না করে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে অধিকাংশ বালক বালিকার কর্ণমূলাদি ফুলিয়া

থাকে এবং কাণ কামড়ানিতে তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলে। এজন্য কর্ণমূলে শিমপাতার রস প্রলেপ দিলে তাহা নিবারিত হইতে পারে। সেজের কিম্বা ধুতূরার পাতা আগুণে গরম করিয়া তাহার রস প্রলেপ দিলেও অনেক উপকার হইয়া থাকে। অধিক কামড়ানির যন্ত্রণা হইলে ঐ সকল রসে অল্প পরিমাণে আফিং গুলিয়া দিলে আরও উপকারের কথা। কাণে জল হইলে একটী পেঁপের অথবা ভেরেণ্ডা ডাল অর্থাৎ নল লইয়া তাহার এক দিক কাণের ছিদ্রের মুখে লাগাইয়া ঐ নলের অপর মুখে একটী জ্বলন্ত সলিতা ধরিয়া রোগীর মস্তক এরূপ ভাবে নোয়াইয়া রাখিতে হইবে যেন সলিতা ধরান মুখ মাটীর দিকে থাকে, এরূপ ভাবে থাকিলে অল্পক্ষণের মধ্যে কাণের সঞ্চিত জল নল দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িবে।

বর্ষাকালে আর একটী কারণে পল্লিগ্রামের পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের জল পীড়া-দায়ক হইয়া থাকে, অর্থাৎ অনেকেই ঐ সকল জলাশয়ের পাড়ে মল ত্যাগ করিয়া থাকেন। বৃষ্টির জলে তাহা ধুইয়া জলাশয়ে পতিত হইয়া থাকে। মল-মূত্রাদি পানীয় প্রভৃতি জলে মিশ্রিত হইলে তাহা যে, নানা প্রকার রোগের মূলীভূত হইয়া উঠে, ইহা সকলেরই মনে যেন জাগরিত থাকে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারেরা জলে মল-মূত্র এবং নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু প্রভৃতি নিক্ষেপ করা মহা পাপ বলিয়া শাসন করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক যাহা দ্বারা স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত করিয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের আশ্রয়-ভূত শরীর নষ্ট করে, তাহা অবশ্যই পাপের মধ্যে গণ্য করা উচিত।

বর্ষাকালে জলাশয় মাত্রেরই জল প্রায় কর্দ্দমময় অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে, এই জলেও নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। অতএব পানীয় জল পরিষ্কার করিয়া পান করা কর্ত্তব্য। ঘোলা জল পরিষ্কার করিতে হইলে নির্ম্মাল্য ঘষিয়া এবং ফট্‌কিরির গুঁড় জলে দিয়া রাখিলে জলের যাবতীয় কর্দ্দম নিম্নে পড়িয়া যায়। সুতরাং জল স্বচ্ছ হইয়া উঠে, এই জল পান করিলে স্বাস্থ্যের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। জলাশয় হইতে টাট্‌কা জল তুলিয়া পান না করিয়া দুই এক দিন তুলিয়া রাখিয়া পান করিলেও মাটী নীচে জমিয়া থাকে।

বর্ষাকালে পানীয় জলের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে গুরুতর কর্ত্তব্য। ঘোলা জল পান করিলে অগ্নি-মান্দ্য প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। এ জন্য বৃষ্টির জল ধরিয়া পানের জন্য ব্যবহার করা ভাল। বৃষ্টির জল ধরা কিছুই কঠিন নহে। যে দিন অধিক বৃষ্টি হইবার সম্ভব দেখা যাইবে, সেই দিন উঠানে অথবা ছাদের উপর পরিষ্কৃত স্থলে চারিটি খুঁটী পুতিয়া একখানি পরিষ্কৃত কাপড়ের চারিটী খুঁট ঐ খুঁটা চারিটাতে বাঁধিয়া সেই কাপড়ের মধ্যস্থলে একখানি ছোট রকমের পাথর বা ইঁট রাখিলে সেই স্থান কিছু ঝুলিয়া পড়িবে। অনন্তর তাহার নীচে একটী কলসী বসাইয়া রাখিলে অনায়াসেই জল পূর্ণ হইতে পারে। এইরূপে আবশ্যক মত জল ধরিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া ঐ জল পান করা আবশ্যক। কিন্তু বৃষ্টির প্রথম জল ধরা উচিত নহে, কারণ তখন বায়ুতে নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে, প্রথম বৃষ্টিকালে সে সকল পদার্থ জলে মিশ্রিত হইয়া অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, এজন্য এক পসলা বৃষ্টি হওয়ার পর জল ধরা উচিত। যে কোন সময়ে জল ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বর্ষাকালে যেরূপ কীটাদি জন্মিয়া থাকে, তাহাতে সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা বিধি। এই সময় আর একটী বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া উচিত অর্থাৎ পানীয় জল ছাঁকিয়া লওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। বর্ষাকালে অধিক দিন জল রাখিলে সেই জলে এক প্রকার কীট জন্মে সুতরাং তাহা পান করিলে কৃমি জন্মিয়া থাকে। এজন্য জল তুলিবার সময় কলসী বেশ করিয়া ধুইয়া লওয়া উচিত।

খাদ্যাদির দোষেও বর্ষাকালে পেটের পীড়া প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এই সময় বালক বালিকারা পেয়ারা এবং কাঁঠাল প্রভৃতি নানাপ্রকার ফল খাইয়াও রোগ-গ্রস্থ হইয়া পড়ে। এজন্য খাদ্যাদির প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

বর্ষাকালে গৃহের চতুর্দ্দিকে জল সঞ্চিত হইলে যেমন অনিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ বাগানে জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত না থাকিলে অনেক প্রকার গাছ পালা পচিয়া গৃহস্থের বিস্তর অনিষ্ট করিয়া তুলে। প্রয়োজনের

অতিরিক্ত জল যেমন মনুষ্যাদির অনিষ্ট-কর, সেইরূপ উদ্ভিদ্‌দিগের পক্ষেও অপকার করিয়া থাকে।

বর্ষাকালে পল্লীগ্রাম সমূহ প্রায় কর্দ্দম-ময় হইয়া উঠে। সুতরাং সর্ব্বদা কাদায় বেড়াইলে পায়ে অর্থাৎ আঙুলের সন্ধি-স্থলে হাজা লাগিয়া ঘা হইতে দেখা যায়। মনুষ্যের ন্যায় গবাদি পশুর ক্ষুরের মধ্যেও এক প্রকার ক্ষত হইয়া থাকে।* কখন কখন ঐ ক্ষত অত্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট এবং তাহাতে পোকা জন্মিয়া অত্যন্ত পীড়া-দায়ক হয়। বর্ষাকালে মনুষ্য কিম্বা পশু কাহার দেহে ক্ষত হইলে শীঘ্র শুষ্ক হয় না। এজন্য সর্ব্বদা সাবধান থাকা আবশ্যক।

বর্ষার জলে মাঠ প্রভৃতি প্রায়ই জল-প্লাবিত হইয়া থাকে, সুতরাং গবাদি পশুর ভালরূপ চরিবার স্থান থাকে না, অনেক সময় আবার ডোবা ঘাস আহার করিয়া নানা প্রকার রোগ-গ্রস্থ হইয়া পড়ে এবং সেই রুগ্ন-গাভির দুগ্ধ পান করিয়াও অনেক প্রকার রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য বর্ষার পূর্ব্বে উহাদিগের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

বৃষ্টির ও বন্যার জলে নদী, পুষ্করিণী এবং খানা, ডোবা প্রভৃতি জলাশয় সমূহ জল পূর্ণ হওয়াতে এবং গৃহস্থগণের অসাবধানতা বশতঃ অনেক বালক বালিকা ডুবিয়া মারা পড়িয়া থাকে। অতএব বাড়ীর নিকটে জলাশয় থাকিলে তাহা ভালরূপে ঘিরিয়া রাখিলে ঐ প্রকার অনিষ্ট গৃহস্থগণকে আক্রমণ করিতে পারে না। এই সময় বালক বালিকাদিগকে একাকী স্নান করিতে দেওয়াও সম্পূর্ণ অবিধি।

বর্ষাকালে নানা প্রকার কীট পতঙ্গ উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যদিগের অনিষ্ট করিতে ক্রুটি করে না। এজন্য খাদ্য-দ্রব্য মাত্রেই উত্তমরূপ ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রাত্রিকালে আলো না লইয়া কোন স্থানে গমন করা অনুচিত। শয়ন-গৃহ সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার রাখা অতীব আবশ্যক। এই সময় মশারি খাটাইয়া শয়ন করিলে অনেক প্রকার প্রাণির অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে।

* চিকিৎসা প্রকরণে উহার ঔষধাদির বিবরণ লিখিত হইবে।

প্রত্যেক গৃহস্থ যেমন স্ব স্ব আবাস বাটীর চতুর্দ্দিক পরিষ্কার রাখিবেন, সেইরূপ সাধারণের আবাস স্বরূপ সমুদায় গ্রামের পয়ঃপ্রণালী বন জঙ্গল এবং জলাশয় প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা গুরুতর কর্ত্তব্য।

সূতিকা-গৃহ।

কিরূপ স্থানে এবং কিরূপ নিয়মে সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। এই সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ দোষে অনেক স্থানেই বিস্তর শিশু নানা প্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া অসময়ে জনক জননীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া—সাধের সংসার অন্ধকার করিয়া—মাতার স্নেহ-পূর্ণ ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। আমরা অনেক স্থানেই দেখিয়া থাকি, বাড়ীর মধ্যে অপকৃষ্ট স্থানে সূতিকা গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যেরূপ স্থানে অবস্থিতি করিলে সুস্থ ব্যক্তিকে নানা প্রকার অসুখের সহিত আলিঙ্গন করিতে হয়, সদ্যঃপ্রসূত—পৃথিবীর জল বায়ু সম্পূর্ণরূপ অসহিষ্ণু এরূপ শিশু যে, জঘন্য স্থানে বাস করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্য-লাভ এবং জীবন ধারণ করিবে, ইহা যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা কেহই বিবেচনা করেন না।

আমাদের দেশের প্রাচীন চিকিৎসকগণ সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অতি প্রশস্ত-মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশিত আছে।

> "অষ্টহস্তায়তঞ্চারু চতুর্হস্তবিশালকম্।
> প্রাচীরদ্বার মুদগুদ্বারং বিদধ্যাৎসূতিকাগৃহম্॥"

অর্থাৎ আটহাত দীর্ঘ ও চারি হাত বিস্তৃত এবং পূর্ব্ব কিম্বা উত্তরদ্বারী সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে সূতিকা-গৃহ প্রশস্ত করিবার সম্বন্ধে যেরূপ মত লিখিত আছে, এক্ষণে অনেক স্থানে সেইরূপ বৃহৎ আকারের সূতিকাগার করিতে প্রায়ই দেখা যায় না। তবে সূতিকা-গৃহ

যেরূপ আয়তনবিশিষ্ট করা আবশ্যক, তাহা উক্ত গ্রন্থের মতে যদিও অনুমোদনীয় কিন্তু পূর্ব্ব এবং পশ্চিমদ্বারী করিতে কেন যে, মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কারণ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ বিষয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিশারদ মহর্ষি শুশ্রুত তাঁহার মতে অভিমতি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মতে দক্ষিণদিকেই সূতিকা-গৃহের দ্বার রাখাই সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়। শুশ্রুত আরও বলিয়াছেন, সূতিকা-গৃহের প্রাচীর এবং ভিত্তি সুন্দররূপ দৃঢ় করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই এক্ষণে সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে লোকের তাদৃশ যত্ন দেখা যায় না। বাড়ীর মধ্যে অতি জঘন্য স্থানে উক্ত গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথমে যে স্থানে অবস্থিতি করিবে, তাহা যে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া আবশ্যক, তাহাতে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ তাহারা গর্ভাবস্থায় এক প্রকার নূতন স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকে, ভূমিষ্ঠ হইয়াই আবার পৃথিবীর উত্তাপ এবং বায়ু প্রভৃতি যাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হইতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য। স্যাঁতা স্থানে সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করিলে জলীয়-বাতাসে শিশুর নানা প্রকার রোগ হইয়া থাকে। এজন্য উত্তমরূপ শুষ্ক এবং রৌদ্র ও নির্ম্মল বায়ুসঞ্চারক স্থানে উহা নির্ম্মাণ করা উচিত। এস্থলে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক। অস্বাস্থ্য-কর স্থানে সূতিকাগার নির্ম্মিত হইলে কেবলমাত্র যে, শিশুগণেরই অপকার হইয়া থাকে এরূপ নহে, তদ্দ্বারা প্রসূতিরও নানা প্রকার রোগ হইবার সম্ভব। প্রসবের পর প্রসূতির শারীরিক স্বাস্থ্য অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এজন্য সামান্যরূপ নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগ আক্রমণ করিয়া ভয়ানক অবস্থা করিয়া তুলে। প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের কোন প্রকার পীড়া হইলে তদ্দ্বারা কেবলমাত্র যে, প্রসূতির অপকার করিয়া থাকে, তাহাও নহে, জননীর অস্বাস্থ্য নিবন্ধন তাঁহার স্তন্য-দুগ্ধ পান করিয়া শিশুকে আবার অনেক প্রকার রোগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। অনেক স্থানে সেই রোগ প্রবল হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে দেখা গিয়াছে

সূতিকা গৃহ জীবনের প্রথম আশ্রয় স্থান। রক্ত-মাংসময় শিশু সেই আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া ভবিষ্য জীবনের জন্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং এই অবস্থায় যদি তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি করা না যায়, তবে ক্ষীণ-প্রাণ শিশু যে, নানা প্রকার রোগ ভোগ করিয়া অবশেষে মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

সূতিকা-গৃহের দোষে আমাদের দেশের অনেক শিশুকেই প্রায় মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হয়। অবোধ গৃহস্থগণ মৃত্যুর কোন প্রকৃত কারণ জানিতে না পারিয়া অবশেষে দৈবের উপর নানা প্রকার দোষার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যদি স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, সদ্যঃপ্রসূত শিশুর জন্য যেরূপ সূতিকাগার প্রস্তুত করিয়া তাহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন, সেই গৃহই যে, সাক্ষাৎ কৃতান্তের প্রসারিত ক্রোড়, তাহা একবার মনে করা উচিত। যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, সবল-কায় সুস্থ ব্যক্তিও কিছু দিন অস্বাস্থ্য-কর স্থানে অবস্থিতি করিলে, তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া দেহ নানা রোগের আগার হইয়া উঠে, তখন শিশুগণ যে, সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া সদ্যঃ মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এদেশে যে সকল শিশু অসময়ে জনক-জননীকে কাঁদাইয়া তাঁহাদিগের ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেই মৃত্যুর একমাত্র কারণ যে, তাঁহারাই নিজে, তাহা জানিয়া রাখা উচিত। আমরা মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি, শিশুহত্যার যে মহাপাপ, সেই পাপ হইতে এ দেশের অনেক গৃহস্থই নির্লিপ্ত নহেন। অবোধ শিশু কিছুই জানে না যে, তাহার সর্ব্বনাশের জন্য গৃহস্থগণ কিরূপ ভয়ানক স্থান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন!

বাড়ীর মধ্যে উৎকৃষ্ট স্থানেই সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক, ইহা যেন প্রত্যেক গৃহস্থের মনে জাগরিত থাকে। জনক-জননী যদি শিশুর স্বাস্থ্য-সুখ এবং প্রফুল্লানন দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা করেন, তবে সূতিকা-গৃহ প্রস্তুত বিষয়ে মনোযোগী হউন। পূর্ব্বে ইয়ুরোপের মধ্যে

কোন স্থানে প্রতিবৎসর বিস্তর শিশু মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইত। কি কারণে যে, শিশুদিগের এইরূপ অকাল-মৃত্যু ঘটিত তাহা কেহই স্থির করিতে পারিত না। অনেক অনুসন্ধানের পর চিকিৎসকগণ স্থির করিলেন, সূতিকাগারের দোষেই যে, ঐরূপ মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহাতে আর অণু-মাত্রও সন্দেহ নাই। পরিশেষে স্বাস্থ্য-কর স্থানে সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিল। সেই পর্য্যন্ত ইয়ুরোপে সূতিকাগার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

সূতিকা-গৃহ অস্পৃশ্য জ্ঞানে এদেশে উহা যেরূপ স্থানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যাহার সহিত জীবনের সম্বন্ধ এবং সুখ দুঃখ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত জড়িত রহিয়াছে, তাহা অস্পৃশ্য ও অপবিত্র জ্ঞান না করিয়া যাহাতে তাহার উন্নতি হয়, অর্থাৎ যে সকল দোষ স্পর্শ এবং স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এদেশের অনেকেই উঠানের কোন স্থানে চাটাই এবং খেজুর ও তালের পাতা প্রভৃতি দ্বারা সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু উহা এরূপভাবে নির্ম্মাণ করা উচিত, বৃষ্টির জল, বর্ষা এবং শীত-কালের অস্বাস্থ্য-কর বায়ু তাহা ভেদ করিয়া যেন গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে। কারণ তদ্দ্বারা শিশু ও প্রসূতির নানা রোগ জন্মাইবার সম্ভব। পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে আবার এরূপও শুনিতে পাওয়া যায় যে, শৃগাল ও কুক্কুর নিদ্রাবস্থায় সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করিয়া শিশুর জীবন পর্য্যন্তও নষ্ট করিয়া থাকে। উপরোক্ত কারণ সমূহ নিমিত্তই আর্য্য ঋষি শুশ্রুত সূতিকা-গৃহের বেড়া প্রভৃতি দৃঢ় করিয়া নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, এস্থলে ইহাও মনে রাখা উচিত, বেড়া প্রভৃতি দৃঢ়তার সহিত ঘরের মেজে উচ্চ এবং শুষ্ক করিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যে সকল গৃহস্থগণের অবস্থা ভাল, তাঁহারা সূতিকা-গৃহের জন্য বাড়ীর মধ্যে স্বতন্ত্র একখানি ঘর রাখিতে পারেন। উঠানে সামান্যরূপ গৃহ প্রস্তুত করা অপেক্ষা একখানি পৃথক গৃহে প্রসবের স্থান নিরূপণ করা যুক্তিসঙ্গত। যাঁহারা অট্টালিকাদিতে

বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে একটী ভাল রকম প্রকোষ্ঠ প্রসবের জন্য ব্যবস্থা করা উচিত।

সূতিকা-গৃহ সম্বন্ধে প্রত্যেক গৃহস্থই নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় মনে রাখিলে অনেক প্রকার অনিষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

১। বাড়ীর মধ্যে যে স্থান উচ্চ এবং স্যাঁতা নহে, সর্ব্বদা উত্তমরূপ রৌদ্র লাগিয়া থাকে এবং বায়ু সঞ্চারিত হয়, এরূপ স্থলে গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

২। গৃহের মধ্যে ঠিক দ্বারের সম্মুখে শিশুর শয়নের ব্যবস্থা করা উচিত নহে। কারণ গৃহের মধ্যে যেরূপ গরম রাখা হইয়া থাকে, রাত্রিকালে হঠাৎ দ্বার খুলিলে বাহিরের শীতল বাতাস শিশুর শরীরে লাগিয়া রোগ জন্মাইয়া থাকে।

৩। বর্ষা ও শীতকালের অস্বাস্থ্য-কর বায়ু হইতে শিশুর দেহ রক্ষা করা আবশ্যক।

গো-জাতির উদরাময় রোগ। *

উদরাময় রোগে মনুষ্যদিগের যেরূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে, গবাদি পশুগণেরও সেইরূপ অপকার হইতে দেখা যায়। প্রাণিমাত্রেরই দেহে রোগ যে, একটী পরম শত্রু তাহা কাহাকেও লিখিয়া কিম্বা যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয় না। সুস্থশরীর যেমন সুখের আলয়, রোগাক্রান্ত দেহও যে, সেইরূপ অশেষ ক্লেশের ভাণ্ডার, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। গবাদি পশু দ্বারা সমাজে নানা প্রকার উপকার হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা আমরা উপকার ভোগ করিয়া থাকি, তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা যে, সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-সঙ্গত তাহা বোধ হয়, কাহাকেও যুক্তি

* জে, এইচ, বি, হালেম সাহেবের পরীক্ষিত গবাদির মারাত্মক রোগ-বিষয়ক পুস্তিকা অবলম্বন করিয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইল।

দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয় না। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, উদরাময় রোগে বিস্তর পশু কষ্ট পাইয়া থাকে, কেবলমাত্র যে, কষ্ট-ভোগ করে এরূপও নহে, পীড়িতাবস্থায় সমাজের উপকার করিতে সমর্থ হয় না এবং অবশেষে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে। অতএব যে যে উপায় অবলম্বন করিলে গো-জাতির এই মহানিষ্ট নিবারিত হয়, তাহা অবগত হওয়া প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য।

মনুষ্যাদির কোন প্রকার পীড়া হইলে যেমন লক্ষণ দেখিয়া রোগ ও তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারা যায়, গবাদির পক্ষেও সেইরূপ লক্ষণ দেখিয়া রোগের নিদান এবং চিকিৎসা করা যাইতে পারে।

ভাব—গোজাতির উদরাময় রোগ উপস্থিত হইলে বারম্বার পেট নামাইতে থাকে, কখন কখন পেটের প্রদাহের লক্ষণ দেখা যায়। এই সময় বাহ্যে পাতলা অর্থাৎ ধেড়ানি হইতে থাকে।

রোগের কারণ—বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ গো-জাতির উদরাময় রোগের নানা প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন কিন্তু তন্মধ্যে এই কয়েকটী কারণই প্রধান বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। যথা কদর্য্য অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য এবং বিষময় গাছগাছড়া ভক্ষণ এবং ঘোলা জল পান, এই উদরাময় রোগের উৎপত্তির কারণ।

জোলাপ অর্থাৎ বিরেচন দ্রব্য অধিকমাত্রায় সেবন করাইলে এবং পাকস্থলী ও আঁত অত্যন্ত পূর্ণ থাকিলেও এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

পূর্ব্বে পেটের কোন দোষ থাকিলে, তাহার উপর অধিক আহার কিম্বা সেই অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগিলে, অথবা শীত বা গরমের পর হটাৎ শীতল বাতাস লাগিলে, কিম্বা ফুসফুসের প্রদাহ এবং অন্যান্য রক্ত সম্বন্ধীয় রোগের শেষ অবস্থাতেও উদরাময় হইতে দেখা যায়। উদরাময়-রোগ-গ্রস্থা গাভীর দুগ্ধ-পান করিয়াও বাছুরের এই রোগ হইতে পারে। এমন কি ঐ দুগ্ধ পান করিয়া শিশুদিগের পর্য্যন্ত এই পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে। কখন কখন রৌদ্রের অত্যন্ত উত্তাপ লাগিয়াও এই রোগ প্রকাশ হইয়া থাকে।

প্রায়ই দেখা যায়, বর্ষার পর ভূমিতে যে নূতন ঘাস জন্মে, সেই ঘাস আহার করিয়া গবাদি পশু উদরাময় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

উদরাময় রোগকে এদেশে পেটনামানো, পঞ্জাবে ভূক্নি কহে।

লক্ষণ—উদরাময় রোগ উপস্থিত হইলে প্রথমে বেদনা কিম্বা বেগ থাকে না। সর্ব্বদা বায়ুর সহিত জলের ন্যায় পাতলা বাহ্যে হইতে থাকে।

এই রোগ উপস্থিত হইলে গরুতে ভালরূপ জাওর কাটে না, কিন্তু ক্ষুধা থাকে এবং স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। গাভীর উদরাময় পীড়া উপস্থিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ দেয় না।

গো-জাতি দীর্ঘকাল ধরিয়া উদরাময় রোগ ভোগ করিলে, কখন কখন মলের সঙ্গে রক্ত পড়িতে দেখা যায় এবং নাদিবার সময় কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে, এজন্য বাহ্যের সময় পিঠ কোঁয়া হইতে দেখা যায়।

ব্যবস্থা—রোগের কারণ অনুভব করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। আহারাদির দোষে যে, রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, এজন্য সর্ব্বাগ্রে চরিবার স্থান এবং খাদ্য ও পানীয় জল পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

ঔষধের ব্যবস্থা

চা-খড়ির গুঁড়া *	পৌনে চারি তোলা।
পলাশ গঁদ *	পৌনে এক তোলা।
আফিং	ছয় আনা।
চিরতার গুঁড়া *	সওয়া তোলা।
মদ	এক ছটাক।
ভাতের মাড়	এক সের।

* এই চিহ্নের দ্রব্য কয়েকটী ভাল রকম গুঁড়া করিয়া তাহাতে আফিং, মদ এবং ভাতের মাড় মিশাইয়া সেবন করাইতে হইবে। পেটে বেদনা থাকিলে কিম্বা বেগ দিতে দেখিলে পৌনে এক হইতে সিকি তোলা

পরিমাণ আফিং ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। লিখিত দ্রব্য কয়েকটী এক সঙ্গে মিশাইয়া সেবন করাইলে ধারক ও অম্ল-নাশকের কার্য্য করে।

পথ্য—রোগের কঠিন অবস্থায় কেবলমাত্র ভাতের মাড় অথবা ভুষির জ্বাব আহারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

রোগ আরাম হইতে থাকিলে ভালরূপ স্বাস্থ্য-কর দ্রব্য খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। পেট নামানো বন্ধ হইলে পর কিছুদিন জল না দিয়া ভাতের ও তিষির এবং ময়দার মাড় এক সঙ্গে মিশাইয়া আহার করিতে দেওয়া ভাল। যখন দেখা যাইবে লিখিত ঔষধে সুন্দর উপকার হইয়াছে, কিন্তু একেবারে পেট ধরিয়া যায় নাই, তখন নিম্নলিখিতরূপ ঔষধটী সেবন করান যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অবস্থার ঔষধ

চা-খড়ির গুঁড়	এক ছটাক।
খয়েরের গুঁড়	আড়াই তোলা।
শুঁটের গুঁড়	সওয়া তোলা।
আফিং	ছয় আনা।
মদ	এক ছটাক।
জল	দেড় পোয়া।

এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ মিশাইয়া সেবন করাইতে হইবে। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দুইবারমাত্র সেব্য। বাছুরকে প্রতিবারে দুই হইতে চারি ছটাক পর্য্যন্ত খাওয়াইতে পারা যায়।

রোগ হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া যদি পশু অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং কৃশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বলকারক ঔষধ।

শুঁঠের গুঁড়	সওয়া তোলা।
চিরতার গুঁড়	সওয়া তোলা।

গোলমরিচের গুঁড়	...	...	... সওয়া তোলা।
জোয়ানের গুঁড়	...	...	... সওয়া তোলা।
লবণ	...	...	... এক ছটাক।

এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ গুঁড় করিয়া মিশাইয়া সিকিভাগ গুঁড় তপ্ত মাড়ের সঙ্গে প্রতিদিন প্রাতে কিম্বা সন্ধ্যাকালে হয় এক অথবা দুইবার এক অবধি দুই ছটাক পর্য্যন্ত খাওয়াইতে পারা যায়।

উপরি লিখিত ঔষধে উপকার বোধ না হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা।

ছিয়াকসের গুঁড়	...	...	... ছয় আনা।
চিরতার গুঁড়	...	...	... সওয়া তোলা।

এক সঙ্গে মিশাইয়া আধসের ভাতের মাড়ের সহিত দিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নি-বর্দ্ধক।

জীর্ণ অর্থাৎ প্রাচীন উদরাময় রোগে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রশস্ত।

তুতের গুঁড়	...	...	ছয় আনা অবধি বার আনা।
জল	...	...	আধ সের।

উভয় দ্রব্য এক সঙ্গে গুলিয়া সেবন করাইতে হইবে।

গবাদির প্রাচীন গৃহিণী রোগে ইহা একটী মহৌষধ মধ্যে পরিগণিত।

খয়ের	...	...	... দুই আনা
চা-খড়ির গুঁড়	...	...	... আড়াই তোলা।
আফিং	...	...	... পৌনে এক তোলা।

এই ঔষধ গবাদির আমাশয় রোগ হইলে ঘন মাড়ের সঙ্গে দিন দুইবার দিতে হইবে।

গো-জাতির উদরাময় রোগে অনেক সময় কেবলমাত্র বাঁশের কচি পাতা খাওয়াইয়া আরাম করিতে দেখা গিয়াছে।

ডুমুরের কচি পাতাও উদরাময় রোগের পক্ষে একটী মহৌষধ। কেবল-মাত্র ডুমুরের পাতা খাওয়াইয়া অনেক স্থলে উদরাময় রোগ আরাম হইয়াছে।

অনেক সময় আবার কেবলমাত্র বাঁশের নীল চাঁচিয়া গবাদিদিগকে আহার করাইলেও উদরাময় আরোগ্য হইয়া থাকে।

উদরাময় রোগাক্রান্ত গবাদি পশুদিগকে লিখিতরূপ ঔষধ এবং উপযুক্ত চিকিৎসার সহিত যদি পথ্যাদির সুব্যবস্থা ও ভালরূপ স্থানে রাখিতে পারা যায়, তবে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে।

সুবর্ণের অলঙ্কার রঙ করিবার নিয়ম।

অলঙ্কার-প্রিয় রমণীগণ অলঙ্কারাদির সৌন্দর্য্যের জন্য সর্ব্বদাই যত্ন করিয়া থাকেন। সোণার রঙ ময়লা কিম্বা মরা সোণার অলঙ্কার দেখিতে তত সুশ্রী নহে। এজন্য অনেকেই প্রতি বৎসর অলঙ্কারাদির রঙ করিয়া লইয়া থাকেন। সামান্য রঙের জন্য সেকরার উপাসনা করা অপেক্ষা স্বহস্তে উহার রঙ করিবার নিয়ম জানিতে পারিলে সকলেরই পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। সোণার রঙ ফলান অতি সহজ। এরূপ সহজ কাজের জন্য অন্যের মুখ চাহিয়া থাকা কি লজ্জার বিষয় নহে? যাঁহাদিগের অবস্থা ভাল, তাঁহারা কথায় কথায় অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ কিন্তু সামান্য অবস্থার রমণীগণের পক্ষে তাহা তত সহজ নহে। বস্ত্র কিম্বা অলঙ্কারাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাই ভাল। মূল্যবান অলঙ্কারাদি যদি সর্ব্বদা মলিন আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। তাহা হইলে অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য কাহারও দৃষ্টি-গোচর হয় না। এজন্য উহার বর্ণাদির উজ্জলতার প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা উচিত।

আমরা এমন সহজ উপায় শিখাইয়া দিব যে, তাহাতে সামান্যমাত্র ব্যয় অথচ সোণার গহনা নূতনের ন্যায় ঝক্‌ঝকে হইবে।

প্রত্যেক গৃহস্থ যদি ঘরে কিয়ৎ পরিমাণে ছির্কা এবং অল্প জাজাল রাখেন তবে সোণার গহনা রঙ করিবার জন্য সেকরার নিকট ছুটিতে হইবে না।

অলঙ্কারের পরিমাণ অনুসারে ছির্কাতে কিঞ্চিৎ জাজালের গুঁড় মিশাও। যখন দেখিবে উহা বেশ মিশিয়া গিয়াছে, তখন তাহা গহনাতে উত্তমরূপ মাখাও। এখন ঐ গহনা আগুণে বেশ করিয়া গরম কর। এই সময় একটী পাত্রে গরু কিম্বা ঘোড়ার চোনা রাখ। গহনাগুলি উত্তপ্ত হইলেই ঐ চোনাতে ডুবাইয়া দেও এবং তাহা শীতল হইলেই

পরিষ্কার নেকড়ায় পুঁছিয়া লও, দেখিবে তোমার সেই মলিন গহনা কেমন টকটকে রঙ ধারণ করিয়া তোমার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

তেঁতুলগোলা অথবা সাবানের জলে অলঙ্কারাদি কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া শূকরের কুচি অথবা টুথ্ ব্রস্ দ্বারা ঘসিয়া ঘসিয়া উহা পরিষ্কার করা যাইতে পারে।

এক গোছা চুল জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিলে ধূম উঠিবে, তাহার উপর সোণার গহনা চিম্‌টা দ্বারা ধরিয়া রাখিলেই সোণার রঙ হইবে।

মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার উপায়।

বস্ত্র আমাদের সর্ব্বদা ব্যবহারের দ্রব্য, অতএব তাহা অতি যত্নের সহিত পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। দুইটী উদ্দেশ্যে আমরা বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি; অর্থাৎ লজ্জানিবারণ এবং শীতোষ্ণতা হইতে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা। কিন্তু যে বস্ত্র আমাদের এত উপকার-জনক তাহা মলিন হইলে কোন প্রকার উদ্দেশ্যই সুসিদ্ধ হয় না, প্রত্যুত প্রভূত অপকার সাধিত হইয়া থাকে। মলিন বস্ত্র পরিধান করিলে মন অপ্রসন্ন, সভ্য-সমাজে গমন করিতে সঙ্কুচিত এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া থাকে। আমাদের শরীরে যে অসংখ্য লোম-কূপ আছে, তদ্দ্বারা বাহিরের নির্ম্মল বায়ু প্রভৃতি শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শোণিত বিশোধিত এবং শরীরের দূষিত স্বেদাদি নির্গত করিয়া থাকে। মলিন বস্ত্র পরিধান কিম্বা মলিন শয্যায় শয়ন করিলে ঐ ময়লা দ্বারা লোম কূপের মুখ সমুদায় রুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে লোম-কূপের সৃষ্টি, তাহা সুরক্ষিত হয় না। এইজন্য বস্ত্র এবং বিছানার চাদর প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা অতীব ক।

আজকাল যেরূপ রজকের কষ্ট এবং বস্ত্রাদি ধৌত করিতে যেরূপ ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় কোন গৃহস্থকেই লিখিয়া বুঝাইয়া দিতে

হয় না। রজকের কষ্টের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, এমন স্থান অতি বিরল। বিশেষতঃ সামান্য গৃহস্থগণকে বালক বালিকা প্রভৃতি অনেক-গুলি পরিবার লইয়া এক সঙ্গে বাস করিতে হয়। বালক বালিকারা যেরূপ সর্ব্বদা বস্ত্রাদি মলিন করিয়া থাকে, সে পরিচয় কেনা জানেন? এরূপ স্থলে সামান্য ব্যয়ে এবং সহজ উপায়ে বস্ত্র পরিষ্কার করিবার নিয়ম জানা থাকিলে প্রত্যেক গৃহস্থই নিত্য পরিষ্কার বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি অনেক গৃহস্থ সাবান, সাজিমাটী, ক্ষার এবং চোনা দ্বারা বস্ত্রাদি সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া থাকেন কিন্তু তদ্দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণে উহা শুভ্র হয় না; তবে মলিন বস্ত্র অপেক্ষা যে, উহা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব ক্ষারের সঙ্গে কিঞ্চিৎ তার্পিন তৈল মিশাইয়া সিদ্ধ করিলে উত্তম শাদা হইতে পারে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, নিম্নলিখিতরূপ নিয়মানুসারে ধৌত করিলে বস্ত্র অতি পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

আধসের পরিমিত কাপড় কাচা সাবানের সহিত আধ ছটাক সোহাগা মিশাইয়া বস্ত্র ধৌত করিলে তাহা অতি শুভ্র হইয়া থাকে, এমন কি ঐ ধৌত বস্ত্র রেসমী কাপড়ের ন্যায় মসৃণ হইয়া উঠে। আর অল্প পরিশ্রমে অধিক ফললাভ হয় এবং ব্যয়েরও বিস্তর সুসার হইয়া থাকে। যে বস্ত্র পরিষ্কার করিতে পাঁচসের পরিমাণ সাবানের প্রয়োজন, সোহাগা মিশাইয়া লইলেই তাহার অর্দ্ধেক সাবানে তাহা পরিষ্কার করা যাইবে।

যাঁহাদিগের সাবানের ব্যয় অধিক বোধ হইবে, তাঁহারা বাজার হইতে সোডা আনাইয়া অল্প পরিমাণ কলিচূণের সহিত তাহা জলে গুলিয়া মলিন বস্ত্রে মাখাইয়া সিদ্ধ করিবেন এবং সেই সিদ্ধ বস্ত্র জলে আছাড়াইয়া কাচিয়া লইলেই সোডার গুণ বুঝিতে পারিবেন।

বর্ষাকালে জামা প্রভৃতিতে প্রায়ই চিতি ধরিয়া থাকে। অতএব বস্ত্রের যে যে স্থানে চিতি ধরিবে, সেই সেই স্থানে বেশ করিয়া সাবান মাখাইয়া খুব শাদা চা-খড়ির গুঁড় তাহাতে দিয়া ঘসিতে হইবে। অল্পক্ষণ ঘসিয়া ঐ বস্ত্র কোন স্থানে বিছাইয়া শুকাইতে হইবে। শুষ্ক হইলে

আবার ঐরূপ করিবে। চিতি অনুসারে দুই তিনবার ঐরূপ করিয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করিলে চিতি উঠিয়া যাইবে।

বস্ত্রাদিতে অধিক ময়লা জমিতে না দেওয়াই উচিত। প্রতি সপ্তাহে যদি লিখিতরূপ নিয়মে ধৌত করা যায়, তাহা হইলে মলিনতার আক্রমণ হইতে অনায়াসেই রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। মলিন বস্ত্রাদির প্রতি গৃহস্থগণকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অনেক প্রকার রোগের জন্মস্থান যে মলিন বস্ত্র, তাহা যেন প্রত্যেক গৃহস্থের মনে থাকে।

পল্লীগ্রামে অনেক স্থানে কলার বাসনা পুড়াইয়া সেই ছাই বা ক্ষার জলে গুলিয়া উহা কাপড়ে মাখিয়া সিদ্ধ করতঃ মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত করিতে দেখা যায়।

রোগীদিগের বস্ত্র এবং বিছানার চাদর প্রভৃতি সর্ব্বদা ধৌতপূর্ব্বক পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিত। বিশেষতঃ ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র, বিছানা এবং গামছা প্রভৃতি উত্তমরূপ ধৌত না করিয়া অন্যের ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অন্যায়। ঐ সকল ছুঁয়াচে রোগীর বস্ত্রাদিতে রোগের বীজ আবদ্ধ থাকে, সুতরাং উহা অন্যের দেহে প্রবেশ করার সম্পূর্ণ সম্ভব।

আম্রের যোড়কলম বাঁধিবার নিয়ম।

কলম বাঁধিবার নিয়ম জানা থাকিলে প্রত্যেক গৃহস্থই আপন আপন দুই একটী গাছ রোপণ করিয়া ফল-ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। র গাছের একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, আটির গাছ অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে ফল-ভোগ করিতে পারা যায় এবং ফলও ঠিক মূলগাছের ন্যায় হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় আটির চারায় মূলগাছের ফলের এবং গুণ প্রাপ্ত হয় না এবং ফল ফলিতেও প্রায় সাত আট বৎসর লাগে। লেংড়া, ফজলী এবং বোম্বাই প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্রের

আটিতে যদিও চারা হইতে দেখা যায় কিন্তু তাহা ফলিতে অনেক বৎসর প্রতীক্ষা করিতে হয় এবং ফলের আকার, গঠন ও আস্বাদন প্রায় মূলগাছের আম্রের ন্যায় হয় না। এই সকল কারণে আম্রের যোড়কলম বাঁধাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

যোড়কলম বাঁধা অতি সহজ; মনে করিলে প্রত্যেক গৃহস্থ উহা বাঁধিতে পারেন। কোন কাজের জন্যেই গৃহস্থকে পরমুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নহে। এজন্য আমরা আশা করি, গৃহস্থগণ কলম বাঁধিবার নিয়ম অবগত হইয়া স্ব স্ব গৃহসংলগ্ন ভূমিতে নানা প্রকার ফল-বৃক্ষ রোপণ করিয়া পরমানন্দে ফল-ভোগ করিতে থাকুন। সামান্য ফলের জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়া কিম্বা অর্থব্যয় করা গৃহস্থদিগের পক্ষে একটী কলঙ্ক।

যেরূপ প্রণালীতে আম্রের যোড়কলম বাঁধিতে হয়, এক্ষণে তাহার বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। কলম বাঁধিবার পূর্ব্বে কয়েকটী কথা মনে রাখা আবশ্যক।

১। এক বৎসর বয়স্ক এরূপ চারার সহিত কলম বাঁধাই প্রশস্ত।

২। মিষ্ট আম্রের চারার সহিত মিষ্ট আম্রের কলম বাঁধা উচিত।

৩। যে ডালে যোড় বাঁধিতে হইবে, তাহার বয়স এবং চারার বয়স যেন একরূপ হয়।

৪। যে চারা ও ডালে কলম হইবে, উভয়ই যেন বেশ সতেজ থাকে।

প্রথমে আটির চারা এক একটি টব বা গামলায় পুতিয়া রাখিতে হইবে এবং উহা লাগিয়া গেলে, সেই চারা লইয়া কলম বাঁধা আবশ্যক। কলম বাঁধিবার পূর্ব্বে গাছের যে যে ডালে যোড় বাঁধিতে হইবে, সেই সেই ডালের নীচে বাঁশের ভারা বা মাচা বাঁধিয়া ঐ টবগুলি তথায় স্থাপন করিতে হইবে। অর্থাৎ যে শাখায় কলম হইবে, তাহার পার্শেই যেন টব বসান হয়, টবের চারার মাথা এবং কলম বাঁধিবার ডালের মাথা যেন সমান উচ্চ থাকে।

এইরূপে চারাগুলি ভারাতে স্থাপন করা হইলে একখানি ধারাল ছুরী লইয়া ঐ ডালের তিন চারি আঙ্গুল পরিমিত স্থানের দশ আনা অংশ এবং পার্শ্বস্থ চারার ছয় আনা অংশ ছুলিয়া ফেলিতে হইবে। এখন ঐ

শাখা ও চারার কর্ত্তিত অংশ পরস্পর সংযোগ করিয়া সুতা দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হইবে এবং কলম বাঁধার দিন হইতে যে পর্য্যন্ত উহা কাটা না যায়, ততদিন সর্ব্বদা উহা ভাল করিয়া দেখা উচিত। অর্থাৎ সেই সময় যদি মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি না হয়, তবে মূলগাছ এবং চারায় সর্ব্বদা জল দিয়া তাহাদিগকে সতেজ রাখিতে হইবে। কারণ উহারা সতেজ এবং রসাল থাকিলে তাহাদিগের শরীরস্থ রস লইয়া যোড়ের স্থান তেজাল থাকিবে।

সচরাচর প্রায় একমাস হইতে চারিমাসের মধ্যেই আম্রের যোড়কলম লাগিয়া থাকে। কলম কাটিবার অন্ততঃ একমাস অগ্রে কলম বাঁধা স্থানের দুই আঙুল উপরে চারার অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ কাটিবার কারণ বোধ হয়, পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে যে রস সেই অগ্রভাগস্থ পত্রাদির পুষ্টি-সাধন করিত, চারার মাথা কাটিয়া দিলে তাহা আর তথায় যাইতে না পাইয়া যোড়ের স্থান হইতে ঐ শাখার দেহ পোষণ করিতে থাকিবে।

অনন্তর একমাস অতীত হইলে যোড় বাঁধা শাখার বন্ধনের দুই আঙুল নীচে কাটিয়া লইলেই যোড় কলমে চারা প্রস্তুত করা হইল।

যেমন সকল আটিতে ভাল রকম চারা জন্মে না এবং চারা হইলেও ফলের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ গাছের সকল শাখায় ভাল ফল হইতে দেখা যায় না। যে সকল ডাল নীচের দিকে মুখ করিয়া থাকে, সেই সকল ডালে কলম বাঁধিলে প্রায় ফল ফলে না।

গাছ হইতে কলম কাটিয়া চারা এককালে বাগানে রোপণ করিতে পারা যায়। কিন্তু সে সময় যদি বাগানে চারা লাগাইবার কোন প্রকার অসুবিধা থাকে, তবে ঐ চারা ছায়াবিশিষ্ট কোন স্থানে পাতো দিয়া রাখিতে পারা যায় এবং সুবিধামত তথা হইতে উহা তুলিয়া অভিমত স্থানে রোপণ করিলে চলিতে পারে।

বর্ষার মধ্যে যাহাতে কলম বাঁধা শেষ হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।

কলম বাঁধিবার উপযুক্ত আটির চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, ভাল ভাল এক একটী আস্ত আম কোন স্থানে পাতো দিয়া এবং তথায় চারা

দেড়হাত আন্দাজ বড় হইলে, তুলিয়া এক একটী পৃথক পৃথক টবে বা গামলায় রোপণ করা উচিত। এইরূপ নিয়মে টবে স্থাপিত চারা কলমের পক্ষে সুবিধা-জনক।

আমরা অনেক সময় দেখিয়া থাকি, অনেক গৃহস্থ কলিকাতার চারা বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে কলমের চারা খরিদ করিয়া প্রতারিত হইয়া থাকেন। উক্ত বিক্রেতাগণ প্রতিবৎসর একটী স্থানে কতকগুলি আমের আঁটি পাতো দিয়া চারা করিয়া থাকে এবং সেই সকল চারা কিছু বড় হইলে পাশাপাশির দুইটী চারা লইয়া যোড় বাঁধিয়া রাখে। চারার কাঠ শক্ত হইলে ঐ যোড় কাটিয়া কলমের চারা বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এইরূপ কলমের চারায় প্রায় ফল হয় না আর যদিও ফল ফলিয়া থাকে, তাহাও যে উৎকৃষ্ট হয় না তাহার কারণ অনেকেই বুঝিতে পারেন না। এজন্য নিজের তত্ত্বাবধানে কলম প্রস্তুত করাই ভাল। কারণ যত্ন ও ব্যয় করিয়া অবশেষে যদি প্রতারিত হইতে হয়, তাহা যার-পর-নাই আক্ষেপের বিষয়।

নাসিকা হইতে হঠাৎ রক্ত-স্রাব।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, বালক ও বালিকাগণ ক্রীড়াদি করিয়া বেড়াইতেছে, কিম্বা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে, অথবা শয়ন করিয়া রহিয়াছে, সেই সময় হটাৎ তাহাদিগের নাসিকা হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। দুর্ব্বল অপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট অর্থাৎ যাহাদিগের শরীরে রক্তের পরিমাণ অধিক এরূপ বালক বালিকাদিগের মধ্যে অনেকেরই এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক প্রকার রোগের অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর, প্লীহা, কৃমি এবং নাসা প্রভৃতি পীড়াতেও নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাব হইয়া থাকে। নূতন অথবা জীর্ণ রোগে এইরূপ রক্ত-স্রাব চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে আরাম করা উচিত।

সুস্থ-দেহ বালক ও বালিকার নাসিকা হইতে হটাৎ রক্ত-স্রাব দর্শন করিয়া

অনেক সময় অনেক গৃহস্থ নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ যে সকল স্থানে উপযুক্ত চিকিৎসক নাই, তথায় ঐরূপ বিব্রত হওয়া কিছু অসঙ্গত নহে। এজন্য প্রত্যেক গৃহস্থের উচিত এ সম্বন্ধে দুই একটী সহজ ঔষধ অথবা নিবারণের উপায় শিখিয়া রাখেন; কারণ অনেক সময় দেখা গিয়াছে, চিকিৎসক ডাকিয়া আনিতে আনিতে বালক বালিকারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাব হইলেই যে, তাহা অপকার-জনক এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে, তবে স্থল বিশেষে অনিষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য প্রথম হইতেই সতর্ক হওয়া উচিত। নাসিকা হইতে অল্প পরিমিত রক্ত পড়িলে তাহা নিবারণ না করাই ভাল;—কারণ স্বভাব হইতে যেমন রক্ত-স্রাব হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রায় আপনাপনিই উহা বন্ধ হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ উহা রোধ করিলে অন্য কোন প্রকার রোগ হইবার খুব সম্ভব। প্রকৃতির কেমন আশ্চর্য্য নিয়ম, আমাদের দেহে আবশ্যকের অতিরিক্ত কিছুই থাকিতে পারে না, শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শোণিত হইলেই সময় সময় তাহা নির্গত হইয়া শরীরস্থ রক্তের সমতা রক্ষা করিয়া থাকে। আবার সময় বিশেষে এরূপও দেখা যায়, অন্য কোন প্রকার রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐরূপ শোণিত-স্রাব হইয়া সেই রোগের আক্রমণ হইতে দেহ রক্ষা করিয়া থাকে। এইজন্য সামান্য রক্ত-স্রাব নিবারণ না করাই ভাল। কিন্তু যখন দেখা যাইবে, রক্ত-স্রাব অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে, তখন আর তাহাতে উদাসীন না থাকিয়া তৎক্ষণাৎ নিবারণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

লক্ষণ—কোন কোন বালক বালিকার এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, রক্ত-স্রাবের পূর্ব্বে মাথাকামড়ানি, আবল্যভাব, শরীরে জড়তা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত বালক বালিকার নাসিকা হইতে কিয়ৎপরিমাণ রক্ত-স্রাব হইলে তাহাদিগের ঐরূপ অসুস্থভাব ঘুচিয়া যায় এবং শরীর সুস্থ বোধ হয়।

নিবারণ উপায়—(১) একখানি ভিজা গামছা বা টুয়ালে অথবা

নেকড়া পীঠের দিকে অর্থাৎ ঘাড়ের নীচে দুই কাঁধের মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া রোগীকে চীৎ করাইয়া খানিকক্ষণ শোওয়াইয়া রাখিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

(২) শীতল জলে গামছা ভিজাইয়া তাহা অল্প নিংড়াইয়া নাকে ও কপালে বুলাইতে হইবে ও দুই হাত শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে এবং একটী বোতল অথবা ঘটীতে গরম জল পূরিয়া দুই পায়ের তলায় উহা স্পর্শ করাইতে হইবে।

(৩) কোন কোন সময় পীঠের উপর অর্থাৎ ঘাড়ের নীচে দিয়া একটী চাবিকাটি দুই চারিবার গড়াইয়া ফেলিয়া দিলেও উপকার হইয়া থাকে। উহা যেন পীঠের দাঁড়ার উপর দিয়া মাটিতে আসিয়া পড়ে।

(৪) এক টুকরা বরফ অভাবে শীতল জল রোগীর নাকের উপর ও ভিতরে দিতে হইবে।

(৫) রোগীর মাথা একটু উচুঁ করিয়া শোওয়াইয়া রাখিলেও নিবারণ হইয়া থাকে।

(৬) সরলভাবে রোগীর দুই হাত দুই কাণের পাশ দিয়া উপরে তুলিয়া আবার দুই হাতের আঙুলে দুই কনুই ধরিয়া রাখিতে হইবে, ইহাও একটী নিবারণের উপায়।

(৭) এক মুঠা দূর্ব্বা ঘাস ছেঁচিয়া তাহার রস নাস লইলেও রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে। যাহারা নাস লইতে অক্ষম, তাহাদিগের নাকের ভিতর পিচকারী দ্বারা উহা প্রবেশ করিয়া দিতে হইবে।

(৮) গাঁদা ফুলের পাতার রস নাস লইলেও রক্ত-স্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

(৯) একটু পরিষ্কৃত ভিজা তুলাতে এক খি সুতা বাঁধিয়া আঙুলের অগ্রভাগ করিয়া ঐ তুলা যে নাক দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রক্তপড়া বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে এবং উহা রহিত হইলে, সেই সুতাগাছটী ধরিয়া আস্তে আস্তে তুলা বাহির করিয়া লইতে হইবে।

(১০) ফটকিরি খিচ-শূন্যভাবে গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া একটী

ভিজা সলিতায় মাথাইয়া রক্ত-স্রাব পথে বারম্বার দিতে থাকিলে শীঘ্রই উহা বন্ধ হইয়া থাকে।

(১১) শীতল জলে সির্কা (ভিনিগার) মিশাইয়া সেই জলের নাস লইলে এবং উহা দ্বারা কপাল, নাক ও ঘাড় ধুইলেও নিবারণ হয়।

(১২) কোন কোন সময় রক্তস্রাবকালে নাক টিপিয়া ধরিয়া রাখিলেও রক্ত-রোধ হইয়া যায়।

রক্ত-স্রাবের সময় যে গৃহে রোগী অবস্থিতি করে, তথায় অধিক লোক উপস্থিত থাকিলে গৃহ গরম হইয়া রোগীর অপকার হইবার সম্ভব, এজন্য গৃহে অধিক লোক না রাখিয়া চারিদিকের দ্বার ও জানালা খুলিয়া দিয়া বায়ু সঞ্চার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব সাবধানতা—যে সকল বালক ও বালিকাদিগের নাসিকা হইতে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ রক্ত-স্রাব হইয়া থাকে, গৃহস্থগণের উচিত প্রতিদিন প্রাতে বালকগণ শয্যা হইতে উঠিলেই ভিজা গামছা দ্বারা তাহাদিগের গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিবেন। প্রাতে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে পরিস্কৃত বায়ু সঞ্চালিত স্থানে ভ্রমণ ও ক্রীড়া করিবার ব্যবস্থা করিবেন। আর স্নানের সময় জলে অল্প পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই জলে বালক ও বালিকাদিগকে স্নান করাইবেন।

কখন কখন প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যেও এই পীড়া হইয়া থাকে ; অতএব উপরি লিখিত ব্যবস্থা তাঁহাদিগের পক্ষেও অবলম্বনীয়।

রক্ত-স্রাব নিবারণ করিতে যে সকল উপায় লিখিত হইল, ঐ সকল অবলম্বন করিয়া যদি রক্ত-স্রাব নিবারিত না হয়, তবে উপযুক্ত চিকিৎসকের উপদেশানুসারে চিকিৎসা করাইতে ঔদাস্য থাকা উচিত নহে।

গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর কর্ত্তব্য

গর্ভ-সঞ্চার হইতে প্রসব পর্য্যন্ত সময়কে গর্ভকাল কহে। গর্ভাবস্থায় নারীগণের কর্ত্তব্যবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কি শারীরিক কি মানসিক সকল বিষয়েই সতর্ক থাকা প্রত্যেক গর্ভবতীর যেমন গুরুতর কাজ, সেইরূপ প্রত্যেক গৃহস্থগণকেও সেই সময় গর্ভিণীর পরিচর্য্যা বিষয় বিশেষরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক। গর্ভবতী রমণীর কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে তদ্দ্বারা কেবলমাত্র যে, তাহার অনিষ্ট হইয়া থাকে, এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে, সেই অনিষ্টে গর্ভ-জাত শিশুরও অপকার হইয়া থাকে; অনেক সময় আবার সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া পরিবার-মণ্ডলীর বিষাদ উপস্থিত করিতেও ত্রুটি করে না। ফলতঃ গর্ভিণীর উপর যখন ভাবী শিশুর ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিয়া থাকে, তখন গর্ভাবস্থায় বিশেষরূপ সাবধান থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সকল দেশীয় চিকিৎসকগণই গর্ভাবস্থায় বিশেষরূপ সাবধান থাকিবার জন্য বিস্তর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। গর্ভ সঞ্চার হইতেই গর্ভবতীকে সন্তানের মাতা বিবেচনা করিয়া শিশুর জীবনের জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক। আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিগণ গর্ভাবস্থায় নারীগণের প্রতি অনেকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। গর্ভাবস্থায় রমণীগণ সতত উত্তম বস্ত্র পরিধান এবং অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিয়া সতত প্রফুল্ল-চিত্ত ও শুদ্ধচারিণী থাকিবেন। সুমিষ্ট, স্নিগ্ধ, হৃদ্য দ্রব্য, লঘু, সুসংস্কৃত এবং পুষ্টি-কর দ্রব্যাদি ভোজন করিবেন। ব্যায়াম কিম্বা অপকৃষ্ট বিষয়ে মন দিবেন না। মৈথুন অথবা অতিরিক্ত আমোদ, রাত্রি জাগরণ, শোক, আরোহণ, রক্ত-মোক্ষণ, বেগ-রোধ এবং উৎকট আসন পরিত্যাগ করিবেন। আঘাতাদি দ্বারা গর্ভিণীর যে যে অঙ্গে আঘাত লাগিয়া থাকে, গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই অঙ্গ পীড়িত হওয়া সম্ভব। গর্ভিণী বিকৃতাকার, মলিন কিম্বা হীনাঙ্গী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে না। দুর্গন্ধ আঘ্রাণ, অপ্রীতি-কর দ্রব্যাদি দর্শন করিবে না। শুষ্ক, পর্য্যুষিত

কিম্বা অপক্ক অন্নাদি আহার করিবে না। উচ্চৈস্বরে কথা কহা কিম্বা যে সকল কার্য্য করিলে গর্ভনাশের সম্ভব তাহা পরিত্যাগ করিবে। (১)

গর্ভবতী নারী সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, তাহা প্রতিপালন করা অতীব আবশ্যক।

গর্ভস্রাবই গর্ভাবস্থার গুরুতর আশঙ্কা। অতএব যে সকল কার্য্য করিলে গর্ভস্রাবের কোনরূপ আশঙ্কা থাকে না তাহা প্রতিপালন করিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

(১) গর্ভিণী প্রথমাদহ্নঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ।
ভবেচ্ছুক্লাম্বরা দেবগুরুবিপ্রার্চ্চনেরতা॥
ভোজ্যন্তু মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যন্দ্রবং লঘু।
সংস্কৃতং দাপনীযন্তু নিত্যমেবোপযোজয়েৎ॥
গুর্ব্বিণী নতু কুর্ব্বীত ব্যায়ামমপতর্পণম্।
ব্যায়ামঞ্চ ন সেবেত ন কুর্য্যাদিতিতর্পণম্॥
রাত্রৌজাগরণং শোকং যানাস্থারোহণং তথা।
রক্তমোক্ষং বেগরোধং ন কুর্য্যাদুৎকটাসনম্॥
দোষাভিঘাতৈগর্ভিণ্যা যো যো ভাগঃ প্রপীড্যতে।
স সভাগঃ শিশোস্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড্যতে॥
মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং ন স্পৃশেৎস্ত্রিয়ম্।
ন জিঘ্রেদপি দুর্গন্ধং ন পশ্যেন্নয়নাপ্রিয়ম্॥
বচাংসি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োর প্রিয়াণি চ।
নান্নং পর্য্যুষিতং শুষ্কং ভুঞ্জীত কথিতং নচ॥
চৈত্যশ্মশানবৃক্ষাংশ্চ ভবাং শ্চাপ্য যশস্করান্।
বহির্নিষ্ক্রমণং ক্রোধং শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
নোচ্চৈর্ব্রূয়ান্ন তৎকুর্য্যাদ্ যেন গর্ভো বিনশ্যতি।
নমৃদাস্তরণং কুর্য্যান্নতুচ্চং শয়নাসনম্॥
এতাংস্ত নিয়মান্ সর্ব্বান্ যত্নাৎ কুর্ব্বীত গুর্ব্বিণী।
ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

যে সকল গর্ভবতী নারীর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, তাঁহাদিগের পক্ষে যদিও বিশেষ কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন না করিলেও চলিতে পারে; কিন্তু অসুস্থ ও দুর্ব্বল গর্ভবতী রমণীকে যে, গর্ভাবস্থায় সতত শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়, তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। সুস্থাবস্থায় যে সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়, গর্ভাবস্থায় সেইরূপ করিলে যে, কতদূর অনিষ্ট হইবার সম্ভব, তাহা বুদ্ধিমান গৃহস্থমাত্রেই বুঝিতে পারেন।

গর্ভাবস্থায় নারীগণ যেরূপ নিয়মে চলিবেন, প্রসবের সময় সেইরূপ প্রসব কার্য্যে সাহায্য পাওয়া যায়, ইহা প্রত্যেক গর্ভিণীর জানিয়া রাখা উচিত; গর্ভিণী যদি গর্ভাবস্থায় একেবারে পরিশ্রম বিমুখ হয়েন, তাহা হইলে প্রসব সময়ে প্রায় কষ্ট পাইতে দেখা যায়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের রমণীগণ গর্ভাবস্থায় একটুও নড়িয়া বসেন না, সর্ব্বদা শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া থাকেন, দুঃখের বিষয় এই প্রসবের সময় তাঁহারা প্রায়ই অধিক কষ্ট-ভোগ করিয়া থাকেন। সামান্য গৃহস্থ ঘরের রমণীগণ প্রায় প্রসবকালে অধিক কষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন না। বাস্তবিক স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রসব করিতে গর্ভবতীকে অধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

গর্ভের সময় হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত গর্ভবতী রমণীকে আহার, স্নান, পরিচ্ছদ, ব্যায়াম বা অঙ্গচালনা, মানসিক উত্তেজনা এবং ঔষধ ব্যবহার এই কয়টী বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগ দিতে হয়। কি নিয়মে ঐ সকল বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, নিম্নে তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ লিখিত হইল।

আহার—পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সুমিষ্ট, স্নিগ্ধ, এবং পুষ্টি-কর প্রভৃতি লঘু দ্রব্য সমূহ গর্ভবতী রমণীর আহার করা উচিত। কি সহজ শরীরে কিম্বা গর্ভের অবস্থায় যে কোন সময়েই অপরিমিত অস্বাস্থ্য-কর দ্রব্য আহার করিলে, সহজ শরীরে যেরূপ অপকার করিয়া থাকে, গর্ভাবস্থায় যে, তদপেক্ষায় অধিক অনিষ্ট করিয়া থাকে, তাহা প্রত্যেকের মনে রাখা আবশ্যক। গর্ভাবস্থার প্রথমাবস্থায় গর্ভিণীদিগের প্রায়ই বমি হইয়া থাকে। সে সময় যখন নিয়মিত আহার ধারণ করিতে তাঁহারা সমর্থ হয়েন না

শালী ব্যক্তিদিগের রমণীগণ গর্ভাবস্থায় একেবারে পরিশ্রম বর্জ্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু পরিশ্রম একেবারে ত্যাগ না করিয়া সামান্য শ্রমজনক সাংসারিক কার্য্যে পরিশ্রম করিলে প্রসবের সময় বরং উপকার হইবার সম্ভব। সামান্যরূপ অঙ্গ চালনা করিলে তদ্দ্বারা ক্ষুধা বৃদ্ধি এবং পরিপাকের সাহায্য হইয়া থাকে। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ছাদের উপর কিম্বা উঠানে অল্প অল্প ভ্রমণ করিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করা উচিত।

গর্ভাবস্থায় একেবারে পরিশ্রম ত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা কেবলমাত্র যে, পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে এরূপ নহে, তদ্দ্বারা গর্ভস্থ শিশুরও বহুবিধ অপকার হইতে দেখা যায় ; এমন কি অনেক সময় শিশু গর্ভে মৃত হইতে দেখা যায়।

মানসিক উত্তেজনা—মনের সহিত শরীরের এরূপ নিকটতর সম্বন্ধ যে, মন অসুস্থ এবং দুর্ব্বল হইলে তদ্দ্বারা শরীরও নানা অসুখের আকর হইয়া উঠে। গর্ভাবস্থায় রাগ, দ্বেষ, শোক কিম্বা দুঃখ দ্বারা আক্রান্ত হইলে গর্ভস্থ শিশুরও অনিষ্ট হইয়া থাকে, এজন্য গর্ভাবস্থায় বিশেষরূপ সাবধান হইয়া সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকা উচিত। নৃত্যগীতাদি দর্শন কিম্বা শ্রবণ করা অকর্ত্তব্য, কারণ তদ্দ্বারা মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ অন্ধকার গৃহে একাকিনী গমনাগমন করা, ভয়জনক ঘটনা দর্শন ইত্যাদি পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক।

ঔষধ—এতদ্দেশীয় অনেক গৃহস্থের এরূপ ধারণা যে, গর্ভাবস্থায় কোন প্রকার ঔষধ ব্যবহার করা অবিধি। কিন্তু এ বিশ্বাস যে, সম্পূর্ণ ভুল তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই সহজেই বুঝিতে পারেন। রোগ উপস্থিত হইলেই তাহার প্রতীকার করা আবশ্যক। তবে অত্যন্ত উত্তেজক কিম্বা বিষাক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলে যে, অনেক সময় গর্ভ নাশের সম্ভব তাহা মনে রাখিয়া সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে ঔষাধাদির ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। হাতুড়ে কিম্বা অব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের ঔষধ ব্যবহার না করাই যুক্তিসিদ্ধ। গর্ভাবস্থায় যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ উহা দ্বারা বহুবিধ রোগ হইবার সম্ভব। যদি উপযুক্ত

আহার, পরিমিত পরিশ্রম, নিয়মিত অঙ্গচালনা, আবশ্যকমত নিদ্রা, প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উত্থান করা যায়। তাহা হইলে প্রায় গর্ভিণীকে কোষ্ঠ-বদ্ধ-জনিত রোগ ভোগ করিতে হয় না। কোষ্ঠ-বদ্ধ হইলে সামান্য বিরেচক দ্রব্য ব্যবস্থা করিয়া উহা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল অথবা রুগ্ন স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে সামান্য ঘৃত দ্বারা রন্ধন করা মাংস আহার করা ভাল। মাংস ভক্ষণে যাঁহাদিগের রুচি না থাকে, দুগ্ধ ব্যবহার করিলে সে আপত্তি নষ্ট হইতে পারে।

গো-জাতির রক্তামাশয়।

আমাশয় পীড়া উপস্থিত হইলে মনুষ্যগণ যেরূপ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন, গবাদি পশুগণের মধ্যেও সেইরূপ কষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নানা কারণে এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এদেশে এমন গৃহস্থই নাই যে, প্রায় তাঁহাদিগের গৃহে দুই একটী গোরু নাই। গবাদি পশু পীড়িত হইলে রোগ প্রতিকারের নিমিত্ত পরমুখাপেক্ষী না হইয়া তাহার সহজ চিকিৎসা শিখিয়া রাখা যে, প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে একটী গুরুতর আবশ্যক, তাহা বোধ হয় সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। সুতরাং এস্থলে গো-জাতির রক্তামাশয় রোগের চিকিৎসা উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় নিম্নে লিখিত হইল।

লক্ষণ।—গো-জাতির এই রোগ উপস্থিত হইলে তাহারা বারম্বার নাদে। নাদের সহিত আম ও রক্ত মিশ্রিত থাকে। কখন কখন গুটলি বা জলবৎ নাদের সঙ্গেও ঐ সকল নির্গত হইয়া থাকে। ঐ আম ঠিক ডিমের ভিতরাকার ছেকড়া ছেকড়া লালের ন্যায়। রোগের সময় কখন কখন কম্প দিয়া জ্বরও হইতে দেখা যায়। উদরাময় এবং বসন্ত রোগের পরেও এই রোগ হইয়া থাকে। নাদিবার সময় অত্যন্ত বেগ দিতে দেখা যায়। কখন কখন এত জোরে বেগ দেয় যে, মলদ্বার উল্টাইয়া গিয়া

থাকে। পেটে বেদনার সঙ্গে শূলের লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বদা বাহ্যে হইতে থাকে।

চিকিৎসা।—অত্যন্ত বেগের সহিত নাদ হইতে থাকিলে এবং পেটে বেদনা কিম্বা শূলনির লক্ষণ দেখিলে একগাছি দড়ি দিয়া পেট কসিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। ইহাতেও নিবারণ না হইলে, লোহা পুড়াইয়া লালবর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা অল্প পরিমাণে দাগ দিলেও শীঘ্র উপকার হইবে। এই সকল উপায় ভিন্ন লিখিত ঔষধগুলি ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

গরম জলে এক টুকরা কম্বল কিম্বা ফ্লানেল কাপড় ভিজাইয়া আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত পেটে সেক দিতে হইবে। যে স্থানে সেক দেওয়া যাইবে, সেখানে শীতল বাতাস না লাগে, এজন্য একখানি শুকনা নেকড়া কিম্বা কম্বল দিয়া উত্তমরূপ পুঁছিয়া সরিষার তৈল চারি ভাগ, তার্পিন তৈল দুইভাগ, উত্তম করিয়া মিশাইয়া মালিস করিতে হইবে।

ধারকপিচকারী।

ভাতের ঘন মাড়	...	...	...	এক সের।
আফিং	...	...	...	সিকি তোলা।

এই দুই দ্রব্য উত্তমরূপ মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী দিলে রোগ আরাম হইবে।

এই সকল ঔষধে উপকার না হইয়া যদি অধিক পেট নাম্বাইতে থাকে, তবে নিম্নলিখিত ঔষধটী ব্যবহার করিতে হইবে।

ধূতুরার বিচির গুঁড়া	...	...	...	ছয় আনা।
কর্পূর	...	...	...	বার আনা।
মদ	...	...	...	দুই ছটাক।

মদে কর্পূর মিশাইয়া তাহাতে ধূতূরা বিচির গুঁড়া এবং ভাতের তপ্ত ঘন মাড় এক সের দিয়া সেবন করাইতে হইবে।

আমাশয় সম্পূর্ণ আরাম না হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সফেদা	...	...	...	দুই আনা।
চা-খড়ির গুঁড়া	...	...	...	আড়াই তোলা।
আফিং	...	...	...	সিকি তোলা।

এই সকল দ্রব্য ভাতের ঘন মাড়ের সঙ্গে মিশাইয়া দিন দুইবার সেবন করাইতে হইবে।

পথ্য।—আমাশয় পীড়া হইতে যত দিন পশু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিতে না পারে, ততদিন লঘু-পাক দ্রব্য আহার করিতে দিতে হইবে। কেবল মাত্র পথ্যই যে, অনেক প্রকার রোগের প্রধান ঔষধ, তাহা মনে রাখা উচিত। এজন্য অর্দ্ধেক তিষির ও অর্দ্ধেক ভাতের মাড় এবং কলাই সিদ্ধ করিয়া পীড়িত পশুকে খাইতে দেওয়া আবশ্যক। এই মাড়ের সঙ্গে অল্প পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করিয়া দিলে সমধিক উপকারের কথা। মল আঁটিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত কেবল ভাতের মাড় দিতে হইবে। পরে অর্দ্ধেক ভাতের মাড় ও অর্দ্ধেক তিষির মাড় দেওয়া উচিত। রোগ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত সহজে পরিপাকযোগ্য টাট্‌কা দ্রব্য আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। এই সময় অতিরিক্ত আহার দিলে যেমন রোগ বৃদ্ধি হইবার সম্ভব, সেইরূপ উপযুক্তরূপ আহারের অভাব হইলেও রোগ হইবার কথা। অল্প পরিমাণ কাঁচা ঘাস এবং সামান্য বিচালী দিলেও কোন অনিষ্ট হয় না। এই সময় খৈল আদৌ খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কারণ উহাতে তৈলের অংশ থাকাতে রোগ বৃদ্ধি হইবার সম্ভব। আমাশয় রোগে বেল একটী প্রধান পথ্য ও ঔষধ মনে রাখা উচিত। বেল পুড়াইয়া অথবা কাঁচা বেল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া কিম্বা সিদ্ধ করিয়া আহার করিতে দিলে সমধিক উপকার হইয়া থাকে।

বাসস্থান।—যে স্থান বেশ শুষ্ক, পরিষ্কার, উচ্চ, ছায়াযুক্ত এবং ভালরূপ বাতাস খেলে এরূপ স্থানে পীড়িত পশুকে রাখা আবশ্যক। রাত্রিকালে শীত পড়িলে একখানি কম্বল দ্বারা পশুর গাত্র আচ্ছাদন করিয়া

দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সময় পশুর মল-মূত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

লিখিতরূপ ঔষধ ও পথ্য এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিলে অল্প দিনের মধ্যেই গোরুর রক্তামাশয় নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

দিক-নির্ণয়।

আমরা বাঙ্গালী; সমুদ্রযাত্রা করি না সুতরাং ক্ষণে ক্ষণে দিক্ নির্ণয় করা আমাদের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু গৃহাদি পত্তন, দেবালয় স্থাপন বা পুষ্করিণী প্রভৃতি খননকালে, মাঝে মাঝে আবশ্যক হইয়া থাকে। "কম্পাস্" দিক নিরূপণের সহজ উপায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণের পক্ষে উহা সহজ প্রাপ্য নহে এবং অনেকেই উহার ব্যবহারও সম্যক অবগত নহেন। সুতরাং গৃহনির্ম্মাণাদি কার্য্যে দিক নিরূপণের প্রয়োজন হইলে, উহা প্রায় আন্দাজেই সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু সম্যক বায়ু সঞ্চালন এবং উত্তাপ ও আলোকের উপর, গৃহাদির স্বাস্থকারিতা যেরূপ নির্ভর করে, তাহাতে স্থানীয় বায়ু প্রভৃতির গতি জানিয়া, ঠিক দিক নিরূপণ করত, উহাদিগের পত্তন দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নিম্নে দিক নিরূপণ করিবার একটী উপায় লিখিত হইয়াছে। উহা অতি সহজ এবং ব্যয়-শূন্য; সুতরাং সকলেরই আয়ত্তাধীন।

যে স্থানে দিক নিরূপণ করিতে হইবে, সেই স্থানে অথবা যদি উহা অসমতল হয়, কিম্বা তথায় রৌদ্র না যায়, তাহা হইলে, উহার নিটস্থ কোন সমতল বা অনাবৃত ভূমিখণ্ডের উপর, একটী সরল লাঠী ওলন করিয়া ঠিক লম্বভাবে পুতিত হইবে। ঐ লাঠীরগোড়া কেন্দ্র করিয়া উক্ত ভূ-ভাগের উপর একটী বৃত্ত অঙ্কিত কর। ঐ বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ যেন উক্ত লাঠীর প্রতাঃকালের ছায়ার অপেক্ষা বড় না হয়। লাঠীর অগ্রভাগের ছায়া,

দুইবার ঐ বৃত্তের পরিধি, দুই বিন্দুতে স্পর্শ করিবে—একবার দ্বাদশ ঘটিকার পূর্ব্বে এবং আর একবার উহার পরে সাবধানের সহিত যথা সময়ে নিরীক্ষণ করত, ঐ দুই বিন্দু স্থির করিয়া, উহাদের মধ্যস্থিত, উক্ত বৃত্তের পরিধির অংশ সম দুইভাগে বিভক্ত কর। যে বিন্দুতে উহা সমদ্বিখণ্ডিত হইবে, সেই বিন্দু এবং উক্ত লাঠীর গোড়া, অর্থাৎ ঐ বৃত্তের কেন্দ্র, এই উভয়েষ সংযোগকারী সরলরেখা উত্তর দক্ষিণ-সূচক রেখা হইবে; অর্থাৎ ঐ উভয় বিন্দুতে সংলগ্ন করিয়া একটী দড়ি সরলভাবে বিস্তারিত করিলে, উহার এক প্রান্ত উত্তরমুখে এবং অপর প্রান্ত দক্ষিণ মুখে থাকিবে।

উপরোক্ত বৃত্তের পরিধিতে, উক্ত লাঠীর অগ্রভাগের ছায়াপাত, একবার পূর্ব্বাহ্নে এবং আর একবার অপরাহ্নে হইয়া থাকে। সুতরাং উহা একবার দেখিবার কিঞ্চিৎ ভুল হইলে, উত্তর ও দক্ষিণ-সূচক রেখারও সেই পরিমাণে ভুল হইয়া থাকে। এই ভুল যাহাতে না হয়, সেইজন্য উপরোক্ত একটী বৃত্তের পরিবর্ত্তে, দুই বা তিনটী সমকেন্দ্রিক বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া, উহাদের প্রত্যেকের পরিধিতে উক্ত লাঠীর অগ্রভাগের ছায়াপাত নিরীক্ষণ করিলে ভাল হয়। এইরূপে প্রত্যেক বৃত্তে যে দুই দুইটী বিন্দু পাওয়া যাইবে, তাহাদের মধ্যস্থিত পরিধির অংশগুলি সমভাবে বিভক্ত করিলে, ঐ সমদ্বিখণ্ড-কারী বিন্দুগুলি বৃত্ত সমুদায়ের কেন্দ্রের সহিত এক সরল রেখায় থাকিবে। যদি ঐরূপ না থাকিয়া কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হয়, তাহা হইলে উহাদের অন্তরের গড় ধরিয়া একটী বিন্দু নিরূপণ করত, ঐ বিন্দু এবং উক্ত লাঠীর গোড়া, এই উভয়ের সংযোগকারী সরল রেখা, ঠিক উত্তর দক্ষিণ-সূচক রেখা হইবে। স্থান ভেদে কম্পাস্ ও দিক্ নিরূপণে কিঞ্চিৎ ভুল হইয়া থাকে, কিন্তু উপরোক্ত নিয়মে ঠিক নিরূপণ করিলে তাহাতে অণুমাত্রও ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপে উত্তর দক্ষিণ-সূচক রেখা এক স্থানে নিরূপিত হইলে, প্রয়োজনানুসারে, সমান্তরাল রেখা টানিয়া উহা নিকটবর্ত্তী স্থানান্তরে অনায়াসে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে।

উত্তর ও দক্ষিণ দিক নিরূপিত হইলে, অপর দুইদিক এবং ঈশান ও

বায়ু প্রভৃতি চারি কোণ, সহজেই স্থির করা যাইতে পারে। যদি নিকটে মাটাম থাকে, তাহা হইলে উক্ত উত্তর দক্ষিণ-সূচক রেখায় মাটামের এক বাহু লাগাইলে, উহার অপর বাহু পূর্ব্ব ও পশ্চিমাভিমুখে থাকিবে। যদি মাটাম না থাকে তাহা হইলে উত্তর দক্ষিণ-সূচক রেখার পরস্পর তিন হস্ত অন্তরে দুইটী পেরেক বিদ্ধ কর। দুই গাছি সূত্র লইয়া উহাদের এক-গাছির অগ্রভাগ একটী পেরেক এবং অপর গাছির অগ্রভাগ অপর পেরেকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ কর। অনন্তর একটী সূত্রে, পেরেক হইতে চারি হস্ত অন্তরে এবং অপরটীতে পেরেক হইতে পাঁচ হস্ত অন্তরে এক একটী গাঁইট দাও। পরে ঐ দুইটী গাঁইট একত্রিত করিয়া, সূত্রদ্বয় টান টান করিয়া ধরিলে, চারি হস্ত পরিমিত সূত্রটী পূর্ব্ব ও পশ্চিম মুখে থাকিবে।

এইরূপে চারিদিক নিরূপণ করিয়া উহাদের মধ্যস্থিত কোণগুলি সমদ্বিখণ্ডিত করিলে, ঈশান, বায়ু প্রভৃতি কোণ চতুষ্টয় জ্ঞাত হওয়া যায়।

অপরিচিত স্থানে যাইলে, কাহারও কাহারও দিক ভুল হইয়া থাকে। উপরোক্তরূপে দিক নিরূপণ করিতে কিঞ্চিৎ সময়ের আবশ্যক হয়। সুতরাং পথিমধ্যে দিগ্‌ভ্রম হইলে, দিবসে বেলা অনুমান করত সূর্য্য দেখিয়া এবং রাত্রিতে নক্ষত্রাদি দেখিয়া দিক লক্ষ্য করিতে হয়। কিন্তু যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে বৃক্ষাদি দেখিয়া মোটামুটিরূপে দিক নিরূপণ করা যাইতে পারে। গাছের ছাল দক্ষিণদিক অপেক্ষা উত্তরদিক, কিঞ্চিৎ বিবর্ণ ও অপরিস্কৃত থাকে। দক্ষিণদিকের ছাল অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও মসৃণ হয়। ছালের এইরূপ বিভিন্নতা দেখিয়া উত্তর ও দক্ষিণ-দিক জানা যায়। যে সকল লোক জঙ্গল মধ্যে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকে, তথায় তাহাদিগের দিক নিরূপণ পক্ষে অন্য কোন সহজ উপায় দেখা যায় না। সুতরাং তাহারা প্রকৃতির এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনায়াসেই দিক নিরূপণ কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। বৃক্ষাদির ছালের যে ঐরূপ প্রভেদ চিহ্ন তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই পরীক্ষা করিলে প্রমাণ পাইতে পারেন।

মুষ্টিযোগ বা টোট্‌কা ঔষধ।

মুষ্টিযোগে যে সকল ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকে, তৎসমুদায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায়, বহুদর্শী চিকিৎসক বহুবিধ ঔষধ দ্বারা যে সকল রোগ আরাম করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, সেই সকল রোগে সামান্য গাছগাছড়া এবং দুই একটী সামান্য দ্রব্য কিম্বা সহজ উপায়ে আরোগ্য হইয়া থাকে। গৃহস্থ ঘরে কথায় কথায় চিকিৎসক আনয়ন করা কিছু সহজ নহে, এজন্য আশা করি আমাদের পাঠকবর্গ এই সকল ঔষধের প্রতি সমধিক যত্নবান হইবেন।

কাশির ঔষধ।—ছোট ছেলেদের যে সময় অত্যন্ত সর্দ্দি লাগিয়া কাশিতে দম আট্‌কাইয়া আইসে, কখন কখন বুকের ভিতর শ্লেষ্মা বদ্ধ হইয়া শ্বাস প্রশ্বাসেরও ব্যাঘাত করিয়া তুলে, এরূপ অবস্থায় যদি মুক্তবর্শির (১) পাতার রস আধ ঝিনুক সেবন করান যায়, তবে তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া সমুদায় শ্লেষ্মা উঠিয়া যাইবে। কাহার কাহার বাহে দ্বারাও উপশম হইয়া থাকে।

মলমূত্র বদ্ধ হইয়া পেট ফুলিয়া রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইলে মুক্তবর্শির পাতা ও সোরা এক সঙ্গে বাটিয়া পেটে প্রলেপ দিলে অবিলম্বে তাহার মল-মূত্র নির্গত হইয়া যাতনার শান্তি করিবে। শিশু হইতে বৃদ্ধের পর্য্যন্ত উহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

শুঁঠ ও গোলমরিচ এবং পিপুল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত অবলেহন করিয়া শেষে মিছরির গুঁড়া খাইলে কাশি ভাল হইবে।

মিছরি আর জাঙ্গিহরীতকী জলে ঘষিয়া দুই ঝিনুক পরিমাণ সেবন করিলে কফ অধঃ হইয়া যায়।

বুকে কফ বসিলে তাহার ঔষধ।—হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, জিরে, ক্ষেত্রজমানী, জ্যেষ্টমধু, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক সিকি তোলা লইয়া গুঁড়া করত মধুর সহিত মিশাইয়া চাটিয়া খাইতে হইবে।

---

(১) কোন কোন স্থানে মুক্তবর্শির গাছকে মুক্তঝুরিও কহিয়া থাকে।

হাঁপানি কাশি।—মিছরি এবং মধু এক সঙ্গে মিশাইয়া প্রদীপের শিশে গরম করিয়া বারম্বার চাটিয়া খাইতে হইবে। আর দিনের মধ্যে তিন চারিবার কডলিভার ওয়েল বুকে এবং পাঁজরে মালিস করিতে হইবে।

মধু ও তুলসী পাতার রস এক ঝিনুক পরিমাণ লইয়া শিশুদিগকে সেবন করাইলে কাশি ভাল হইয়া থাকে।

ময়ুর-পাখা ভস্মও মধুর সহিত মিশাইয়া অবলেহন করিলে কাশি আরাম হয়।

নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাব।—দাড়িমের ফুলের রস নাস লইতে হইবে। ঘৃত দিয়া আমলকী ভাজিয়া ব্রহ্মতালুতে প্রলেপ দিবে। চিনির জলে চন্দন মিশাইয়া নাসিকা দ্বারা পান করিবে।

দন্ত-শূল।—পাপড়ি খয়ের, মুসব্বর, তুঁতে ও কর্পূর সমান পরিমাণ লইয়া গুঁড়া কর এবং যেখানে ফুলিয়াছে, সেখানে দেও। হরীতকী পুড়াইয়া তাহাতে দগ্ধ তুঁতিয়া ও কাঁচা হিরাকস এক সঙ্গে গুঁড়াইয়া দন্ত-মূলে লাগাও সমস্ত যন্ত্রণা নিবারণ হইয়া দাঁতের গোড়া শক্ত হইবে।

কর্পূর ও আফিং একসঙ্গে মিশাইয়া বেদনার স্থানে দেও সকল জ্বালা তৎক্ষণাৎ নরম পড়িবে।

কুচলিয়া জ্বালাইয়া তাহার ধূম রহিত হইলে গুঁড়া করিয়া দন্ত-মূলে লাগাও, দেখিবে তোমার সমুদয় যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইবে।

স্তনের ক্ষত।—শিশুদিগের স্তন-পান জনিত স্তনে ক্ষত হইলে পরিস্কৃত জলে বাব্‌লা কিম্বা দালিমের ছাল সিদ্ধ করিয়া সেই জলে অল্প পরিমাণ ফট্‌কিরির গুঁড়া মিশাইয়া তদ্দ্বারা দিন কতক ক্ষত ধুইলে উহা নিশ্চয় আরাম হইবে।

কাচ অথবা চিনের পাত যুড়িবার উপায়।

গৃহস্থ ঘরে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, কাচ এবং চিনের পাত্রাদি ভাঙিয়া গেলে তাহা ফেলিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু যদি উহা যুড়িবার

উপায় জানা থাকে, তাহা হইলে অনর্থক উহা আর নষ্ট হয় না। আমরা আশা করি পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া কাচ ও চিনা-বাসন প্রভৃতির ফাটা ও ভাঙা সারিয়া লইতে পারিবেন।

হাঁস কিম্বা মুরগী প্রভৃতির ডিমের শাদাংশ পরিষ্কার করিয়া এবং গরম গোঁড়া চুণের গুঁড়র সহিত অত্যন্ত পেষণ করিতে হইবে। এই মিশ্রিত পদার্থে যে পুটিন প্রস্তুত হইবে, তদ্দ্বারা ভাঙা বাসনাদি যুড়িলে উহা বেশ আঁটিয়া যাইবে।

ডিমের ভিতরের তরলাংশ এবং সফেদা সমান পরিমাণে লইয়া এক সঙ্গে পেষণ করিলে যে পুটিন প্রস্তুত হইবে, তদ্দ্বারাও উত্তম যোড় হইতে পারে।

কাচ পাত্রের পরিমাণানুসারে রসুনের খোসা ছাড়াইয়া ছেঁচিয়া তদ্দ্বারা ফাটা কিম্বা ভগ্ন স্থানে যোড় দিলে উত্তমরূপ আঁটিয়া যাইবে।

আল্‌কাতরা গলাইয়া, মুদ্রাশঙ্খ এবং ইঁটের গুঁড়া তাহাতে মিশাইয়া যে এক প্রকার পুটিন প্রস্তুত হইবে, ইহাও যোড়ের পক্ষে অতি উত্তম। কিন্তু যদি উহা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় করিতে হয়, তবে ইঁটের গুঁড়া তীব্র ছির্কাতে ভিজাইয়া তাহার আট ভাগ মুদ্রাশঙ্খ তাহাতে দিয়া নাড়িতে হইবে। এই পুটিন পাথরের ন্যায় কঠিন হইবে।

পাথরের হুঁকার নলিচা এবং লণ্ঠন প্রভৃতির তলায় টিনের চাক্তি খুলিয়া গেলে একটী কাজ কর। একটী পাত্রে রজন ধূনা রাখিয়া জ্বাল দিতে থাক। পরে তাহাতে চা-খড়ি এবং মোম দিয়া আধ ঘণ্টা সময় পর্য্যন্ত জ্বালে রাখিয়া খুব নাড়িতে থাক। যখন দেখিবে সমুদায়গুলি উত্তমরূপ মিশিয়া আটার ন্যায় চটচটে হইয়াছে, তখন তাহা নামাইয়া লও। এই আঠা দ্বারা লণ্ঠন এবং হুঁকা প্রভৃতি যুড়িয়া দেখ কেমন সুন্দর আঁটিয়া গিয়াছে।

গুগ্‌লি কিম্বা শামুকের ভিতর হইতে লালাবৎ যে এক প্রকার রস নির্গত হয়, তদ্দ্বারা কাচের পাত্র যুড়িলে উহা বেশ আঁটিয়া যায়।

ছারপোকা মারিবার উপায়

ছারপোকা যে কিরূপ ক্ষুদ্র শত্রু, সে পরিচয় বোধহয় কাহাকেও লিখিয়া বুঝাইয়া দিতে হয় না। এই শত্রুর যন্ত্রণায় সর্ব্বদাই অস্থির করিয়া তুলে। শয্যা কি আসন কোন স্থানেই স্থির হইয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করিবার যো নাই। এইজন্য প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য বিশেষ যত্ন সহকারে এই শত্রু নিপাত করা। এককালে ছারপোকার বংশ বিনাশ করা বড় সহজ কথা নহে।

গৃহস্থগণ যদি প্রতিদিন আপন আপন বিছানা ও বসিবার আসন অর্থাৎ চেয়ার, বেঞ্চ এবং মাদুর প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে উহার উৎপাত অনেকটা কমিয়া আইসে। বিছানাদি যত ময়লা হয়, বাসস্থান প্রভৃতি যত অন্ধকার স্থানে হয়, ততই ছারপোকার বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অন্যান্য সময় অপেক্ষা বর্ষাকালে ছারপোকা অধিক জন্মিয়া থাকে। কারণ এই সময় প্রায় সর্ব্বদাই বৃষ্টি-পাত হওয়াতে জলীয় হাওয়ায় বিছানা প্রভৃতি অল্প অল্প সেঁতা থাকে, রৌদ্র লাগাইয়া উহা ভালরূপ সুখাইতে পারা যায় না এজন্য ছারপোকার ডিম ফুটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর এই সময়ে ডিমও অধিক পরিমাণে জন্মায়।

প্রতিদিন বিছানা রৌদ্রে দিয়া ছারপোকা বাছিয়া মারিতে হয়। নিত্য মারিতে আরম্ভ করিলে উহার বংশ হ্রাস হইয়া আইসে। যে যে স্থানে ছারপোকা হইয়া থাকে, তথায় অল্প পরিমাণে গুড়, চিনি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য ছড়াইয়া রাখিলে পিপীলিকা সঞ্চার হইয়া উহা বিনাশ করিয়া ফেলে, পিপীলিকা ছারপোকার একটী প্রধান শত্রু।

গন্ধকের ধূঁয়া ছারপোকার একটী পরম ঔষধ। যে ঘরে অত্যন্ত ছারপোকা হইয়া থাকে, সেই ঘরের চারিদিকের দরোজা ও জানালা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিয়া আধ পোয়া গন্ধক এবং গন্ধক মাখান নেকড়ায় আগুণ ধরাইয়া দিয়া চব্বিশ-ঘণ্টা পর্য্যন্ত দরোজা প্রভৃতি বন্ধ রাখিতে

হইবে। এই সময় আর একটী কথা মনে রাখা উচিত অর্থাৎ যে গৃহে ঐরূপ গন্ধক পোড়ান হইবে, সেই ঘর হইতে ভাল ভাল বার্ণিসকরা খাট, পালঙ্গ এবং ভাল বস্ত্রাদি বাহির করা আবশ্যক, কারণ গন্ধকের ধূঁয়াতে ঐ সকল জিনিস নষ্ট হইবার সম্ভব। এইরূপ নিয়মে গন্ধকের ধূঁয়া লাগাইলে ছারপোকার ডিম পর্য্যন্ত মরিয়া যাইবে।

খাট, পালঙ্গ এবং চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতিতে ছারপোকা হইলে এক সের ফট্‌কিরি অল্প গুঁড়া করিয়া ন-পোয়া ফুটন্ত জলে উহা দিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফট্‌কিরি উত্তমরূপে জলের সঙ্গে মিশিয়া না যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা ব্যবহারের উপযুক্ত হয় নাই মনে করিতে হইবে। যখন দেখা যাইবে উহা বেশ মিশিয়া গিয়াছে, তখন ঐ গরম জল যে যে স্থানে ছারপোকা হইয়াছে, সেই সেই স্থানে দিতে হইবে। জল যত গরম থাকে ততই ভাল। লিখিত নিয়মে গরম জল দ্বারা ছারপোকা নিশ্চয়ই মরিবে।

কোন কোন ঘরে এত অধিক ছারপোকা হইয়া থাকে যে, কড়িকাঠ এবং দেওয়াল হইতে আপনিই পড়িতে থাকে, এইরূপ অবস্থাপন্ন গৃহ হইলে কলিচূণে ও রঙে ফট্‌কিরি মিশাইয়া দেয়াল ও কাঠে দেওয়া উচিত।

ফলতঃ ছারপোকা মারিবার যত প্রকার ঔষধ আছে তন্মধ্যে নিত্য বিছানা প্রভৃতি রৌদ্রে দেওয়া এবং সর্ব্বদা মারিতে চেষ্টা করাই ভাল।

কৃষিকার্য্যে গৃহস্থগণের দৃষ্টিরাখা উচিত।

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ঘরে হা ভাত॥

পূর্ব্বকার গৃহস্থগণ চাষ আবাদ করিয়া কেমন সুখস্বচ্ছন্দে সংসার চালাইতেন। অন্ন বস্ত্রের জন্য তাঁহাদিগকে প্রায় অন্যের দ্বারস্থ হইতে হইত

না। কিন্তু সমধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, এখনকার গৃহস্থগণ চাষ আবাদ করাকে অতি নীচ কার্য্য বিবেচনা করিয়া অন্যের গোলামী করাকে সুখ ও সম্মানের কাজ বিবেচনা করিয়া থাকেন। আমাদের পদতলস্থ মৃত্তিকার মধ্যে যে, মনুষ্য-জাতির জীবনোপায় লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, গৃহস্থগণ যতই চাষ আবাদে উদাসীন হইতেছেন, ততই সংসার মধ্যে কষ্ট-স্রোত বৃদ্ধি হইতেছে। এই প্রত্যক্ষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও তাঁহাদিগের জ্ঞানোদয় হয় না! চাষ আবাদে মনোযোগ থাকিলে কি নিয়মে ঐ কার্য্য করিতে হয়, তদ্‌সম্বন্ধে উপরি লিখিত বচনটী জীবন্ত উপদেশ স্বরূপ। যে ব্যক্তি মজুরদিগের সঙ্গে খাটিয়া আবাদ করিতে পারে, তাহার নিশ্চয় লাভ হইয়া থাকে, আর যে তাহা না করিয়া তত্ত্বাবধান করিতে পারে, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ লাভের কথা। যে গৃহস্থ চাষ আবাদে নিজে পরিশ্রম না করিয়া গৃহে বসিয়া চাষের সংবাদ লইয়া থাকে, তাহার লাভের আশা অল্প, সুতরাং তাহার গৃহে অন্নের কষ্ট কথনই ঘুচে না।

কেবলমাত্র যে, পরিশ্রম করিলেই চাষে লাভ হয় এরূপ নহে। চাষের উপযুক্ত সময় না বুঝিয়া উহাতে প্রবৃত্ত হইলেও লাভ করা যায় না, এজন্য মৃত্তিকা ও সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চাষ করিতে হয়। কোন্ কোন্ সময়ে এদেশে চাষ আবাদ করিলে ফসল ভাল হইয়া থাকে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

এদেশে চাষ আবাদের পক্ষে দুইটী সময়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ দিতে হয়। যদিও ভূমির উর্ব্বরতা বশতঃ বার মাসেই চাষ আবাদ চলিতে পারে; কিন্তু বৈশাখ ও আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেই সেই সকল চাষের প্রথম সূত্রপাতের সময়। বর্ষাকালে যে সকল ফসল হইয়া থাকে, সেই সকল ফসলের জন্য বৈশাখ মাসে যেরূপ চাষে মনোযোগ দিতে হয়। সেইরূপ শীত ঋতুর চাষ আবাদের পক্ষে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসও কৃষি-কার্য্যের একটী প্রধান সময় মনে রাখিতে হইবে। শীতের অবসানে মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এজন্য বৈশাখ

মাসে হল চালিত ও খনিত হইলে মৃত্তিকা শিথিল হইয়া থাকে সুতরাং বর্ষার বৃষ্টির জল তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূমির প্রজনন-শক্তি সমধিক বৃদ্ধি করিয়া তুলে। কঠিন মৃত্তিকায় কোন প্রকার চাষ করিলে উদ্ভিদ্-দিগের শিকড় যে, আবশ্যক মত সঞ্চারিত এবং রস গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে, ইহা লোকে সহজেই বুঝিতে পারেন। পক্ষান্তরে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস হইতে বর্ষা প্রায় শেষ হইয়া যায়। সুতরাং এই সময় ভূমিতে চাষ দিলে বর্ষাজাত আগাছা সকল বিনষ্ট এবং বৃষ্টির জল সঞ্চিত বশতঃ ভূমিতে যে অধিক পরিমাণে রস সঞ্চিত হয়, তাহা বিশুষ্ক হইয়া গাছপালার পক্ষে সমধিক উপকারজনক হইয়া থাকে। এই জন্যই এদেশে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস চাষ আবাদের প্রধান সময় মনে রাখা উচিৎ। শীতকালে যে সকল শাক সবজি এবং শস্যাদির ফসল হইয়া থাকে, তজ্জন্য এই সময়টী অত্যন্ত মূল্যবান্ জ্ঞান করা আবশ্যক। যে বৎসর আশ্বিন মাসেই বর্ষা শেষ হয়, সে বৎসর আশ্বিন মাস হইতে নতুবা কার্ত্তিক মাসেই চাষ আবাদ করিতে হয়।

আলু, কপি, মূলা, ছোলা, মটর, গম, যব, তিল, সরিষা একং তামাক প্রভৃতি রবি বা হরিৎ খন্দ চাষের পক্ষে এই সময় অত্যন্ত প্রশস্ত। যাঁহারা ভাদ্র মাসে কপির বীজ ফেলিয়া চারা তৈয়ার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য ক্ষেতে দেড় হাত অন্তর কপির চারা পুতিবেন। পোনর দিন অন্তর উহাতে জল ছেঁচিয়া দিবেন এবং যো হইলে মাটি খুসিয়া দিবেন। মাটি খুসিবার সময় চারার গোড়ায় অল্প পরিমাণে খৈল দেওয়া আবশ্যক। কপির চারা পুতিবার সময় দুই পাশে দাঁড়া বাঁধিয়া তন্মধ্যস্থ জোলে উহা পুতিতে হয়। এই সময় সেই দাঁড়া ভাঙিয়া জমি সমান করিয়া দিয়া কেবল চারার গোড়ায় মাটি বাঁধিয়া দিতে হইবে।

কপির ন্যায় গোলআলু, রাঙাআলু, মূলা, শিম, মানকচু, গাজোর, শালগম, বিটপালন, এণ্ডামূলা, মাদ্রাজী পিয়াজ প্রভৃতি অনেক

প্রকার দেশী ও বিলাতী শাক সবজীর আবাদ ও পাইটের সময় এদেশে প্রধানতঃ ফুল, বাঁধা এবং ওলকপিরই চাষ হইয়া থাকে।

আমরা যে সকল শাক সবজী ব্যবহার করিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলি দেশীয় এবং অন্যগুলি বিদেশীয়। বিদেশীয় অধিকাংশ শাক সবজীই প্রায় ভাদ্র মাসের শেষ হইতে এবং কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই চাষ আবাদ করিতে হয়। কারণ ঐ সকল ফসল প্রায় শীতকালেই খাদ্যের উপযুক্ত হইয়া উঠে। বিদেশীয় শাক সবজী চাষের সহিত দেশীয় শাক সবজী চাষের এই প্রভেদ যে, ঐ সকল ফসলের চাষে জমির অত্যন্ত পাইট করিতে হয় এবং প্রত্যেক চাষে খৈল, গোবর প্রভৃতি সার না দিলে ফসল ভাল হয় না। এদেশের অনেক প্রকার শাক সবজী আছে, ঐ সকলের আবাদে জমির কোন প্রকার পাইট কিম্বা সারাদি দেওয়ার রীতি নাই অথচ প্রচুর ফলিয়া থাকে। কারণ এ দেশের মৃত্তিকার এরূপ উর্ব্বরতা শক্তি যে, সার না দিলেও উহাতে সারের কার্য্য করিয়া থাকে। তবে সার ও পাইট সহকারে চাষ করিলে উহার আরও উন্নতি হইতে পারে; তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য স্ব স্ব আবাস বাটীর সংলগ্ন ভূমিতে নিত্যব্যবহার্য্য শাকসবজী প্রভৃতি চাষ আবাদ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ করেন। নতুবা প্রত্যেক জিনিসের জন্য পয়সা হাতে করিয়া বাজারে যাওয়া একটী কলঙ্ক মনে করা উচিৎ। গৃহ-জাত শাক সবজী এবং ফলাদি যেরূপ টাট্‌কা আহার করিতে পাওয়া যায়; বাজারে সেরূপ পাওয়া কঠিন। এজন্য এদেশে একটী গল্প আছে, কোন গৃহস্থ মৃত্যুকালীন তাঁহার পুত্র-দিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন—"বাপু হে বাড়ীতে নিত্য হাট বাজার বসাইবে।" এই হাট বাজারের অর্থ যে গৃহসংলগ্ন ভূমিতে নানা প্রকার চাষ আবাদ দ্বারা ফুল, ফল এবং শস্যাদি দ্বারা সুশোভিত রাখা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। অনেক প্রাচীনা গৃহিণীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়;—

"বাড়ীর গাছা—আর পেটের বাছা" অর্থাৎ সন্তান যেমন পিতামাতার উপকার সাধন করিয়া থাকেন, সেইরূপ বাড়ীর গাছপালাও গৃহস্থগণের

সর্ব্বদা উপকার করিতে বঞ্চিত করে না। কৃষি-কার্য্য যদিও অত্যন্ত পরিশ্রম-জনক কিন্তু সকল প্রকার চাষ আবাদে যে, অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহা এদেশের অনেকেই বিশেষরূপ অবগত আছেন। আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি, পল্লীগ্রামের অনেক ভদ্র-কুল-কামিনীরা স্ব স্ব বাড়ীতে দুই একটী শিম, বেগুণ, শশা, কুমড়া প্রভৃতির গাছ রোপণ করিয়া প্রচুর ফল লাভ করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র যে, ফল লাভ করিয়া নিরস্ত থাকেন, তাহাও নহে, প্রতিবেশীদিগকে উহা স্বহস্তে বিতরণ করিয়াও নির্ম্মল আনন্দ ভোগ করিতে বঞ্চিত হয়েন না। পরমেশ্বর আমাদিগকে আর কোন বিষয় সুখী করুন বা নাই করুন কিন্তু ভূমির এরূপ প্রজনন-শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, সামান্য যত্নে প্রচুর ফল ও শস্য লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আজকাল অধিকাংশ গৃহস্থগণকেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা স্ব স্ব আবাস সংলগ্ন ভূমিখণ্ড ফেলিয়া রাখেন, অথচ নিত্য ব্যবহার্য্য শাক সবজির জন্য বাজারের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি গৃহস্থালীতে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য চাষ আবাদের যে সকল সহজ সহজ উপায় প্রকাশিত হইবে সেই সকল বিষয় পাঠ করিয়া গৃহস্থগণ নিত্য ব্যবহার্য্য শাক সবজির চাষে কৃতকার্য্যতা লাভ করতঃ আর যেন বাজারের মুখ অপেক্ষা না করেন।

গর্ভস্রাব সম্বন্ধে সাবধানতা।

গর্ভাবস্থায় যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে গর্ভিণী স্বচ্ছন্দে প্রসব করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেক স্থানেই যে, গর্ভিণী এবং গৃহস্থগণের অজ্ঞতাবশতঃই গর্ভস্রাব হইয়া থাকে, তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ যাহাতে গর্ভস্রাব গর্ভিণীকে আক্রমণ করিতে না পারে, এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রত্যেক গর্ভবতীর পক্ষে যে, একটী গুরুতর কার্য্য, তাহা মনে রাখা উচিত। এস্থলে আর একটী বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি

রাখিতে হয়, অর্থাৎ এদেশে যেরূপ সামাজিক ব্যবস্থা এবং যেরূপ অল্প বয়সে রমণীগণ গর্ভবতী হইয়া থাকেন, তাহাতে কেবলমাত্র তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলে না। এজন্য প্রত্যেক গৃহস্থেরই উচিত স্ব স্ব গৃহস্থিতা গর্ভিণীকে সমুচিত নিয়মে রক্ষা করা। যে সকল কারণে গর্ভস্রাব হইবার সম্ভব, সেই সকল কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই জানিয়া রাখা যে, একটী গুরুতর কর্ত্তব্য তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। গর্ভস্রাব ঘটিলে গর্ভস্থ ভাবী সন্তান এবং গর্ভবতী উভয়েরই অনিষ্ঠ সাধিত হইয়া থাকে। এজন্য যাহাতে গর্ভস্রাব না হয়, তৎপক্ষে বিহিতবিধানে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বিপদ উপস্থিত হইলে নিবারণ চেষ্টা করা অপেক্ষা যাহাতে বিপদ উপস্থিত হইতে না পারে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখাই বুদ্ধিমানের কায।

বহু দর্শন দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ত্রিশ দিনে মাসের দুই শত আশি অর্থাৎ নয়মাস দশদিনের মধ্যেই প্রায় শিশু ভূমিষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল কারণে গর্ভস্রাব হইবার সম্ভব, উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সকল সময়েই তাহা হইতে পারে। এজন্য গর্ভসঞ্চার হইতে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত সাবধান থাকা বিধেয়। স্বাভাবিক সময়ের পূর্ব্বে প্রসব হইলে অর্থাৎ গর্ভ সঞ্চার হইতে চতুর্থ মাসের মধ্যে প্রসূত হইলে তাহাকে গর্ভস্রাব কহিয়া থাকে। সচরাচর প্রায়ই দেখা যায়, তিন মাসের মধ্যেই অধিকাংশ গর্ভিণীর গর্ভস্রাব ঘটিয়া থাকে। তাহার কারণ তৎকালে ভ্রূণ জরায়ুতে দৃঢ় আবদ্ধ হইতে পারে না। এই সময়ের মধ্যে আবার অনেকের ঋতু হইবার নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলেও এই দুর্ঘটনা হইতে দেখা যায়।

একবার গর্ভস্রাব হইলে দ্বিতীয়বার গর্ভ উপস্থিত হইলে অনেক গর্ভবতীকেই আতঙ্ক প্রকাশ করিতে দেখা যায়। বাস্তবিক অধিকবার গর্ভস্রাব হইলে নানা প্রকার উৎকট পীড়া হইবার সম্ভব। কিন্তু একবার গর্ভস্রাব হইলে বিশেষ কোন আশঙ্কার কারণ মনে করা উচিত নহে, তবে সাবধান থাকিতে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। গর্ভস্রাবের পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ দেখিয়া উহা জানিতে পারা যায়; তাহা এস্থলে লিখিত হইয়াছে।

লক্ষণ।—যখন দেখিবে, কোমর হইতে ব্যাথা উদরের উপরিভাগে এবং উরুদেশের মধ্যে উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হইতেছে এবং অন্য কোন প্রকার পীড়াদি নাই অথচ শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হইতেছে, এই সকল ভাব অথবা ইহার মধ্যে দুই একটী লক্ষণ উপস্থিত হইলেই গর্ভস্রাবের পূর্ব্ব অবস্থা মনে করিতে হইবে। আর যদি প্রসব দ্বার দিয়া সামান্যরূপ শোণিত কিম্বা শোণিত মিশ্রিত ক্লেদ পড়িতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে যদি উদর ও কটিদেশের বেদনা ঘন ঘন বৃদ্ধি হইতে থাকে, আর রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই গর্ভস্রাব উপস্থিত মনে করিতে হইবে।

আমাদের দেশের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এরূপ প্রকাশিত যে, এক মাস হইতে তৃতীয় মাসের মধ্যে যদি গর্ভিণীর কোন প্রকার আহার, বিহার দ্বারা গর্ভের ব্যাঘাত জন্মায়, তবে তাহা রক্ষার উপায় অত্যন্ত কঠিন; কারণ সেই সময় গর্ভের কোন অংশই ঘনতা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তরল পদার্থ সামান্য অত্যাচারে অধোগামী হইবার বিশেষ সম্ভব।

পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণের পর যদি প্রসব বেদনার ন্যায় কষ্ট-দায়ক বেদনা, উরু ও কটিদেশের বেদনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং প্রসব দ্বার দিয়া থানা থানা কিম্বা পরিষ্কার রক্ত পড়িতে থাকে, গর্ভিণীর এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলেই প্রায় গর্ভস্রাব হইতে দেখা যায়। কখন কখন আবার এরূপও দেখা যায় যে, সন্তান গর্ভে মৃত অবস্থায় অবস্থিতি করে। গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইলে গর্ভিণীর স্তনদ্বয় সঙ্কুচিত, বমিরভাব, পেট নামান এবং দুর্গন্ধ ক্লেদ সকল নির্গত হইয়া থাকে।

যে সকল কারণে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইয়া থাকে, সেই সকল কারণ জানিয়া রাখা অতীব আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় দামাল অর্থাৎ দুরন্ত ছেলে গর্ভিণীর নিকট রাখা উচিত নহে, কারণ অনেক সময় এরূপ দেখা গিয়াছে, দুরন্ত ছেলের হাত পায়ের আঘাত কিম্বা তাহারা উদরের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াও

গর্ভস্রাব উপস্থিত করিয়া থাকে। কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হওয়া, কোন ভারি বস্তু বলপূর্ব্বক উত্তোলন করা, সিঁড়ি ভাঙিয়া উপর নীচে করা, গুরুতর পরিশ্রম, দূর দেশে ভ্রমণ কিম্বা যে সকল যানে সমস্ত শরীর অত্যন্ত আন্দোলিত হয়, তাহাতে আরোহণ করা, অধিক রাত্রি জাগরণ, নৃত্য, বিরেচন কিম্বা উগ্র ঔষধাদি সেবন, আমাশয় প্রভৃতি রোগে বেগ দেওয়া, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা, এককালে পরিশ্রম বর্জ্জন, অধিক পরিমাণে ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি মেদ-জনক দ্রব্য ভক্ষণ এবং দিবানিদ্রা ও অত্যন্ত কোমল শয্যায় শয়ন প্রভৃতি অনেক প্রকার কারণে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইয়া থাকে।

গর্ভস্রাব সম্বন্ধে দুই প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা যাইতে পারে অর্থাৎ গর্ভ সঞ্চার হইবার পূর্ব্বে এবং গর্ভ সঞ্চার হইলে চতুর্থ প্রভৃতি মাসে অর্থাৎ স্রাব হওয়ার সময় পর্য্যন্ত যদি গর্ভিণীর অপচারজনিত রক্ত-স্রাব কিম্বা গর্ভাশয়ে বেদনা উপস্থিত হয়, তবে সেই গর্ভিণীকে অতিশয় কোমল শয্যায় শরীরের অধোভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত এবং ঊর্দ্ধভাগ অধোভাবে শয়ন করাইয়া শীতল অথচ মৃদু ও সুখ-জনক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে এবং অত্যন্ত শীতল জল অথবা বরফে যষ্টি-মধুর চূর্ণ ও উত্তম গাওয়া ঘৃত ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ জলে কার্পাস তূলা ভিজাইয়া প্রসব দ্বারের কিঞ্চিৎ ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিবে। আর ঐ জলের সেক দিলেও বিশেষ উপকার হইতে পারে। গাওয়া ঘৃত শত কিম্বা সহস্র বার ধৌত করিয়া নাভির অধোভাগে পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা বট বৃক্ষের ছাল জলের সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে কোমল বস্ত্র ভিজাইয়া নাভিতে এবং তাহার অধোভাগে সেক দিবে। কখন কখন গব্য-ঘৃত কিম্বা যষ্টি-মধুর জল দ্বারাও নাভির মধ্যভাগে সেচন করিয়াও উপকার হইয়া থাকে। বট প্রভৃতি ক্ষীরি বৃক্ষ সমূহের কষায় (পাচন) প্রস্তুত করিয়া অথবা যে সকল বৃক্ষের ছালে অত্যন্ত কষ, সেই ছাল দ্বারা ঘৃত কিম্বা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে পরিষ্কার কোমল বস্ত্র ভিজাইয়া প্রসব দ্বারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। গর্ভিণীর পরিপাক শক্তি থাকিলে তাহাকে ঐ দুগ্ধ

ও ঘৃত খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত সাধারণ দুগ্ধ ও ঘৃত গর্ভিণীকে আহার করিতে দিতে পারা যায়।

রক্তপদ্ম এবং রক্ত উৎপল (রক্তকম্বল) ও নানা জাতীয় কুমুদ পুষ্পের কেশর, মধু এবং চিনি এক সঙ্গে মিশাইয়া লেহন করিতে দিতে পারা যায়।

মাত্রা।

কেশর	...	...	...	চারি আনা।
চিনি	...	...	...	আট তোলা।
মধু	...	...	...	লেহন উপযোগী।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চক্রদত্ত স্ত্রীরোগ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম মাস হইতে দশ মাস পর্য্যন্ত যে যে মাসে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, সেই সেই মাসে এই দুর্ঘটনাকালে যে সকল ঔষধ সেবন ব্যবস্থা লিখিত আছে, এস্থলে তাহাও উল্লিখিত হইল।

১ম মাস।—ক্ষীরকাকোলী, দেবদারু, সমভাগে লইয়া উত্তমরূপ বাটিয়া গর্ভিণীর পরিপাক শক্তি অনুসারে শীতল জলের সহিত সেবন করিতে হইবে। অথবা ঐ সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া দুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ করতঃ দুগ্ধ শীতল হইলে সেবন করিবে। মাত্রা—ঔষধ দুই তোলা, দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া, জল দেড় পোয়া শেষ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে গর্ভিণীর পরিপাক শক্তি অনুসারে প্রদান করিবে।

২য় মাস।—আমরুলশাক, কৃষ্ণ তিল, মঞ্জিষ্ঠা শতমূলী সমভাগে লইয়া সেবন করিতে হইবে। (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবস্থা।)

৩য় মাস।—পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, অনন্তমূল এবং দূর্ব্বা। ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ।

৪র্থ মাস।—অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামনহাটি, যষ্টি-মধু। পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা।

৫ম মাস।—গোক্ষুর, কণ্টিকারী, গাম্ভারের ফল, বট প্রভৃতি ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষের কুঁড়ি অথবা ঝুরি এবং পদ্মমৃণাল। পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা।

৬ষ্ঠ মাস।—শালপাণি, বেড়েলা, সজনার বীজ, গোক্ষুর এবং যষ্টি-মধু পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা।

৭ম মাস।—পাণিফল, পদ্মমৃণাল, কিস্‌মিস্‌, কেশুর, যষ্টিমধু এবং চিনি পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা।

৮ম মাস।—কতবেল, বেল, ব্যাখুর, পটোল, ইক্ষু, কণ্টিকারী ইহাদিগের মূল সমভাগে লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুগ্ধ সিদ্ধ করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সেবন করিবে।

৯ম মাস।—যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী এবং শ্যামালতা। পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা।

১০ম মাস।—দশম মাসে যদি প্রসব বেদনা ভিন্ন অন্য প্রকার বেদনা উপস্থিত হয়, তবে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিবে।

শুধু শুঁঠ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিতে দিবে। ইহার মাত্রা পূর্ব্ববৎ। অথবা শুঁঠ, যষ্টিমধু এবং দেবদারু ইহারও ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ। ঐ সকলের অভাবে কুশের মূল, কেশের মূল, ভেরেণ্ডার মূল, গোক্ষুরের মূল, চিনির সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা করিবে।

পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে "কৌমার ভৃত্য" নামে যে আয়ুর্ব্বেদের একটী অঙ্গ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বিবাহ কাল হইতে জাত বালকের পঞ্চম বর্ষ অর্থাৎ স্তন্য পান কাল পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা এবং ঔষধাদির বিধান করিয়াছেন, তৎ-সমুদায় অত্যন্ত উপকারী। এজন্য ঐ সকল বিষয় এবং তৎসঙ্গে ডাক্তারী ব্যবস্থাদি উল্লেখ করিয়া সাধারণের গোচর করিব। গর্ভস্রাব সম্বন্ধে যে সকল গাছ গাছড়ার বিষয় লিখিত হইল, তৎসমুদায় বেনের দোকানে অথবা বেদের নিকট সন্ধান করিলেও পাওয়া যাইতে পারে।

ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের তিনটী অবস্থা বিভাগ করেন; তন্মধ্যে প্রথম অবস্থা সাবধানতা, দ্বিতীয় অবস্থায় গর্ভ রক্ষার উপায় এবং তৃতীয় অবস্থায় গর্ভস্রাব নিশ্চয় জানিয়া কার্য্য করিতে হইবে। এক্ষণে ঐ তিনটী অবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য লিখিত হইতেছে।

প্রথমাবস্থা।—এই অবস্থায় গর্ভিণীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়া থাকে। তাদৃশী ক্ষুধা বোধ হয় না, কখন কখন সামান্যরূপ অরবোধ হইতে দেখা যায়; কাহার কাহার মাথা দপ্ দপ্, শিরঃ পীড়া, চর্ম্ম উষ্ণ, পিপাসা প্রভৃতি ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় গর্ভস্থ ভ্রূণের কোন প্রকার অনিষ্ঠ হয় না। কটিদেশে ও উরুতে প্রথমে সামান্য বেদনা, পরে উহার বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে কোন প্রকার শ্রম-জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য; শীতল স্থানে শয়ন করাইয়া লঘু দ্রব্য অর্থাৎ বকাদুগ্ধ, সাগু এবং সরবৎ প্রভৃতি আহার দিবে। নিকটে যদি উপযুক্ত চিকিৎসক থাকেন, তবে অবিলম্বে তাঁহাকে আনাইয়া চিকিৎসা করাইবে।

দ্বিতীয় অবস্থা।—প্রথম অবস্থায় রীতিমত চিকিৎসা করাইলে প্রায়ই দ্বিতীয় অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। এই অবস্থায় পরিষ্কার রক্ত অথবা চাপ্ চাপ্ রক্ত, তীক্ষ্ণ বেদনা উপস্থিত হইয়া প্রসবের পূর্ব্ব ভাব দেখা দেয়। প্রথম অবস্থার ন্যায় এই অবস্থায় গর্ভিণীকে শয়ন করাইয়া চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। পিপাসা বোধ হইলে শীতল জল পান করিতে দিতে পারা যায়।

তৃতীয় অবস্থা।—দ্বিতীয় অবস্থায় উপযুক্ত মত চিকিৎসা করাইয়াও যদি এই অবস্থা উপস্থিত হয় অর্থাৎ ঘন ঘন প্রসব বেদনা ও ক্লেদাদি নির্গত হইতে থাকে, তবে নিবারণ চেষ্টা করা বৃথা। গর্ভস্থ ভ্রূণ নির্গত হইলে প্রসবের পর যেরূপ নিয়মাদি প্রতিপালন করা আবশ্যক, সেইরূপ নিয়মে গর্ভিণীকে সেবা শুশ্রূষা করাইতে হইবে।

যে সকল স্ত্রীগণের পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হইয়া থাকে, গর্ভস্রাব সময় উপস্থিত হইলে বিশেষরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা তাঁহাদিগের পক্ষে গুরুতর কর্ত্তব্য। অর্থাৎ প্রথমবারে যে সময়ে গর্ভস্রাব হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ নিয়মিত সময় উপস্থিত হইলে গর্ভবতীকে কোন প্রকার শ্রম-জনক কার্য্য আদৌ করিতে দেওয়া উচিত নহে। তাঁহাকে সর্ব্বদাই কোমল শয্যায় শয়ন করিতে দিতে হয়। অনেক চিকিৎসকের মতে সেই সময়

কোমল শয্যায় শয়নই প্রধান ঔষধ। বিশেষতঃ এই সময় স্বামী সহবাস সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। সর্ব্বদা শারীরিক ও মানসিক চিন্তা হইতে বিরত থাকা আবশ্যক। শীতল জলে অবগাহন (অধিকক্ষণ না হয়) এবং তদ্দ্বারা সামান্যরূপ গাত্র মার্জ্জনা করিলে উপকার হইতে পারে। ঘন ঘন গর্ভপাত হইলে স্ত্রীপুরুষের দীর্ঘকাল স্বতন্ত্র থাকা উচিত। প্রদরাক্রান্তা গর্ভিণীর গর্ভস্রাব হইবার অত্যন্ত সম্ভব। একবার গর্ভস্রাব হইলে আবার শীঘ্র যাহাতে গর্ভ সঞ্চার না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। গর্ভা-বস্থায় স্বামীসহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। ফলতঃ গর্ভ সঞ্চার হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত একটু সতর্ক থাকিলে গর্ভস্রাব হইবার প্রায়ই আশঙ্কা থাকে না। গর্ভাবস্থায় লঘু বলকারক দ্রব্য আহার করা উচিত। কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে সামান্য মৃদু বিরেচক দ্রব্য সেবন করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। দিবানিদ্রা পরিত্যাগ, প্রতিদিন প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উত্থান এবং নিয়মিত পরিশ্রম করিলে কোন প্রকার আশঙ্কা থাকে না। যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, প্রত্যেক গর্ভিণীকে এই সকল নিয়-মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। এদেশে যেরূপ অল্প বয়সে রমণীগণের গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে, তাহাতে লজ্জাবশতঃ অনেক গর্ভিণী কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়েন না। আবার যাঁহারা ঐ সকল আবশ্যকীয় নিয়ম প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা হয়ত আবার ঐ সকল নিয়মাদি আদৌ অবগত নহেন। গর্ভাবস্থা যে অত্যন্ত কঠিন সময়, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই মনে রাখা আবশ্যক। এই সময়ের সামান্য ত্রুটি বশতঃ প্রভূত অপকারকের সম্ভব। পূর্ব্বে এদেশের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ ঘরে এক একটী বহুদর্শিনী গৃহিণী অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক অপেক্ষা অনেক প্রকার নিয়ম অবগত ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এখন আর সেরূপ গৃহিণী দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্যেক বিষয় পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়।

পূর্ব্বকার রমণীগণ অপেক্ষা এক্ষণকার রমণীগণের শারীরিক স্বাস্থ্য অত্যন্ত দুর্ব্বল। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, সামান্য অত্যাচারে

এখনকার রমণীগণের যেরূপ অপকার হইয়া থাকে, পূর্ব্বে সেরূপ হইত না। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা এখন শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষরূপ মনো-যোগ দিতে হয়। গর্ভস্রাব সম্বন্ধে যদিও আরও বিস্তর কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তৎসমুদায় লিখিতে হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া উঠে, এজন্য তাহা পরিত্যাগ করা হইল। তবে স্থূল স্থূল যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইল, এই সকল বিষয়ে মনোযোগী থাকিলে যে, প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জলমগ্ন।

শ্বাস-রোধ-জনিত যত প্রকার মৃত্যু আছে, তন্মধ্যে জলমগ্ন নিবন্ধন অধিকাংশ মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে। অনেকের মনে বিশ্বাস জলমগ্ন ব্যক্তি উদর পূরিয়া জল খাইয়া থাকে, তজ্জন্যই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। বাস্তবিক এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। যে জল উদরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা পাকস্থলীতে আশ্রয় করে, তদ্দ্বারা মৃত্যু হয় না, তবে আবশ্যকের অতিরিক্ত জল প্রবিষ্ট হওয়াতে অপকার করিয়া থাকে। এ দেশে অনেকেরই মনে দৃঢ় বিশ্বাস উদরস্থ জল নির্গত করিতে পারি-লেই জলমগ্ন ব্যক্তি জীবিত হইয়া উঠিবে, এজন্য অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল হইতে তুলিয়াই তাহার পদ-দ্বয় ঊর্দ্ধ এবং মুখ নিম্নদিক করা হয়, কখন কখন আবার পা ধরিয়া ঘুরাইয়া তাহার উদরস্থ জল নির্গমের চেষ্টা করাও হইয়া থাকে। এরূপ অনুষ্ঠান করিলে জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত: তাহার মৃত্যুর সহায়তা করা হয়। অতএব সকলেরই এ বিষয় সাবধান হওয়া আব-শ্যক। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্বাসরোধই জলমগ্ন ব্যক্তির মৃত্যুর প্রধান কারণ। অতএব যাহাতে শ্বাস-রোধ না হইয়া সহজে শ্বাস-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখাই তাহার জীবন রক্ষার প্রধান উপায়, ইহা মনে রাখা উচিত।

কি কারণে জলমগ্ন ব্যক্তির শ্বাস-রোধ হইয়া থাকে, তাহার প্রকৃত কারণ অনেকেই অবগত নহেন। জলমগ্ন হইলে ফুস্‌ফুস্ মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া শ্বাস-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না। তজ্জন্য জলমগ্নের একমাত্র চিকিৎসা বা জীবন রক্ষার উপায় শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ব্বাহের সুব্যবস্থা করা। যে যে উপায়ে জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা হইতে পারে এক্ষণে তদ্বিষয় সবিস্তার লিখিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য, ঐ সকল উপায় অবগত থাকা, কারণ কখন যে, কোন্ পরিবারের ভাগ্যে ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই! বিশেষতঃ অনেক স্থলে চিকিৎসক আনয়ন করিবার সময় পাওয়া যায় না। এজন্য চিকিৎসক আগমন করিবার অগ্রে অথবা যে সকল স্থানে আদৌ চিকিৎসক পাওয়া না যায়, তথায় প্রত্যেক পরিবারের কিছু কিছু নিয়ম জানিয়া রাখা যে অতীব আবশ্যক, তাহা সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল হইতে তুলিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে চীৎ করিয়া মস্তক ঈষৎ উন্নত-ভাবে রাখিয়া শয়ন করাইতে হয়। কেহ কেহ প্রথমে চীৎ না করাইয়া অল্পক্ষণ উপড় অথবা কাৎ করিয়া রাখিয়া পরে চীৎ করাইয়া শয়ন করান। কিন্তু তদ্দ্বারা বিলক্ষণ অনিষ্টের সম্ভব। এজন্য অতি সাবধানে ধীরে ধীরে তাহাকে চীৎ করিয়া শোয়াইয়া তাহার পরিধান আর্দ্র বস্ত্রাদি ত্যাগ করাইতে হইবে এবং শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা তাহার সর্ব্বশরীর উত্তমরূপ পুঁছাইয়া দিতে হইবে। অন্যান্য বস্ত্র অপেক্ষা ফ্লানেল কাপড় হইলেই বিশেষরূপ উপকারের কথা। সর্ব্বাঙ্গ পুঁছাইয়া দিয়া একখানি কম্বল দ্বারা তাহার গাত্র আচ্ছাদন করা আবশ্যক। যদি হটাৎ কম্বল সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠে, তবে সমাগত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রাদি লইয়া আচ্ছাদন করিলেও চলিতে পারে।

অনন্তর জলমগ্ন স্থান হইতে যদি নিকটে লোকালয় থাকে, তবে অনতি-বিলম্বে তাহাকে তথায় লইয়া যাওয়াই অতি সুপরামর্শ। কারণ জলাশয়ের ধারে অনাবৃত স্থানে অবস্থিতি করিলে শীতল বাতাসে রোগীর অনিষ্ট হইবার কথা। [illegible]ন্য অতি সাবধানে এবং বিলক্ষণ সত্বরতা সহকারে লইয়া যাইতে

হইবে। আর যদি লোকালয় না থাকে, তবে কালবিলম্ব না করিয়া তথায় চিকিৎসা করাই সুব্যবস্থা। রোগী কোন বাড়ীতে নীত হইলে একটী গরম ঘরে, গরম শয্যাতে তাহাকে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে শয়ন করাইতে হইবে। শীতকাল হইলে গৃহে অগ্নি রাখিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। কিন্তু চৈত্র বৈশাখের প্রখর রৌদ্রকালীন এই ঘটনা হইলে গৃহে অগ্নি না রাখিয়া বরং দ্বারাদি খুলিয়া দিলে ভাল হয়। কিন্তু রোগীর গৃহে অধিক লোকের জনতা হইতে দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।

সচরাচর প্রায় তিন চারি মিনিট পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইলেই জীবন নষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু ভালরূপ সেবা সুশ্রূষা এবং নানা প্রকার উপায় অবলম্বন দ্বারা চৌদ্দ পোনর মিনিট পর্য্যন্ত জলমগ্ন ব্যক্তিও জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে চীৎ করিয়া মস্তক অল্প উন্নতভাবে শয়ন করাইয়া তাহার নাসিকা এবং মুখ-মধ্যস্থ গাঁজ, পানা প্রভৃতি যে সকল পদার্থ থাকে, তাহা ধুইয়া পুঁছিয়া দিতে হইবে। তাহার জিহ্বা অল্প পরিমাণ বাহির করিয়া ফিতা কিম্বা নেকড়ার ফালি দ্বারা বাঁধিয়া নিম্নের চোয়ালে আবদ্ধ রাখিলে ভাল হয়। এরূপ বাঁধিবার কারণ এই যে, জিহ্বা সরলভাবে বাহির থাকিলে মুখ মধ্যে সহজেই বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, তদ্দ্বারা শ্বাস-কার্য্য চলিবার সম্ভব। আর জিহ্বা মুখ-মধ্যে সঙ্কুচিত থাকিলে গলনালীর মুখ বন্ধ হইবার কথা।

হাত সহ্য হয় এরূপ গরম জলে তাহাকে অল্পক্ষণ অবগাহন করাইয়া পুনর্ব্বার জল হইতে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ চীৎ করাইয়া শোওয়াইতে হইবে এবং গরম কাপড় দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘন ঘন দলন করা আবশ্যক। এই সময় আর একটী বিষয় স্মরণ রাখা উচিত অর্থাৎ দলনকালে দেহের নিম্নভাগ হইতে উপরের দিকে দলিলে ভাল হয়। এই সময় মষ্টার্ড গরম জলে গুলিয়া তদ্ অভাবে রাইসরিষা বাটিয়া উরুতে, পায়ের ডিমে, হাত ও পায়ের তলায় প্রলেপ দেওয়া অতীব আবশ্যক, এই প্রলেপ দ্বারা ঐ সকল স্থানে রক্তের সঞ্চার হইবার সম্ভব। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চার হইলে রোগী শীঘ্রই জীবন

লাভ করিতে সমর্থ হইবে। মষ্টার্ড কিম্বা রাইসরিষা অভাবে গরম জল পূর্ণ বোতল হাত ও পায়ের তলায় বুলাইলেও উপকার হইতে পারে। দুই বগলের নিম্নে গরম জল-পূর্ণ বোতল কিম্বা অন্য কোন ধাতুপাত্রে জল পুরিয়া স্পর্শ করাইয়া রাখিতে হইবে। এই সকল অসুবিধা হইলে দুইখানি ইট ঈষৎ গরম করিয়া দুই বগলের নিম্নে স্পর্শ করাইয়া রাখিলেও চলিতে পারে। নাকের ভিতর এমোনিয়া অথবা নিষাদল ও কলিচুণ একত্রে হাতে রগড়াইয়া রোগীকে ঘ্রাণ করাইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে একবার গরম জল ও একবার ঠাণ্ডা জলের ছিটা তাহার চোকে মুখে এবং বুকে দিলে জ্ঞান সঞ্চার হইতে পারে। পাখীর পালক নাসিকা মধ্যে দিয়া সুড়সু[illegible]লেও চেতনা হইতে পারে। অনেক স্থলে নস্য দ্বারাও উপকার হইতে দেখা যায়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলমগ্ন ব্যক্তির জ্ঞান সঞ্চার না হয়, ততক্ষণ কম্বলের আচ্ছাদন ত্যাগ করা উচিত নহে। গাত্রে কম্বল ঢাকিয়া কখন কখন সাড়ে আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত এইরূপ ভাবে রাখিয়া এবং ফ্লানেল দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারাও রোগীকে জীবিত করা হইয়াছে। অতএব জলমগ্ন ব্যক্তিকে দম বন্ধ দেখিলেই তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিবে না। লিখিত সময় পর্য্যন্ত বিশেষরূপ চেষ্টা দেখিয়া বিফল হইলে, তখন তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। দুই একটী লোকের পরিশ্রমে এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ ঘটিয়া উঠে না, এজন্য প্রয়োজন মত লোক লইয়া চিকিৎসা করিতে হয়। যাহারা সেবা সুশ্রূষা করিবে, তাহাদিগের মধ্যে কার্য্য বিভাগ করিয়া লওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ কেহ গরম কাপড় দ্বারা মার্জ্জনা করিবে, সে অক্ষম হইলে তদপরিবর্ত্তে অপর ব্যক্তি সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। কেহ হাতে পায়ে রাইসরিষার প্রলেপ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে। এইরূপে কার্য্য বিভাগ করিয়া লইলে কোন প্রকার অসুবিধা কিম্বা কোন রকম ত্রুটি ঘটিবে না। সুচারুরূপে সেবাসুশ্রূষাই যে, প্রধান ঔষধের কার্য্য করে, তাহা মনে রাখা আবশ্যক।

উপরি লিখিতরূপ কার্য্যে রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হইলে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে কুড়ি ফোঁটা, পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত পাঁচ ফোঁটা, দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত

দশ ফোঁটা ল্যাইকর এমোনিয়া অথবা অল্প পরিমাণ ব্রাণ্ডি জলে মিশাইয়া অল্প অল্প পরিমাণে সেবন করাইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান সঞ্চার না হয়, ততক্ষণ কিছুমাত্র আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মস্তক গরম হইলে তাহার মস্তক ঈষৎ উন্নতভাবে স্থাপন করিয়া ওডিকলোন জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা ঠাণ্ডা জল তাহার মস্তকে দেওয়া আবশ্যক। এ অবস্থায় ব্রাণ্ডি সেবন সম্পূর্ণ অবিধি। এই সময় একবার মল ত্যাগ হইলে ভাল হয়। অতএব মৃদু বিরেচক দ্রব্য দ্বারা বাহ্যে করাইলে বিশেষ উপকারের সম্ভব। আহার লঘু-পথ্য।

জলমগ্ন ব্যক্তির শ্বাস-ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে তাহার জীবনের আশা করা যাইতে পারে। এজন্য যাহাতে সত্বর নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে পারে, তাহার উপায়ে মনোযোগ দিতে হয়। অন্যান্য রোগীর ন্যায় জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন কোন প্রকার ঔষধের উপর নির্ভর করে না। একমাত্র সেবা শুশ্রূষা এবং নানা প্রকার সহজ সহজ উপায় দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারা যায়। অনেক স্থলে এরূপও দেখা গিয়াছে, জলমগ্ন ব্যক্তির একদিকের নাক টিপিয়া ধরিয়া অপর নাকের ভিতর কোন প্রকার নল অর্থাৎ পেঁপে, ভেরেণ্ডা কিবা কাগজের নলের এক মুখ অল্পমাত্র প্রবিষ্ট করিয়া অপর মুখে ফুৎকার দিলেও শ্বাস ক্রিয়া চলিতে পারে। কখন কখন রোগীর দুই বাহু ধরিয়া একবার মস্তকের ঊর্দ্ধে, একবার বক্ষস্থলের উপর নামাইতে ও তুলিতে হইবে। এক মিনিটে অন্ততঃ কুড়িবার পর্য্যন্ত এইরূপ করিলেও শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চার হইয়া থাকে।

বগলের নিম্নে অর্থাৎ দুই স্তনের নীচে এক একবার চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহাতেও ফুস্‌ফুসে বায়ু চলিতে পারে। এইরূপ প্রক্রিয়াকে "কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস" কহিয়া থাকে।

জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা কেবলমাত্র কতকগুলি সামান্য উপায় দ্বারা যে, সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিষয় বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছি,

এক্ষণে রোগীর জীবন রক্ষা করিবার জন্য সেই সকলের প্রয়োজনীয় নিয়ম এবং ব্যবহৃত দ্রব্য সমূহের সংক্ষেপ উল্লেখ করিব। অতএব প্রত্যেক গৃহস্থের উচিত, নিম্নলিখিত বিষয়টী মনোযোগ সহকারে শিখিয়া রাখেন।

১। জল হইতে তুলিয়াই শুষ্ক বস্ত্রে গাত্র মার্জ্জন করিতে হইবে।

২। মুখ ও নাকের মধ্যস্থ কর্দ্দম, শেওলা প্রভৃতি অপরিস্কৃত পদার্থ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে।

৩। কম্বল কিম্বা শুষ্ক বস্ত্রাদি দ্বারা রোগীকে আচ্ছাদন করিতে হইবে।

৪। অল্প পরিমাণে মস্তক উন্নত করাইয়া শয়ন করাইতে হইবে।

৫। গরম জলে স্নান অথবা গরম গৃহে, গরম বিছানায় রোগীকে স্থাপন করিতে হইবে।

৬। নাকে নিষাদল ও চূণ মিশ্রিত অথবা অন্য কোন প্রকার নাস দিতে হইবে।

৭। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করাইতে হইবে।

৮। গরম কাপড় দ্বারা গা ঘষিতে হইবে।

৯। রাইসরিষার প্রলেপ দিতে হইবে।

১০। গরম ইট কিম্বা গরম জল-পূর্ণ বোতল বগলের নীচে রাখিয়া সেক দিতে হইবে।

১১। জ্ঞান সঞ্চার হইলে ব্রাণ্ডি সেবন করাইতে হইবে।

১২। রোগীকে নাড়া চাড়া করিবে না।

১৩। সমুদায় নিয়মানুসারে চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিয়াও যদি কিছুতেই জ্ঞান সঞ্চার না হয়; তখন তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিবে।

জুতা ব্রসের কালি ও ব্রস্।

সচরাচর জুতা ব্রস্ করিবার জন্য যে সকল কালি বিক্রীত হইয়া থাকে, ঐ সকল কালি প্রস্তুতের নানা প্রকার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্য আমরা পাঠকবর্গকে জুতা ব্রসের জন্য সহজ উপায়ে কালি

প্রস্তুত করিতে শিখাইয়া দিব। গৃহে ব্রস্ করিতে শিখিলে সংসারের বিস্তর পয়সা বাঁচিতে পারে। যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে লইয়া কালি প্রস্তুত করিতে হয়, নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

উপকরণ ও পরিমাণ।

তুতে	...	...	...	এক কাঁচ্ছা।
কোতরা গুড়	...	...	...	এক ছটাক।
ছির্কা (ভিনিগার)	...	...	...	আধ ছটাক।
আইভরি ব্ল্যাক	...	...	...	দেড় ছটাক।
সুইটওয়েল	...	...	...	এক কাঁচ্ছা।
জল	...	...	...	দেড় পোয়া।

উপরির লিখিত দ্রব্য সমূহ সংগ্রহ কর। প্রথমে সুইটওয়েল, কোতরা গুড় এবং আইভরি ব্ল্যাক ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া বেশ করিয়া পেষণ কর, দেখিবে উহা কাইয়ের ন্যায় হইবে। এখন এই কাইবৎ পদার্থে তুতে, ছির্কা এবং জল ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া মাড়িতে থাক। কিছুক্ষণ মাড়িলে জুতার উত্তম কালী প্রস্তুত হইবে। বাজারে যেরূপ টিনের কৌটায় কালি বিক্রয় হইয়া থাকে, এখন সেইরূপ কোন পাত্রে ঐ কালি পূর্ণ করিয়া রাখ, আর কালি খরিদ করিতে বাজারে যাইতে হইবে না।

এই কালি দ্বারা জুতা ব্রস্ করিলে তাহা অত্যন্ত চক্‌চকে হইবে।

জুতা ব্রস্ করিতে তিনখানি ব্রস্ হইলেই ভাল হয়। প্রথমে এক-খানি ব্রস্ দ্বারা জুতার ধূলা প্রভৃতি ঘর্ষণ বা ঝাড়িয়া পরে অপর এক-খানি ব্রস্ কৌটার কালিতে মাখিয়া জুতার গায়ে দুই একবার ছোপ দেও। পরে আর একখানি ব্রস্ দ্বারা ক্রমাগত ঘষিতে থাক, যখন দেখিবে, উহা বেশ চক্‌চক্ করিতেছে, তখন আর ঘষিবার প্রয়োজন করে না। অনন্তর পাত্রটী আবদ্ধ করিয়া তুলিয়া রাখ, প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্রস্ করিয়া লও।

পূর্ব্বে যে তিনখানি ব্রসের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, প্রথম যে ব্রস্‌খানি দ্বারা ধূলা প্রভৃতি ময়লা পরিষ্কার করিতে

হইবে, তাহা শক্ত হওয়া চাই, দ্বিতীয়খানি অর্থাৎ যাহাতে কালি মাখাইতে হইবে, তাহা নরম হইলেই ভাল হয়, আর তৃতীয় অর্থাৎ যাহা দ্বারা ঘষিয়া চক্‌চকে করিতে হইবে, তাহা মাঝারি গোছের নরম হওয়া আবশ্যক।

জুতা-ব্রসের কালি প্রস্তুত করিবার নানা প্রকার নিয়ম আছে। সকল নিয়ম দ্বারা দুই প্রকার কালি প্রস্তুত হইয়া থাকে অর্থাৎ এক প্রকা[র] চট্‌চটে কাইয়ের ন্যায় অন্য প্রকার তরল। ভিনিগার ও জল প্রভৃতি তরল পদার্থের পরিমাণ অধিক দিলে তরল এবং উহার পরিমাণ অল্প দিলেই চট্‌চটে কাইয়ের মত কালি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার এই কালিতে ডিমের তরলাংশ এবং গঁদ ব্যবহার করিয়া থাকেন, যদিও তদ্দারা চাক্‌চিক্য অধিক হয় কিন্তু জুতার চামড়া ফাটিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে, অতএব ঐ দুই পদার্থের ভাগ অত্যন্ত অল্প দেওয়াই উচিত। অথবা আদৌ ব্যবহার না করাই ভাল।

প্রকারান্তর নিয়ম।

উপকরণ ও পরিমাণ

আইভরি ব্ল্যাক	...	...	...	দেড় পোয়া।
অলিবওয়েল	...	...	...	আধ ছটাক।
	...	...	...	এক পোয়া।
গঁদের গুঁড়া	...	...	...	এক কাঁচ্চা।
ভিনিগার	...	...	...	দেড় সের।
সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড	...	...	...	তিন কাঁচ্চা।

তালিকার প্রথম চারিটী দ্রব্য এক সঙ্গে মিশাইয়া ক্রমে ক্রমে ভিনিগার দ্বারা মাড়িতে হইবে। উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড দিয়া ঘুঁটিয়া লইলেই ব্রসের উত্তম কালি প্রস্তুত হইল। কালি ঘন করিতে হইলে ভিনিগার অল্প দিতে হইবে।

প্রকারান্তর।

আইভরিব্ল্যাক	...	...	...	এক ছটাক।
লালীচিনি	...	...	...	এক ছটাক।
সুইটঅয়েল	...	...	...	এক কাঁচ্চা।
ভিনিগার	...	...	...	আড়াই পোয়া।

প্রথমে ভিনিগার ভিন্ন সমুদায় দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে মাড়িয়া পরে ক্রমে ক্রমে ভিনিগার দিয়া মাড়িয়া লইলেই হইল।

প্রকারান্তর।

আইভরিব্ল্যাক	...	...	...	আধ পোয়া।
চিটাগুড়	...	...	...	আধ পোয়া।
সুইটঅয়েল	...	...	...	আধ ছটাক।
তুতে	...	...	...	আধ ছটাক।

প্রথমকার তিনটী দ্রব্য উত্তমরূপে মাড়িয়া মিশাইতে থাক, সুইটঅয়েল উত্তমরূপ মিশাইলে, পরে তুতে (চারিগুণ) জলে গুলিয়া উহাতে মিশাও। এই জল মিশাইবার তিন চারি ঘণ্টা পরে উহা ব্যবহারোপযোগী কালি প্রস্তুত হইল। এই কালি আবশ্যক মত পাতলা করিতে হইলে, ঐ জল কিম্বা টক বিয়ার নামক মদ প্রয়োজন মত মিশাইতে পারা যায়।

প্রকারান্তর।

গঁদ	...	...	...	এক পোয়া।
চিটাগুড়	...	...	...	এক ছটাক।
ইংরাজী কালি	...	...	...	পাঁচ ছটাক।
ভিনিগার	...	...	...	এক ছটাক।
স্প্রিট	...	...	...	এক ছটাক।

প্রথমে গঁদ, গুড় এবং কালি ভিনিগারে ভিজাইয়া রাখিবে। উহা উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে স্প্রিট দিবে, কালি তৈয়ার হইল।

প্রকারান্তর।

আইভরিব্ল্যাক	...	...	...	আধ সের।
মাতগুড়	...	...	...	দেড় পোয়া।
সুইটঅয়েল	...	...	...	এক ছটাক।
বিয়ার	...	...	...	আড়াই পোয়া।
ভিনিগার	...	...	...	আড়াই পোয়া।

প্রথমে আইভরিব্ল্যাক, মাতগুড় এবং সুইটঅয়েল একত্রিত করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা মিশ্রিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুঁটিতে থাক। পরে ভিনিগার ও বিয়ার মিশাইয়া লইলেই কালি প্রস্তুত হইল।

চট্‌চটে কালি।

মাতগুড়	...	...	...	আট ছটাক।
আইভরিব্ল্যাক	...	...	...	দশ ছটাক।
সুইটঅয়েল	...	...	...	এক ছটাক।

লিখিত দ্রব্য কয়েকটী এক সঙ্গে উত্তমরূপ মাড়িয়া তাহাতে হয় লেবুর রস কিম্বা টক ভিনিগার মিশ্রিত কর, কালি প্রস্তুত হইল।

প্রকারান্তর।

আইভরিব্ল্যাক	...	...	...	এক সের।
মাতগুড়	...	...	...	আধ সের।
ওলিবঅয়েল	...	...	...	এক পোয়া।
তুতে	...	...	...	এক পোয়া।
জল	...	...	...	আবশ্যকমত।

কালি যদি পাতলা অর্থাৎ তরল করিতে হয়, তবে আইভরিব্ল্যাক অত্যন্ত গুঁড় করিয়া উপরি লিখিত দ্রব্য সমূহ বেশ করিয়া মাড়িতে থাক, এবং ঐ সকল উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে কালি প্রস্তুত হইল। জলের ভাগ অধিক কিম্বা অল্প দিলে কালি ঘন ও পাতলা হয়, তাহা বোধ হয়, সকলেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং প্রয়োজন মত উহা মিশাইতে পারা যায়।

ব্রসের কালি প্রস্তুতের যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, তাহা মনে করিলে, সকলে উহা প্রস্তুত করিতে পারেন। গৃহে কালি প্রস্তুত করিয়া ব্রস্ করিতে শিখিলে জুতা ব্রসের জন্য আর বৃথা ব্যয় করিতে হয় না। কালি প্রস্তুত করিতে যে সকল উপকরণ লিখিত হইল, ঐ সকলের মূল্য অধিক নহে, উহার অধিকাংশ দ্রব্যই বেনের দোকানে অথবা ডাক্তারখানা সমূহে বিক্রয় হইয়া থাকে।

ইট্ প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে অধিকাংশ গৃহস্থকে ইট্ প্রস্তুত করাইয়া লইতে হয়। কিন্তু অনেকের এবিষয়ে বিশেষ পারদর্শীতা না থাকায়, এবং শিক্ষিত ও সুদক্ষ কারিকরের অভাবে যথোচিত অর্থব্যয় করিয়াও অনেকে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন না। ইট্ প্রস্তুত হইলে যে, কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, আমরা নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

সকল মাটিতে ইট হয় না। মাটি অধিক আটাল হইলে ইট্ শুকাইলে ফাটিয়া যায়; পুড়াইতে অধিক কয়লা বা কাষ্ঠ লাগে এবং প্রায় সমভাবে পুড়ে না। আর যদি মাটিতে বালির ভাগ অধিক থাকে, তাহা হইলে ইটগুলি ভঙ্গপ্রবণ হয়; ফর্ম্মা তুলিয়া লইলেই চারিধার ছড়াইয়া পড়ে এবং অল্প তাপেই ঝামা বাঁধিয়া যায়। এইজন্য ইটের মাটি এরূপ হওয়া উচিত যেন উহাতে বালির ভাগ অধিক না থাকে এবং অধিক আটালও না হয়। সাধারণতঃ যে মাটিতে বালি তিন ভাগ, আটাল মাটি একভাগ এবং লৌহ, চুণ, সোডা প্রভৃতি অপর একভাগ থাকে, উহাই ইট্ নির্ম্মাণের বিশেষ উপযোগী। যে মাটি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এবং হাতে আঠার ন্যায় জড়াইয়া লাগে, অথবা টিপিবামাত্র যাহার পরমাণু সকল পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, এই উভয় প্রকার মাটিই ইটের পক্ষে অনুপযোগী। ইহাদের মাঝামাঝি অবস্থার মাটিতেই ভাল ইট্

হয়। সাধারণতঃ বঙ্গদেশে দুই হাতের নীচে বালির ভাগ অধিক থাকে, সুতরাং উপরের মাটিতে ইট্ গড়া ভাল। কিন্তু স্থানে স্থানে উপরের মাটি নিতান্ত আটাল হয়। উহা ইট্ গড়িবার পক্ষে অনুপযোগী। মাটি অধিকতর আটাল বা বালি মিশ্রিত হইলে উহাতে যথাক্রমে বালি বা আটাল মাটি মিশাইয়া উহা ইট্ গড়িবার উপযোগী করিয়া লওয়া যায়।

উপরোক্তরূপে মাটি বাছিয়া লইয়া উহা বর্ষার আরম্ভে কাটিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিলে ভাল হয়। কারণ তাহা হইলে বর্ষায় ভিজিয়া, উহার পরমাণু সকল শিথিল হইয়া থাকে, সুতরাং শীতকালে অল্প পরিশ্রমেই উহা ইট্ গড়িবার উপযুক্ত করিয়া লওয়া যায়। যেরূপ মাটি হউক না কেন, ইট্ গড়িবার পূর্ব্বক্ষণেই কাটিয়া মাখিলে মমের ন্যায় গলিয়া যায় না।

টেবিলে ইট্ গড়িতে হইলে, ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে উক্ত মাটি, আবশ্যক মত কাটিয়া, ভিজাইয়া রাখিয়া, ইট্ গড়িবার পূর্ব্বক্ষণে "পগমিলে" পেষিয়া লইলেই মমের ন্যায় নরম হইয়া যায়। কিন্তু এ প্রবন্ধে আমরা টেবিলে ইট্ গড়িবার কথা বলিব না; কারণ পল্লীগ্রামে প্রায় টেবিলে গড়া ইট্ চলিত নাই। সচরাচর ভূমির উপর ইট্ গড়া হইয়া থাকে, তথায় পগমিলেরও আবশ্যক হয় না। এইরূপে ইট্ গড়িতে হইলে, গড়িবার পূর্ব্বদিন, উক্ত মাটির স্তূপ হইতে কিয়দংশ কাটিয়া, উহা জলে ভিজাইয়া, পা ও কোদাল প্রভৃতির দ্বারা পেষিয়া উত্তমরূপে মাখিতে হয়। যেন উহাতে কাঁকর বা মাটির ঢেলা না থাকে। কাঁকরে চূণ থাকে; উত্তাপে উহা স্ফীত হয়, সুতরাং ইট্ ফাটিয়া যায়। সচরাচর গড়ন্দারেরা মাটি প্রস্তুত করিতে বিশেষ যত্ন করে না। মাটি প্রস্তুত করার দোষে ইট্ প্রায় ভঙ্গপ্রবণ হয়। মাটিতে অধিক জল দেওয়া ভাল নহে। কারণ উহা পাতলা হইলে, ফরমা তুলিবামাত্র, ইটের ধারগুলি ছড়াইয়া পড়ে, শুকাইলে ইট অধিকতর সঙ্কুচিত হয় এবং অভ্যন্তরস্থ জল শুষ্ক হওয়ায়, উহার অধিকৃত স্থান খালি থাকে, সুতরাং ইটগুলি অপেক্ষাকৃত লঘু ও ভঙ্গপ্রবণ হয়। গড়িবার কিঞ্চিৎ সুবিধা হয় বলিয়া, গড়ন্দারেরা

কাদা প্রায় পাতলা করে। এইজন্য গৃহস্থের এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ইট্ গড়িবার স্থানটী উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও সমতল করা উচিত এবং উহা যেন ভিজা না থাকে। ভিজা থাকিলে ইটগুলি মাটির সহিত লাগিয়া যায় এবং উহা তুলিবার কালে চাক্‌লা উঠিতে থাকে। জমি অপরিষ্কৃত ও অসমতল হইলে, ইটের নিম্নভাগও ঐরূপ হয়। সুতরাং গাঁথিবারকালে কোথায়ও অধিক মসলা লাগে এবং কোথায়ও বা একে-বারে আবশ্যক হয় না।

ইট্ শুকাইলে কমিয়া যায়। এইজন্য যেরূপ ইটের প্রয়োজন, ফরমা তাহা অপেক্ষা চারিদিকেই কিঞ্চিৎ বড় করা আবশ্যক। সচরাচর ১০১/৪ × ৫১/৮" × ৩" মাপের ফরমা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার ইট্ শুকাইয়া সাধারণতঃ ১০" × ৫ × "২৩/৪" থাকে। কোন কোন মাটির ইট্ পুড়িয়া কিছু কমে বটে, কিন্তু উহা অতি সামান্য ব্যবহারে কাষ্ঠের ফরমার উপরি-ভাগ ক্ষয়িয়া যায়; সুতরাং ক্রমশঃ ইটের স্থূলতা কমিতে থাকে। এই জন্য কাষ্ঠের ফরমার উপরি ও নিম্নভাগ লোহার পাত দিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া ভাল। এক্ষণে লৌহ নির্ম্মিত ফরমা অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। কাষ্ঠের ফরমার পরিবর্ত্তে উহা ব্যবহার করা অনেকাংশে ভাল। যে কাষ্ঠ বা লৌহখণ্ড দ্বারা ইটের উপরিভাগ চাঁচিয়া লওয়া যায়, ফরমার সহিত ঘর্ষণে উহার দুইস্থান ক্ষয়িয়া যায়; সুতরাং ইটের স্থূলতা ফরমা অপেক্ষা কম হইয়া পড়ে। এইজন্য ঐ কাষ্ঠ বা লৌহ খণ্ড ক্ষয়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই পরিবর্ত্তন করা উচিত।

মৃত্তিকা ভাল হইলে এবং কাদা ভাল করিয়া প্রস্তুত করিলেই যে, ভাল ইট্ হয় এমত নহে। গড়িবার দোষে ভাল মাটিতেও তাদৃশ শক্ত ইট্ হয় না এবং গড়নদারেরা প্রায়ই এবিষয়ে ফাকি দিবার চেষ্টা করে। গড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই, পূর্ব্বোক্ত মাটি, যেখানে ইট্ গড়িতে হইবে, উহার স্থানে স্থানে আবশ্যক মত রাখিতে হয় এবং প্রত্যেক স্থানের মাটির নিকট, পরিষ্কৃত শুষ্ক ও সূক্ষ্ম বালি কিছু কিছু রাখিতে হয়।

অনন্তর ফরমাখানির ভিতর উত্তমরূপে ঐ বালি মাখাইয়া, উহা ভূমির উপর পাতিতে হয় এবং উক্ত মাটি হইতে একখানি ইটে যত মাটি আবশুক, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে মাটি লইয়া, উহা হস্ত দ্বারা ফরমা অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বড় না হয় এরূপ পিণ্ডাকার করিতে হয়। পরে ঐ মৃৎপিণ্ড দুই হস্ত দ্বারা মস্তক পর্য্যন্ত তুলিয়া সজোরে ফরমার ভিতর ফেলিতে হয়। অনন্তর অঙ্গুলির দ্বারা উহা ফরমার চারি কোণে ঠেলিয়া এবং হস্ত দ্বারা উহার উপরিভাগ চাপড়াইয়া কাষ্ঠ বা লৌহখণ্ড দ্বারা অতিরিক্ত মাটি চাঁচিয়া লইয়া হস্তে কিঞ্চিৎ জল মাখাইয়া ইটের উপরিভাগ মার্জ্জিত ফরমার বিপরীত কোণদ্বয় দুই হস্ত দ্বারা ধরিয়া উহা সাবধানে তুলিতে হয়। গড়ন্দারেরা প্রায় এরূপ করে না। এইজন্য অধিকাংশ ইটের কোণ উঠে না; কোন কোনটীতে দুইবার মাটী দেওয়ায় উহাতে একটী জোড় হয় এবং পোড়া হইলে ঐ জোড়ের কাছে ইট্‌খানি অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। মৃৎপিণ্ড সজোরে ফরমার ভিতর না ফেলিলে উহার পরমাণুর মধ্যে মধ্যে ফাক থাকে; সুতরাং ইট্ অপেক্ষাকৃত লঘু ও ভঙ্গপ্রবণ হয়। ফরমা অসাবধানে তুলিলে উহার ধাক্কা লাগিয়া ইটের ধারগুলি বাঁকিয়া যাইতে পারে।

গড়া হইলে ইট্‌গুলি ভাল করিয়া শুকাইতে হয়। অনাবৃত স্থানে এক দিনেই উহা কিঞ্চিৎ শক্ত হইয়া উঠে। পরদিন উহা শিকল (পাঁত) দেওয়া যায়। শিকল দিবার স্থানটী কিঞ্চিৎ উচু হওয়া আবশ্যক। কারণ বৃষ্টি হইলে জল দাঁড়াইয়া নীচের ইট্ ভিজিয়া যাইলে, সমস্ত শিকল পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইট্ ঢাকিবার জন্য দরমা বা অন্য কিছু সর্ব্বদা যোগাড় রাখা কর্ত্তব্য। শুষ্ক ইট্ একবার ভিজিলে, উহা পুনর্ব্বার যত শুষ্ক হউক না কেন, পূর্ব্বের ন্যায় শক্ত হয় না। ইট্ ভাল শুষ্ক না হইলে পাঁজায় উঠান উচিত নহে, কারণ কাঁচা ইট্, নাড়িতে চাড়িতে ভাঙ্গিয়া যায়; পুড়িবার পূর্ব্বে পাঁজায় শুষ্ক করিতে কাষ্ঠ বা কয়লার উত্তাপ নষ্ট হয় এবং পাঁজায় অধিক উত্তাপ লাগায় ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ইট্ শুষ্ক হইলে পাঁজায় সাজাইয়া পুড়াইতে হয়। কাষ্ঠও সাজাইবার পদ্ধতি ভেদে, অনেক প্রকার পাঁজা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কয়লা দ্বারা সচরাচর যেরূপ পাঁজায় ইট্ পোড়ান হয়, তদ্বিষয় আমরা সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

পূর্ব্বোক্তরূপে নির্ম্মিত ইট্ পুড়াইতে লক্ষ ইটে ছয় শত মণ কয়লা লাগে। অনেকে পাঁচ শত মণেও পুড়াইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে ইটের বর্ণ হিঙ্গুলের ন্যায় লাল হয় না, অনেক আমা হইয়া যায়। "পগমিলে" পেষিত মৃত্তিকায় ইট্ পুড়াইতে সাড়ে ছয় শত মণ হইতে সাত শত মণ কয়লা লাগে।

পাঁজা সাজাইবার সময়ে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত যে উহা যত উচ্চ হইবে ততই অল্প কয়লায় অধিক ইট্ পুড়িবে এবং অল্প ইট্ নষ্ট হইবে। নিতান্ত ছোট না হইলে পাঁজায় সচরাচর একচল্লিশ থাক ইট্ উঠান হইয়া থাকে। ছোট পাঁজা অধিক উচু করিলে উত্তাপের তেজে ঢসিয়া যাইবার সম্ভাবনা। একচল্লিশ থাক ইট্ উঠাইলে কত ইটে কত আয়তনের পাঁজা করা আবশ্যক এবং তাহাতে কত কাষ্ঠ (কয়লা ধরাইবার জন্য) লাগে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

পাঁজার তলায় এবং উহার চারিধার অর্থাৎ কেঁকের ইট।	পাঁজার ভিতরের ইট।	মোট ইট।	পাঁজার তলার পরিমাণ।	কাষ্ঠের পরিমাণ।
৬০ হাজার	৬ লক্ষ	৬৬০০০০	৬০ফুট × ৬০ফুট	১৪০ মণ
৫৬ হাজার	৪½ লক্ষ	৫০৬০০০	৫৫ফুট × ৫৫ফুট	১৩০ মণ
৪০ হাজার	৪ লক্ষ	৪৪০০০০	৫০ফুট × ৫০ফুট	৯০ মণ
৩৬ হাজার	৩ লক্ষ	৩৩৬০০০	৪৫ফুট × ৪৫ফুট	৮০ মণ
২৫ হাজার	২¼ লক্ষ	২৫০০০০	৪০ফুট × ৪০ফুট	৫৫ মণ
২২ হাজার	১½ লক্ষ	১৭২০০০	৩০ফুট × ৩০ফুট	৪৫ মণ
৯ হাজার	৭৫ হাজার	৮৪০০০	২৫ফুট + ২৫ফুট	৪০ মণ
৭ হাজার	৫০ হাজার	৫৭০০০	২০ফুট × ২০ফুট	৩৫ মণ

পাঁজার তলার ইট্ কাঁচা থাকে এবং উহার চারিধার অর্থাৎ কেঁকের ইট ভাল পুড়ে না; এইজন্য কাঁচা ইটে ঐ সকল না গাঁথিয়া, আমা বা পাকা ইটে গাঁথিলে ভাল হয়। এক স্থানে অধিক ইট পুড়াইতে হইলে প্রথমে একটী ছোট পাঁজা পুড়াইয়া, উহার ইট্ দ্বারা দ্বিতীয় পাঁজার কেঁকে ও তলা গাঁথা যাইতে পারে।

পাঁজার পত্তন কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে দেওয়া আবশ্যক, যেন বৃষ্টি হইলে তলায় জল না দাঁড়ায়। অনেকে পাঁচ ইঞ্চ অন্তর চুলা বা গালা রাখিয়া, সমস্ত চুলাগুলিতেই কাষ্ঠ দেন। কিন্তু ইহাতে অনেক কাষ্ঠ অপব্যয় হয়— কয়লা ধরাইবার জন্য এত কাষ্ঠের আবশ্যক নাই। বায়ুর অভিমুখে প্রতি পাঁচ ফুটে একটী চুলায় এবং অপরদিকে তের ফুট অন্তর একটী করিয়া চুলা রাখিয়া তাহাতে কাষ্ঠ দিলেই যথেষ্ট হয়। যথা ২০ ফুট × ২০ ফুট পাঁজায়, একদিকে চারিটী এবং অপর দিকে একটী একুনে পাঁচটী গালায় কাষ্ঠ দিতে হয়। অপর গালার মুখগুলি বন্ধ করিয়া বায়ু খেলিবার জন্য উভয় মুখে ৫" × ৩" পরিমিত ছোট ছোট ফুটা রাখিলে হয়। প্রথমে পাড়ন কয়লার নীচে "পায়রাখোপী" করিয়া একখানি খাদরি ইট্ সাজাইতে হয়। উপরে প্রতি কয়লার পাড়নের নীচের থাকের ইট্ চারি ধারে "পায়রাখোপী" করিতে হয়। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বায়ু লাগায় পাঁজার পার্শ্বের ইট্ ভাল পুড়ে না। কিন্তু ঐ "পায়রাখোপ" গুলির ভিতর কয়লা থাকায় তথায় কয়লার ভাগ অধিক হয়; সুতরাং বাহিরের ইট্ ভিতরের ন্যায় পুড়িবার সম্ভব।

সচরাচর পাঁজায় ৪১ থাক ইট্ এবং ১২ পাড়ন কয়লা দেওয়া হয়। প্রতি পাড়নে কত কয়লা দিতে এবং তাহার উপর কয় থাক ইট্ সাজাইতে হয়, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

কয়লার পাড়ন।	কত ইঞ্চ পুরু কয়লা দিতে হয়।	কয় থাক ইট উঠাইতে হয়।
১ম	৪	২
২য়	২½	৩

৩য়	... ...	১½
৪র্থ	... .	১½
৫ম হইতে ৯ম		১⅓
১০ম	... ...	১⅛
১১শ	.. ...	১½
১২শ	... ...	১½

৪ (প্রতি কয়লার পাড়নের উপর ... ২ থাক ইট্ পাতাইয়া (খাদারি করিয়া নয়) তাহার উপর মাটি চাপা দিতে হয়।

দ্বাদশ পাড়নে কয়লা না দিলেও চলিতে পারে। একাদশ পাড়ন কয়লার উপর চারিখানি ইট্ খাদরি করিয়া গাঁথিয়া তাহার উপর দুই-খানি ইট্ পাতাইয়া, তদুপরি মাটি দিলেও চলে। কিন্তু উক্ত দ্বাদশ পাড়ন কয়লা দিলে ভাল হয়।

যদি পাঁজায় ৪১ থাক ইট্ না উঠে, তাহা হইলে, উপরোক্ত মাপে কয়লা দিলে, লক্ষ করা ছয়শত মণের কিঞ্চিৎ অধিক কয়লা লাগে।

পাঁজার উপর কয়লা বিছাইয়া মাপিলে, উহা কত পুরু হইল, ঠিক জানা যায় না, কারণ এরূপ অবস্থায় মাপ ঠিক হয় না। ১½ ইঞ্চির স্থলে হয়ত ২ ইঞ্চ, নয় ১ ইঞ্চ হইয়া যায়। এইজন্য নিম্নলিখিতরূপে কয়লা মাপিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপে মাপিলে প্রতি পাড়নের কয়লা, উপরোক্ত তালিকার মাপের মত পুরু হইবে।

কয়লা মাপিবার জন্য ২½ ফুট দীর্ঘে, ২ ফুট প্রস্থে এবং ২ ফুট ঊর্দ্ধে (১০ ঘন-ফুট পরিমিত) তলা ও উপরিভাগ শূন্য, একটী কাঠের বাক্স প্রস্তুত করিতে হয়। বাক্সটী তুলিবার জন্য উহার দুইদিকে দুইটী হাতল থাকা আবশ্যক।

যে কোন পাড়নে কত বাক্স কয়লা লাগিবে ঠিক করিতে হইলে, ঐ পাড়নের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ফিতা বা গজ দ্বারা মাপিয়া বর্গ ফুটে উহার কালি স্থির কর। অনন্তর ঐ বর্গফলকে নিম্নলিখিত তালিকা হইতে, ঐ পাড়নের পার্শ্বস্থ ভগ্নাংশ দ্বারা গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, ঐ পাড়নে তত বাক্স কয়লা লাগিবে।

১ম পাড়ন	১/৩০
২য় পাড়ন	১/৪৮
৩য় ও ৪র্থ পাড়ন	১/৮০
৫ম হইতে ৯ম পাড়ন	১/৯০
১০ম পাড়ন	৩/৩২০
১১শ ও ১২শ পাড়ন	১/৮০

উদাহরণ। কোন একটী পাঁজাব তৃতীয় পাড়নে কত বাগ্ন কয়লা লাগিবে ঠিক করিতে হইবে। মনে কর, মাপিয়া দেখা গেল ঐ পাড়নের দৈর্ঘ ২২ ফুট এবং প্রস্থও ২২ ফুট।

ঐ পাড়নের কালী = ২২ × ২২ = ৪৮৪ বর্গ ফুট সুতরাং ঐ পাড়নে, ৪৮৪ × ১/৮০ = ৬ বাক্স কয়লা লাগিবে।

এইরূপে বাক্সের সংখ্যা স্থির করিয়া, ঐ বাক্সটী পাঁজার উপর রাখিয়া, ঝুড়ি করিয়া কয়লা আনিয়া, উহার ভিতর ফেলিতে হয়। বাক্সটী পূর্ণ হইলে উহার হাতল ধরিয়া তুলিলেই বাক্স উঠিযা আইসে এবং কয়লাগুলি পাঁজার উপর থাকিয়া যায়। বাক্সটীর তলা ও উপরিভাগ শূন্য করিবার উদ্দেশ্য এই। পরে বাক্সটী নাড়িয়া অপর একস্থানে ঐরূপ কয়লা মাপিতে হয়। এরূপ, যে কয় বাক্স কয়লার আবশ্যক তাহা মাপা হইলে, কয়লা-গুলি ভাল করিয়া বিছাইতে হয়। বিছাইবার কালে মধ্যভাগ অপেক্ষা পার্শ্বে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে কয়লা দিতে হয়। এরূপ না করিলে চতুর্দ্দিকের উত্তাপে, মধ্যভাগে অগ্নির তেজ অধিক হওয়ায়, সেখানে ঝামা হইয়া যায়, এবং পার্শ্বে অগ্নির তেজ বাহির হইয়া যাওয়ায় ইট্‌গুলি আমা হইয়া থাকে। পাঁজায় তুলিবার পূর্ব্বে কয়লাগুলি ছোট ছোট করিয়া ভাঙ্গা আবশ্যক। কারণ বড় বড় থাকিলে তথায় অগ্নির তেজ অধিক হয়, সুতরাং ঝামা হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে "পগমিলে" পেষিত মাটির ইটে, কয়লা কিছু অধিক লাগে। উপরোক্ত কয়লার মাপ ঐ ইটের জন্য নহে। ঐ ইট্ পুড়াইতে হইলে, উক্ত মাপ অপেক্ষা অধিক কয়লা লাগে।

পাঁজায় ইট্ তুলিবার সময়, সচরাচর মজুরেরা মাথায় করিয়া ইট্ লইয়া যাইয়া, পাজার উপর ফেলিয়া দেয়। ইহাতে অনেক ইট্ ভাঙ্গিয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে এইরূপে ইট্ ফেলে না। তথায় যে ব্যক্তি পাঁজা সাজায়, সে মজুরের মাথা হইতে থাক্‌কে থাক ইট্ ধরিয়া সাজাইয়া ফেলে। ইহাতে কার্য্য শীঘ্র হয় এবং ইট্ কিছুমাত্র নষ্ট হয় না।

অধিক পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এইজন্য পাঁজার চারি ধারে কাদা দিয়া লেপিয়া দিলে ভাল হয়। পাঁজায় আগুণ দিয়া চুলার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা না করিলে বাতাস লাগিয়া, কাষ্ঠ ও উহার উপরের কয়লা শীঘ্র পুড়িয়া যায়, সুতরাং ইট্ ভালরূপ পুড়িবার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত জন্মে।

বেলের গুণ ও রোপণ প্রণালী।

বেল যে একটী উপাদেয় ফল, তাহা বোধ হয় এদেশের কাহাকেও লিখিয়া বুঝাইয়া দিতে হয় না। বেল কেবলমাত্র যে সুখাদ্য ফল তাহা নহে, উহা আবার আমাদের বিশেষ উপকারী। অনেক প্রকার রোগে বেল মহৌষধের কার্য্য করিয়া থাকে। বৈদ্য-শাস্ত্র মতে বেলের বিস্তর গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র-কর্ত্তারা বেলের গুণ অবগত হইয়াই উহা ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়া একটী বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। হিন্দু-শাস্ত্র মতে বেলগাছ প্রতি গৃহস্থ বাটীতেই থাকা উচিত। কেবলমাত্র দেবার্চ্চনায় বেল লাগে না। বেল দ্বারা যে সকল উপকার হইয়া থাকে, প্রথমে তৎসমুদায় লিখিয়া পরে যেরূপে উহা রোপণ করিতে হয় তাহা প্রকাশ করিব।

বিল্ব-পত্র।—হিন্দুশাস্ত্রানুসারে দেবার্চ্চনায় লাগিয়া থাকে। অনেক প্রকার ঔষধের অনুপানে বেলপাতার রস ব্যবহার হইয়া থাকে। শোথে বেলপাতার রস পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

বেল বা শ্রীফল।—বেল ও শ্রীফল একই ফল। তবে কাহারও কাহার

মতে বেলের মধ্যে ছোট আকারের যে সকল ফল, তাহাকে শ্রীফল এবং বড় আকারবিশিষ্ট জাতীয়কে বেল কহে। ফলের জন্যই বেলের অত্যন্ত আদর। পাইট করিলে ক্রমে ক্রমে বেলের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। বড় জাতীয় বেল অনূ্যন সাত সের পর্য্যন্ত ওজনেরও দেখা গিয়াছে। যে বেলের আঠা ও বিচি অল্প এবং শাঁস সুমিষ্ট তাহারই অধিক আদর। বেলের কচি অবস্থায় কুচি কুচি করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিলে তাহাকে বেল শুঁঠকি কহে। বেল শুঁঠকি অত্যন্ত উপকারী। এজন্য পূর্ব্বকার গৃহিণীগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিবৎসর উহা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, বৈদ্যমতে কোন কোন ঔষধে বেল শুঁঠকি ব্যবহার হয়। কচি-বেল আমাশয় প্রভৃতি উদরাময় রোগের একটী মহৌষধি। কাঁচ-বেল সিদ্ধ করিয়া তাহার জল পান করিলে পেটের পীড়া নিবারণ হইয়া থাকে। বারমাস কাঁচা বেল পাওয়া যায় না, এজন্য বেলশুঁট গৃহে প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। আজকাল এদেশের অনেকেই বেলের গুণ অবগত নহেন। কিন্তু ইংরাজ চিকিৎসকগণ উহার বিশেষ আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; প্রতিবৎসর এদেশ হইতে কাঁচা বেল শুষ্ক করিয়া বিলাত প্রভৃতি অনেক স্থানে প্রেরণ করা হইতেছে এবং তথা হইতে "এক্ষ্ট্রাকৃট অব্ বেল" নামক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কি দুঃখের বিষয় যে বেল আমাদের এত উপকারী এবং যাহার উপকার জ্ঞাত হইয়া গৃহে গৃহে বিল্ববৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা, সেই বেল-জাত ঔষধের জন্য আমরা বিদেশীয়দিগের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি!

বৈদ্য-শাস্ত্রমতে বেলের গুণ (১) মধুর, কষায়, গুরু, পিত্ত, কফ, জ্বর এবং অতিশার-নাশক, রুচি-কারক এবং অগ্নি-বর্দ্ধক।

বেলের মূলের গুণ (২) ত্রিদোষ-নাশক, মধুর এবং লঘু।

(১) ফলাগুণাঃ—মধুরত্বং কষায়ত্বং গুরুত্বং পিত্ত-কফ-জ্বরাতিশার-নাশিত্বং। রুচিকারিত্বং দীপনত্বঞ্চ।

ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

(২) মূলাগুণাঃ—ত্রিদোষঘ্নত্বং মধুরত্বং লঘুত্বং।

কোমল ফলের গুণ—(৩) স্নিগ্ধ, গুরু, সংগ্রাহক এবং অগ্নি-কারক।

পাকা-বেলের গুণ—(৪) মধুর, গুরু, কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, সংগ্রাহক এবং ত্রিদোষ-নাশক।

বেলশুঁঠের গুণ——(৫) কফ, বাত, আম ও শূলনাশক এবং গ্রাহী।

গৃহিণীগণের কর্ত্তব্য প্রতিবৎসর স্ব স্ব গৃহে বেলশুঁট প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

উপরিভাগে বেলের যে সমস্ত গুণ লিখিত হইল, তদ্ভিন্ন বেল দ্বারা উত্তম সরবৎ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাশয় প্রভৃতি রোগে বেলপোড়া অত্যন্ত উপকারী। বেল দ্বারা আবার অতি উৎকৃষ্ট মোরব্বা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কি রোগী, কি সুস্থশরীর, সকল ব্যক্তির পক্ষেই বেলের মোরব্বা সুপথ্য। বেলের আঠা চিত্রকারেরা রঙে ব্যবহার করিয়া থাকে।

বেল বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র ফলিয়া থাকে। বেলের রোপণ প্রণালী অতি সহজ। বিশেষরূপ পাইট করিতে হয় না। দুই উপায়ে বেলের চারা হইয়া থাকে ; অর্থাৎ বিচি কিম্বা শিকড়জাত চারা রোপণ করিলে উহার গাছ হইয়া থাকে। সকল প্রকার মাটিতে গাছ ভাল হয় না। দো-আঁশ মাটিই বেলের পক্ষে উত্তম। বেলের শিকড় মৃত্তিকার মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অনেক সময় তাহা হইতে ফেকড়ী বা চারা উৎপন্ন হয়। আমরা উহাকে বেলের শিকড় বলিয়া থাকি, বাস্তবিক তাহা শিকড় নহে, উহা কাণ্ড।

(৩) কোমলফলাগুণাঃ——স্নিগ্ধত্বং গুরুত্বং সংগ্রাহিত্বং দীপনত্বং।
ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

(৪) পক্কফলাগুণাঃ——মধুরত্বং গুরুত্বং কটুত্বং তিক্তত্বং কষায়ত্বং উষ্ণত্বং সংগ্রাহিত্বং ত্রিদোষ-নাশিত্বং। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

শ্রীফলস্তুবরপ্তি-ক্কোগ্রাহীরুক্ষোঽগ্নিপিত্তকৃৎ।
বালশ্লেষ্মহরোবল্য লঘুরুষ্ণশ্চ পাচন। ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

(৫) শুষ্ক বিল্ব-খণ্ডং——কফ-বাতামশূলঘ্নী গ্রাহিণী বিল্বপেষিকা।
ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

ঐ কাণ্ড হইতে যে ফেকড়ী বাহির হয়, তাহার কিয়দংশের সহিত উহা কাটিয়া লইয়া অন্যস্থানে রোপণ করিলে গাছ হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থলে তাহা শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায। এজন্য উৎকৃষ্ট জাতীয় সুপক্ক বেলের বিচি লইয়া কোন স্থানে ঝুরা মাটিতে রোপণ করিলে যে চারা হয়. তাহা তুলিয়া লইয়া অভিমত স্থানে রোপণ করিলে গাছ হইতে পারে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই চারা হইতে বেল ফলিয়া থাকে। যে স্থানে বেলের চারা রোপণ করিবে, অগ্রে তথায় খইল ও গোবরের সার গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া রাখিয়া পরে তাহাতে চারা রোপণ করিবে যে গাছের তেজ বৃদ্ধি হইবে। চারা-গাছের পাতা ছিঁড়িলে গাছ কমজোর হয, সুতরাং উপযুক্তমত বাড়িতে পারে না। অন্যান্য গাছের ন্যায বর্ষান্তে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়িযা দিতে হয় এবং বর্ষাকালে উহার মূল খুঁড়িয়া দিয়া জল খাওয়ান উচিত।

বাড়ীতে অধিক পরিমাণ বেলের আবাদ করিতে পারিলে তদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। বেল যেরূপ উপকারী, তাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য, স্ব স্ব আবাসে দুই একটী গাছ রোপণ করিয়া রাখা।

গবাদি পশুর এঁসে ঘা।

এঁসে রোগ গো, ছাগ শূকর এবং মুরগী প্রভৃতি অনেক জন্তুরই হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই পশুদিগের এঁসে রোগ হইতে দেখা যায়। উহা এক প্রকার সংক্রামক অর্থাৎ ছোঁয়াছে রোগ। পশুদিগের পালের মধ্যে দুই একটী জন্তুর এই পীড়া হইলে অন্যান্য পশুগণেরও ঐ রোগ হইতে দেখা যায়। এঁসে রোগ আক্রমণ করিলে জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মুখে, পাযে এবং পালানে ফুস্কুড়ী হইয়া থাকে। সকল পশুর এক প্রকার আকারে রোগ উপস্থিত হয় না; অর্থাৎ কোন কোন জন্তুর কেবলমাত্র মুখে এবং কাহারও কাহারও পায়ে হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে. এঁসে রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া মনুষ্যাদিরও উক্ত পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। কোন পশুর এঁসেরোগ একবার হইলে পুনর্ব্বার উহা হইতেও দেখা গিয়াছে।

রোগের কারণ।—আপনাপনিও এই রোগ হইতে পারে। কখন কখন আবার উক্ত রোগাক্রান্ত পশুদিগের সংস্পর্শেও রোগ হইতে দেখা যায়। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক অনুমান করেন, গবাদির দাঁড়াইবার স্থান কিম্বা মাটি ময়লাযুক্ত থাকাতেই এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। যদিও উহার কারণ নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু পশুদিগকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিলে যে উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ গবাদি পশুদিগকে পরিষ্কার রাখিলে, রোগাক্রান্ত পালের সঙ্গে চরিতে না দিলে, চরিতে যাইবার সময় পথের ধারে অপরিষ্কার উদ্ভিজ্জাদি আহার করিতে না দিলে, এই রোগ প্রায়ই হয় না। ফলতঃ স্পর্শই রোগের প্রধান কারণ বলিয়াই বোধ হয়।

বহু দর্শন দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, এই রোগের বীজ গবাদি পশুর দেহে চব্বিশ ঘণ্টা হইতে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত থাকে। কিন্তু ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রকাশ হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।——কম্পের সহিত জ্বর হয়, মুখ, শিং এবং চারি পা গরম হইয়া উঠে, মুখ চক্‌চক করে এবং লাল পড়ে। এই সকল লক্ষণের পর পায়ে ও মুখে ফুস্কুড়ি নির্গত হইয়া থাকে। গাভী হইলে পালান ও বাঁটে ফুস্কুড়ি দেখা যায়। ঐ সকল ফুস্কুড়ির আকার শিমের বীজের ন্যায় ফোস্কার মত। সময় সময় ঐ ফুস্কুড়ি আবার নাকের ভিতরও হইতে দেখা যায়। ফুস্কুড়িগুলি আবার প্রায়ই আঠার কিম্বা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফাটিয়া গিয়া লাল রঙের ঘা হইয়া উঠে। এই ঘা শীঘ্র ভালও হইতে পারে কিন্তু রীতিমত চিকিৎসা না করিলে নালী ঘা হইবার সম্ভাবনা।

মুখের মধ্যে সকল স্থান অপেক্ষা জিহ্বাতে ফুস্কুড়ির পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু টাকরায়, দন্তমূলে এবং মুখমধ্যে অন্যান্য স্থানেও হইতে দেখা যায়।

পায়ে ফুস্কুড়ি হইলে প্রায় খুরের যোড়ের মধ্যে এবং খুরের সহিত যে স্থানে চর্ম্মের সংলগ্ন, সেই সকল স্থানে হইয়া থাকে।

গবাদি পশুর এই রোগ উপস্থিত হইলে টাটানি ও জ্বরের জন্য

তাহারা আহার করে না এবং যে পায়ে ক্ষত হয়, তাহা খোঁড়া হইয়া যায়। এঁসে রোগাক্রান্ত বলদকে খাটাইলে রোগ বৃদ্ধি হইয়া উঠে, পা ফুলিয়া যায় এবং কখন কখন খুর খসিয়া পড়িতেও দেখা যায়।

গাভীর পালানে ও বাটে এই রোগ হইলে তাহা ফুলিয়া উঠে এবং ছুঁইলেই বেদনা বোধ করে। রোগের সময় বাছুরে দুগ্ধপান করিলে তাহারও সেই রোগ হইয়া থাকে।

দুগ্ধবতী গাভীর এই রোগ উপস্থিত হইলে দোহন-কালে তাহারা অস্থির হইয়া উঠে, এদিকে আবার না দুহিলে পালান ফুলিয়া কষ্ট উপস্থিত করিয়া থাকে।

অনেক সময় দেখা যায়, কেহ কেহ এই রোগ উপস্থিত হইলে বসন্ত রোগ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু কয়েকটী লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে গৃহস্থগণ সেই ভ্রম সংশোধন করিতে পারেন। অর্থাৎ বসন্ত হইলে পায়ে রোগ হয় না। এঁসে রোগে পেটের পীড়া দেখা যায় না। কিন্তু বসন্তে প্রায়ই উদর-ভঙ্গ এবং রক্তামাশয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

এঁসে রোগাক্রান্ত গবাদি পশুদিগকে যদি উপযুক্ত মত যত্ন এবং ভাল রকম চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে তিন চারি দিনের মধ্যেই জ্বরাদি আরাম হইয়া থাকে এবং এক পক্ষের মধ্যেই পশু সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। কিন্তু যদি উপযুক্তমত যত্ন না করা যায়, আর যদি রোগের অবস্থায় তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে জ্বর প্রবল হইয়া উঠে, ক্ষুধা মান্দ্য হয় এবং খুর ও পায়ের মধ্যে নালী-ঘা থাকাতে খুর খসিয়া পড়িতে পারে, পা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, ফোড়া হয় এবং দশবারো দিনের মধ্যে পশু মরিয়া যায়।

ব্যবস্থা।——পীড়িত পশুকে গৃহমধ্যে পরিষ্কার রাখা উচিত। ঘরের মেজে যেন খুব পরিষ্কার থাকে এবং গৃহমধ্যে যেন ভালরূপ বাতাস খেলিতে পারে।

দিনের মধ্যে দুই তিনবার গরম জলে পশুর মুখের ক্ষতাদি ধুইয়া দেওয়া উচিত। আর নিম্নলিখিত ঔষধের জলে ধৌত করিলে বিশেষরূপ উপকার হইতে পারে।

ফট্‌কিরি	...	...	...	সওয়া তোলা।
জল	...	...	...	•আধ সের।

লিখিত ফট্‌কিরি জলে গুলিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিতে হইবে।

গরম জল দ্বারা দিনে দুই তিনবার পা ও খুর ধুইতে হইবে। আর খুঁরের মধ্যস্থ ঘোড়মুখের ময়লাদি অতি সাবধানে বাহির করিয়া দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে সেক দেওয়াও আবশ্যক। সেক দিয়া নিম্নলিখিত মলম বাঁধিয়া দিলে শীঘ্র আরাম হইয়া উঠিবে।

কর্পূর	...	...	...	একভাগ।
তার্পিণ তৈল	...	...	...	সিকি ভাগ।
মসিনা তৈল	...	...	...	চারি ভাগ।

লিখিত দ্রব্যগুলি ভাল করিয়া মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইতে হইবে। যখন দেখা যাইবে মাংস বৃদ্ধি হইতেছে, তখন তাহাতে অল্পপরিমাণে তুতের গুঁড়া দেওয়া উচিত।

পালান, বাঁট প্রভৃতি যে সকল স্থানে ঘা থাকে. তাহা পরিষ্কার করিয়া সেই সকল স্থানে লিখিত মলমের পটি দেওয়া উচিত। এই পটি দিলে বাটে ও মুখে মাচিতা পড়িতে পাবে না।

যদি পশুর অত্যন্ত জ্বর থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর মধ্যে যে কোনটী ব্যবহার করাইতে পারা যায়।

কর্পূর	...	...	...	বার আনা।
সোরা	...	...	...	এক তোলা।
মদ	...	...	...	আধ ছটাক।

মদে কর্পূর গলাইয়া পরে তাহাতে সোরা দিয়া একসের ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া পশুকে দিন দুইবার সেবন করাইতে হইবে।

সোরা	...	...	...	সওয়া তোলা।
লবণ	...	...	...	আড়াই তোলা।
চিরতার গুঁড়	...	...	...	আড়াই তোলা।
গুঁড়	...	...	...	দেড় সের।

সমুদায় দ্রব্য এক সঙ্গে আধসের জলে মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ সেবন করাইবে। কার্ব্বোলিক অয়েল দ্বারাও অনেক সময় ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে।

পথ্য।—দূর্ব্বঘাস কিম্বা মটরের কচি গাছ প্রভৃতি নরম অথচ টাট্‌কা দ্রব্য পথ্যে ব্যবহার করা উচিত। আর চাউল তিন পোয়া, পাঁচসের জলে দেড় ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা কাপড়ে ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে আধ ছটাক লবণ, কিম্বা দেড় ছটাক মাত গুড় মিশাইয়া খাইতে দিতে পারা যায়।

এদেশে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, পীড়িত পশুর পায়ের গোচ পর্য্যন্ত জলে কিম্বা কাদায় ডুবাইয়া থাকিবার জন্য বান্ধিয়া রাখে। উহা দ্বারা মাস্তেপাড়া যদিও নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু সময় সময় লোম ও খুরের মধ্যে বালি ও কাদা প্রবেশ করাতে খুর খসিয়া পড়িবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে।

মুষ্টি-যোগ।

সহজ উপায়ে হটাৎ বাহ্যে করাইতে হইলে অল্প পরিমাণে লবণের সহিত মুক্তাবর্শির পাতা রগড়াইয়া মলদ্বার মুখে একটু গুঁজিয়া রাখ, অনতিবিলম্বে বাহ্য হইবে। আবাল বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই খাটিতে পারে।

স্ফোটক—ফোড়ার উপর কাঁটানটের পুল্‌টিস্ দিলে উহা আপনা হইতেই ফাটিয়া যাইবে।

সাবান এবং চিনির প্রলেপ ফোড়ার উপর লাগাইলেও উহা ফাটিয়া যায়।

ফোড়া বসাইতে হইলে বটের আঠা তাহার উপর দিয়া তাহাতে শিমুলের তুলা লাগাইয়া দিলে উহা বসিয়া যাইবে।

ঘরগৈলে বা ছোট গৈলের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া, ওষ্ঠ ব্রণ, পিষ্ঠাঘাত এবং বাগি প্রভৃতি সমুদায় ভাল হয়। অর্থাৎ এই প্রলে-

পের আশ্চর্য্য গুণ যে, কাঁচা অবস্থায় প্রলেপ দিলে বসিয়া যায় এবং পাকার অবস্থায় ব্যবহার করিলে পূঁজ নির্গত হইয়া শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

কৃষ্ণকলী ও জবা ফুলের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয়।

পুঁই পাতায় গাওয়া ঘৃত মাখাইয়া তাহা ফোড়ার উপর লাগাইয়া রাখিলে ফোড়া আপনা হইতে গলিয়া যায়।

পায়রার গরম বিষ্ঠা ফোড়ার উপর দিলেও উহা গলিয়া যায়।

রাত্রান্ধ—পান ছেঁচিয়া পরিষ্কার নেকড়ায় একটী পুঁটলি করতঃ তিন চারি দিন চোকে এক এক ফোটা দিলে অনেক স্থলে আরাম হয়।

আধ ছটাক পরিমাণ কডলিবর অয়েল দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া আহারের পূর্ব্বে বা পরে দুই তিন দিন সেবন করিলে রাতকাণা ভাল হইয়া থাকে।

পাঁঠার মেটে ভাজিয়া দিন কতক আহার করিলে রাত্রান্ধতা ভাল হয়।

গাওয়া ঘৃত কিছু দিন ব্রহ্মতালুতে প্রলেপ দিলেও রাতকাণা আরাম হইয়া থাকে।

মাথার মরামাস—গরম জলে কর্পূর ও সোহাগা মিশাইয়া জল শীতল হইলে তদ্দ্বারা মাথা ধৌত করিলে মরামাস উঠা নিবারণ হয়।

অগ্নি-কারক—কাঁচা পেপের বোঁটার দিকে কাটিলে যে আঠা নির্গত হয়, তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে যে গুঁড় প্রস্তুত হইবে, তাহা মন্দাগ্নি নিবারণের উত্তম ঔষধ। বালকে এক আনা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি আধ আনা পরিমাণ জলের সহিত হয় আহারের পূর্ব্বে কিম্বা পরে সেবন করিবে।

আধ ছটাক পরিমাণ গোঁড়া লেবুর রসে একটী গেঁটে কড়ি দিয়া পূর্ব্ব রাত্রে রাখিতে হইবে, পরদিন প্রাতে তাহাতে অল্প পরিমাণ ইক্ষু চিনি দিয়া সেবন করিলে তিন চারি দিনেব মধ্যে মন্দাগ্নি ভাল হয়।

বাতাবী লেবুর রোপণ প্রণালী।

বাতাবী লেবু এদেশীয় ফল নহে; উহা বটেবিয়া নামক স্থান হইতে আনীত হইয়া এদেশে উহার চাষ আবাদ হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে দেশ মধ্যে উহার যেরূপ গাছাদি হইয়াছে, তাহাতে অনেকেরই মনে বিশ্বাস আম্র ও কাঁঠালের ন্যায় এই সুখাদ্য ফল এতদ্দেশীয়। ফলতঃ উহা আমাদের দেশীয় ফল নহে। তবে ফলের মধুরতা জন্য দিন দিন দেশ মধ্যে বাতাবীর আদর বৃদ্ধি হইতেছে।

বাতাবী লেবু যেরূপ সুখাদ্য সে পরিচয় বোধ কাহাকেও দিতে হয় না। সকলেরই রসনা উহার অম্ল-মধুরতা গুণের সুখ্যাতি করিয়া থাকে। বাতাবী মাত্রেই যে, বেশ সুখাদ্য তাহা নহে। উহার মধ্যে আবার ভাল মন্দ দুইটী শ্রেণী আছে। যে বাতাবীর খোসা পাতলা, রোয়া রস-পূর্ণ এবং আস্বাদ অম্ল-মধুর তাহাই উৎকৃষ্ট। কোন কোন লেবুর মধ্যভাগ গাঢ় লাল, কোন কোন লেবুর মধ্যভাগ পাতলা লাল, আবার কোন কোন জাতীয় লেবুর মধ্যস্থল শাদা দেখা যায়। ফলতঃ ভাল জাতীয় বাতাবীর চারা রোপণ করাই সুপরামর্শ।

দুই প্রকার নিয়মে বাতাবী লেবুর চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বীজ হইতে এবং কলম বাঁধিয়া। বীজের চারা অপেক্ষা কলমের গাছই ভাল। কারণ অল্প দিনের মধ্যে এবং মূল গাছের অনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইলে কলম বাঁধাই যুক্তিসিদ্ধ। বীজের চারায় ফল ফলিতে কখন কখন ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্তও সময় অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু কলম-জাত চারায় ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই ফল ফলিয়া থাকে।

লেবুর সকল বীজেই ভালরূপ চারা হয় না। সুপক্ক লেবুর পুষ্ট বীজই চারা তৈয়ার করিবার পক্ষে প্রশস্ত। আমরা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বীজ নির্ব্বাচন দোষে অনেক প্রকার ফুল ও ফলের দিন দিন অধোগতি সাধিত হইতেছে। অতএব বীজের প্রতি দৃষ্টি রাখাই যে কোন চাষ আবাদের উন্নতির মূল তাহা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

এক্ষণে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন বীজ ও কলম দুই উপায়ে

বাতাবীর চারা প্রস্তুত করিতে হয় এবং কোন্ প্রকারে চারা তৈয়ার করিলে ফলের উন্নতি হইয়া থাকে, তাহাও বোধ হয় আর উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। গৃহস্থদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আমরা ক্রমে ক্রমে ঐ উভয় প্রকার রোপণের প্রথাই উল্লেখ করিতেছি।

বীজের চারা।—ভাল ভাল জাতীয় সুপক্ক বাতাবীর পুষ্ট বীজ নির্ব্বাচন করিতে হয়। টব, গামলা এবং ক্ষেত্রে সকল স্থানেই উহা রোপণ করিতে পারা যায়। কিন্তু প্রথমে ভূমিতে রোপণ না করিয়া কোন পাত্রে রোপণ করাই ভাল। কারণ তাহা হইলে উই, কেঁচো এবং পিপীলিকা লাগিয়া বীজের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, আর একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, আবশ্যক মত উহাতে রৌদ্র ও বৃষ্টি প্রভৃতি লাগাইতে পারা যায় না। দো-আঁশ মাটিতেই বাতাবী লেবু ভাল জন্মিয়া থাকে। অতএব ঝুরা দো-আঁশ মৃত্তিকা কোন পাত্রে পূর্ণ করিয়া তাহাতে ফাক ফাক করিয়া এক একটী বীজ পুতিতে হয়। উহা অধিক মাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট না করিয়া কেবলমাত্র মুখটিতে মৃত্তিকার আচ্ছাদন পড়িবে এইরূপ ভাবে, রোপণ করিতে হইবে।

বীজ রোপণের পর মধ্যে মধ্যে মাটির অবস্থা বুঝিয়া উহাতে জল দিতে হয়, অর্থাৎ মাটি যেন অল্প রসাল থাকে। মাটি রস-যুক্ত থাকিলে অল্প দিনের মধ্যেই বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া উঠে। চারা বাড়িতে আরম্ভ হইলে মধ্যে মধ্যে উহার গোড়া খুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। চারি পাঁচ অঙ্গুলি হইতে এক কিম্বা দেড় হাত পর্য্যন্ত বড় চারা তুলিয়া স্থায়ীরূপে রোপণ করিতে পারা যায়। চারা তুলিবার সময় বিশেষ সাবধানতা সহকারে উহা তুলিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ সেই সময় মূল শিকড় কাটিয়া গেলে গাছের বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে। চারা রোপণ সময়ে মৃত্তিকার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; কারণ যখন উৎকৃষ্ট জাতীয় লেবুর বীজে মৃত্তিকার দোষে ফলের গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। তখন সে বিষয়ে তাচ্ছিল্য করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দো-আঁশ মৃত্তিকায় ফল ভাল হইয়া থাকে, সেইরূপ এটেল মাটিতেও ফল মন্দ হয় না। কিন্তু বেলে মাটিতে রোপণ করিলে ফলে ভালরূপ রস হয় না।

অন্যান্য ফলের ন্যায় প্রতি বৎসর আশ্বিনের শেষে এবং কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই গাছের গোড়া খুড়িয়া পুনর্ব্বার তাহা সার দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া উচিত। পাঁইটের গুণেও যে ফলের উৎকৃষ্টতা সাধিত হইয়া থাকে, তাহাও যেন রোপণকর্ত্তার মনে থাকে।

ফাল্গুণ মাসে বাতাবী লেবুর ফুল হইতে থাকে। সে সময় বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া যে এক প্রকার প্রাণ-মাতানে সৌরভ বিস্তার হইতে থাকে, কেবলমাত্র সেই সুগন্ধ উপভোগ করিয়াই বৃক্ষাদি রোপণের সমুদায় পরিশ্রম সফল বোধ হইয়া থাকে।

গাছের চারার অবস্থায় উহা ভাল করিয়া ঘিরিয়া রাখা আবশ্যক, কারণ গো এবং ছাগাদি পশু উহার প্রধান শত্রু! কোন জন্তুতে একবার পাতা খাইলে সে ক্ষতি পূরণ করিতে বিস্তর সময় অপেক্ষা করিতে হয়। অতএব কোন প্রকার পশুতে যেন চারায় কোন প্রকার অপকার করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হয়।

কলম।—যোড় ও গুল দুই প্রকার কলম দ্বারা বাতাবী লেবুর চারা হইয়া থাকে। এই উভয়ের মধ্যে গুল কলমই অতি সহজ। মনে করিলে প্রত্যেক গৃহস্থই উহা বাঁধিতে পারেন। যে নিয়মে আম্রের যোড় কলম বাঁধিতে হয় ইহারও যোড় বাঁধার পক্ষে সেই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

তরলবাজ ও সেটে নামক যে এক প্রকার লেবু আছে, তাহার চারার সহিত বাতাবীর শাখায় যোড় বাঁধিলে সহজেই চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে বীজের দোষে লেবু ভাল মন্দ হইয়া থাকে; সেইরূপ অনেক স্থানে আবার দেখিতে পাওয়া যায় কলম বাঁধা অর্থাৎ ডাল নির্ব্বাচন দোষেও অনেক সময় গৃহস্থদিগকে বিফল মনোরথ হইতে হয়। কারণ যে কোন ফল বৃক্ষের সকল শাখা-জাত চারায় ভালরূপ ফল ফলে না। বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে যে ক্রেতাগণ অনেক সময় চারা খরিদ করিয়া প্রতারিত হইয়া থাকেন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, বিক্রেতাগণ শাখার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সহজে

যত চারা প্রস্তুত করিতে পারে, সেই দিকেই সমধিক দৃষ্টি রাখিয়া থাকে, সুতরাং তাহারা যে কোন শাখায় কলম বাঁধিয়াই চারা তৈয়ার করিয়া থাকে। যে সকল শাখা নীচের দিকে মুখ করিয়া থাকে, সেই সকল ডালে কলম বাঁধিলে ভালরূপ ফল ধরে না, কখন কখন আবার এরূপও দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ ডালে কলম বাঁধিয়া যে চারা প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই চারায় আদৌ ফল ধরে না। সকল বীজ-জাত চারায় যেমন ফল ধরে না, সেইরূপ সকল শাখা-জাত চারাতেও ফল ফলিতে দেখা যায় না। গাছের যে সকল শাখা বেশ তেজাল সেই সকল শাখায় কলম বাঁধাই উত্তম যুক্তি।

যে সকল গাছের ফল উৎকৃষ্ট বলিয়া বিশেষরূপ জানিত, সেই সকল গাছেই কলম বাঁধা উচিত। নতুবা উপযুক্ত মত পরিশ্রম করিয়া শেষে মন্দ ফল ফলিতে আরম্ভ করিলে তাহাতে মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। অতএব শেষে যাহাতে ক্ষুব্ধ হইতে না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখাই সুপরামর্শ।

বৎসরের মধ্যে আবার সকল সময়ে কলম বাঁধা চলে না। আষাঢ় ও শ্রাবণ প্রভৃতি বর্ষাকালে কলম বাঁধাই প্রশস্ত। অন্যান্য গাছের ন্যায় লেবুর গুল কলম বাঁধিলে শীঘ্র শিকড় বাহির হয় না। কখন কখন কলমে চারা হইতে তিনি মাস পর্য্যন্তও সময় লাগিয়া থাকে।

যে শাখা সরল এবং নিতান্ত কচি নহে, এরূপ অবস্থা ডালে কলম বাঁধাই ভাল। কারণ নিতান্ত কোমল শাখায় কলম বাঁধিলে তদুৎপন্ন চারা শীঘ্র মরিয়া যাইবার সম্ভব। কিন্তু ঐরূপ শাখায় অল্প দিনের মধ্যে চারা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। আর কঠিন অর্থাৎ যে সকল শাখার কাঠ শক্ত, তাহাতে কলম বাঁধিলে শিকড় নির্গত হইতে বিলম্ব হইয়া থাকে। শাখার নিতান্ত গোড়ায় কলম না বাঁধিয়া তাহার যে স্থান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেঁক্‌ড়ী সকল নির্গত হইয়া থাকে, তাহার কিছু দূরে পশ্চাৎ দিকে কলম বাঁধাই প্রশস্ত।

শাখার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরী দ্বারা ডালটী বেড়িয়া একটী গোল দাগ দিতে হইবে এবং তাহার ঠিক নীচে তিন

চারি আঙ্গুলের পর ঐরূপ আর একটী দাগ দিয়া প্রথম দাগ হইতে নিম্নের দাগ পর্য্যন্ত লম্বালম্বী ভাবে ছাল চিরিয়া দিতে হইবে। এখন সেই ছালখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া ফেলা আবশ্যক।

ডালের ছাল তোলা হইলে সেই স্থানে গুল কলম বাঁধিতে হয়। এক দলা দো-আঁশ মাটির কাদা প্রস্তুত করিয়া তাহা দুই খণ্ড করতঃ দুই হাতে ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত ছাল তোলা স্থানে টিপিয়া দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। পরে সেই মৃত্তিকা লেপিত স্থান চট্ কিম্বা নারিকেলের ছোব্‌ড়া দ্বারা জড়াইয়া দিতে হয়। এই আবৃত মৃত্তিকা যাহাতে শুষ্ক না হইতে পারে, তজ্জন্য তাহার উপর একটী ছিদ্রযুক্ত ভাঁড় জল পূর্ণ করিয়া রাখিলে ভাল হয়। কারণ ঐ ছিদ্র পথে সর্ব্বদা জল বিন্দু বিন্দু পতিত হইয়া কলম স্থান রসাল রাখিতে পারে। যদি কলম বাঁধার পর সর্ব্বদা বৃষ্টি হয়। তবে ঐরূপ নিয়মে জল দেওয়ার কোন আবশ্যক হয় না।

কলম বাঁধা স্থান হইতে শিকড় বাহির হইলে সেই শাখার বন্ধন স্থানের উত্তর মুখ কাটিয়া লইলেই কলম কাটা হইল।

এখন এই চারা কোন একটী স্থানে হাপোর দিয়া তথায় কিছুদিন রোপণ করিয়া রাখিলে ভাল হয়। পরে তথা হইতে তুলিয়া মনোনীত স্থানে রোপণ করিলেই কলমের চারা রোপণ করা হইল।

চারা রক্ষা ও পাইটাদি করিবার পূর্ব্বে যে সকল নিয়ম উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই আর কিছু করিতে হইবে না।

প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে দুই একটা বাতাবী লেবুর গাছ রোপিত হইলে ফলের জন্য অন্যের মুখ অপেক্ষা করিতে হয় না। আমরা চারা রোপনাদি সম্বন্ধে যে সকল বিষয় উল্লেখ করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া সকল গৃহস্থই এই সুখাদ্য ফল বৃক্ষের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

চিনি প্রস্তুত।

গৃহস্থ ঘরে চিনি প্রায় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য। যে দ্রব্য সর্ব্বদা ব্যবহারে লাগিয়া থাকে, তাহার জন্ত অন্তের মুখাপেক্ষী না হইয়া প্রতি গৃহে উহার প্রস্তুত নিয়ম জানিয়া রাখা যে অতীব আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হয় না। এদেশে দুই প্রকার চিনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইক্ষু ও খর্জ্জুর-জাত। এই উভয় প্রকার চিনির মধ্যে ইক্ষু চিনি হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে পবিত্র। এজন্ত উহা দৈব-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চিনি প্রস্তুতের নিয়ম অতি সহজ; মনে করিলে প্রত্যেক গৃহেই উহা প্রস্তুত হইতে পারে। যে সময় নূতন গুড় উঠিয়া থাকে, সেই সময় যদি আবশ্যক পরিমাণ গুড় দ্বারা চিনি প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সম্বৎসরের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। এই প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য যেরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়, এক্ষণে তাহা লিখিত হইতেছে।

সকল প্রকার গুড় দ্বারা ভাল রকম চিনি প্রস্তুত হয় না। যে গুড়ে রসযুক্ত দানা থাকে, তাহাতেই উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত হয়। প্রথমে একটা পেতেতে সার গুড় ফেলিয়া রাখিতে হইবে। ঐ পেতেটার নিম্নে স্বতন্ত্র একটা গামলা অথবা তদ্‌সদৃশ কোন পাত্র রাখা আবশ্যক। কারণ পেতেতে গুড় ফেলিলে তাহার সেটে অর্থাৎ মাত ঝরিতে থাকে, সুতরাং পেতেটী যদি কোন পাত্রে বসান না যায়, তাহা হইলে ঐ সেটে মাটিতে পড়িয়া নষ্ট হইবার সম্ভব কিন্তু কোন পাত্রে স্থাপন করিলে সে অপচয় সহ্য করিতে হয় না। দুই তিন দিন পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় থাকিলে গুড় হইতে অধিক পরিমাণ সেটে নির্গত হইয়া থাকে। পরে ঐ পেতেস্থ সার গুড়ে জলের ছিটা দিয়া নদী এবং পুষ্করিণী প্রভৃতিতে যে এক প্রকার পাটা শেওলা (শৈবাল) জন্মিয়া থাকে, তাহা পেতের গুড়ের উপর চাপা দিয়া রাখিতে হয়। শেওলা চাপা গুড় আটদিনের মধ্যেই শাদা রঙের হইয়া উঠে। এই সময় একটী কথা মনে রাখা উচিত যে, পেতের উপরিভাগে

গুড় যেরূপ শাদা রঙের হইয়া থাকে, ভিতরের গুড় সেরূপ হয় না। এজন্য যে পর্য্যন্ত শাদা বর্ণ দেখা যায়, সেই পর্য্যন্ত চাঁচিয়া তুলিয়া লইতে হয়। পেতের শাদা গুড় চাঁচিয়া লইয়া অবশিষ্ট লালী গুড়ের উপর পূর্ব্ববৎ শেওলা চাপা দিয়া রাখিতে হইবে এবং নিয়মিত সময়ে অর্থাৎ পেতের উপরিভাগের গুড় শাদা হইলে তাহাও আবার চাঁচিয়া লইতে হইবে। এইরূপ নিয়মে সমস্ত পেতের গুড় চাঁচিয়া লইতে হয়।

পেতে হইতে প্রথমে যে শাদা গুড় তুলিয়া লওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে উত্তম চিনি হয় না। এজন্য উহা দ্বারা পুনর্ব্বার ভাল চিনি তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ সেই দোলো বা খাঁড় একখানি খোলাতে অল্প পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া তাহা জ্বালে চড়াইতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল মিশ্রিত দুগ্ধের ছিটা মারিতে হয়। দুগ্ধ মিশ্রিত জল দিলে উহার যাবতীয় ময়লা অর্থাৎ গাদ উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে কিন্তু প্রথম দিনের গাদ না কাটিয়া জ্বাল হইতে নামাইয়া অন্য একটী দ্রব্য চাপা দিয়া রাখিতে হয়। প্রথম দিনের ন্যায় দ্বিতীয় দিনেও আবার উহা জ্বালে চড়াইয়া দুগ্ধ মিশ্রিত জলের ছিটা দিয়া গাদ তুলিতে হয়। যখন দেখা যাইবে সমুদায় গাদ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, তখন তাহা জ্বাল হইতে নামাইয়া খোলার গায়ে তাড়ু দ্বারা অনবরত নাড়িতে চাড়িতে হইবে, এইরূপ ভাবে নাড়া চাড়া করিলে তাহা কঠিন আকারে জমিয়া যাইবে।

এক্ষণে ঐ কঠিন দ্রব্য একখানি তক্তার উপর স্থাপন করিয়া নোড়া দ্বারা বাটিয়া লইলেই আমাদের ব্যবহার্য্য চিনি প্রস্তুত হইল।

চিনি প্রস্তুত এবং তাহা পরিষ্কৃত করিবার জন্য ইংরাজেরা বিস্তর উন্নতি সাধন করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে তাহার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। আজকাল চিনি একটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি বৎসর বিস্তর চিনি এদেশ হইতে ইয়ুরোপ প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইতে

আরম্ভ হইয়াছে। ফলতঃ চিনির যেরূপ আদর, এই সময় হইতে উহার বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে বিলক্ষণ লাভের সম্ভব।

বিবিধ তত্ত্ব।

কালীর দাগ—কাপড়ে যদি কালির দাগ লাগে, তবে সেই স্থানে প্রথমে মোমবাতি কিম্বা চর্ব্বি দ্বারা ঘষিয়া পরে সাবানে ধৌত কর, উহা উঠিয়া যাইবে।

কাষ্টকির দাগ—কোন স্থানে কাষ্টকির দাগ লাগিলে, সেই দাগের উপর যদি আইওডাইড অব্ পোটাস্ গুলিয়া রগড়ান যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা উঠিয়া যাইবে।

বস্ত্রাদিতে তৈলের দাগ—বস্ত্রাদিতে তৈল, চর্ব্বি কিম্বা আলকাতরা প্রভৃতি লাগিলে যে দাগ পড়ে, তাহা পরিষ্কার করিতে হইলে কতকগুলি লেবুর ফালি এবং একটী আখরোট ফলের পরিমাণ পোটাস দুই পাউণ্ড জলে বেশ করিয়া গুলিয়া লও এবং উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে এক দিন রৌদ্রে রাখ। রৌদ্রে দেওয়ার পর উহা একখানি পরিষ্কৃত বস্ত্রে ছাঁকিয়া বোতলে পূর্ণ করতঃ তাহার মুখ ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখ। বস্ত্রাদিতে পূর্ব্বোক্ত যে কোন প্রকার দাগ পড়িলে সেই দাগের উপর বোতলের আরক বেশ করিয়া মাখাইয়া রগড়াইতে থাক। অনন্তর তাহা জলে ধৌত করিয়া দেখ, সমুদায় দাগ উঠিয়া গিয়াছে।

রেশমীবস্ত্রে দাগ—কিঞ্চিৎ স্পিরিট্ অব্ টার্পেণ্টাইন লইয়া যে কোন রেশমী বস্ত্রের দাগের উপর ঘষিতে থাক, দেখিবে অনতিবিলম্বে তাহা উঠিয়া যাইবে।

পিপীলিকা—কোন স্থানে পিপীলিকার অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ হইলে তথায় খানিক কর্পূর ছড়াইয়া দেও, দেখিবে উহারা আপনা হইতেই পলায়ন করিবে।

আঠা—এরারুট জলে গুলিয়া আগুণে সিদ্ধ করিয়া লও, উত্তম

আঠা প্রস্তুত হইবে, তদ্দ্বারা কাগজাদি আঁটিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

পচা দ্রব্য—কোন স্থানে আবর্জ্জনাদি পচিয়া অথবা অন্য কোন গলিত দ্রব্যের দুর্গন্ধ উঠিতে আরম্ভ হইলে তাহাতে কয়লা মিশাইয়া রাখিলে সমুদায় দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া থাকে; কারণ কয়লার এমন একটী অসাধারণ গুণ আছে যে, বিকৃত দ্রব্যাদির বাষ্প আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে এবং তাহা হইতে আর উহা বহির্গত হইতে পারে না। এজন্য কয়লা দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। পানীয় জল পরিষ্করণে, পীড়িত ব্যক্তির গৃহস্থিত বায়ুর দূষিত শক্তি নষ্ট করিতে কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুখে দুর্গন্ধ হইলে নিত্য কয়লার গুঁড়া দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করিলে তাহা নিবারিত হয়। কয়লা দ্বারা যে সকল উপকার হইয়া থাকে, সময়ান্তরে তাঁহার সবিশেষ উল্লেখ করিব ইচ্ছা আছে।

কৃষি ব্যবহার্য্য সার।

আহার গ্রহণ করিলে যেরূপ প্রাণি-শরীর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, উদ্ভিদ-দিগের পক্ষেও সেইরূপ সার আহারের ন্যায় তাহাদিগের পুষ্টি-সাধন এবং ফুল ও ফলের উন্নতি-বর্দ্ধন করিয়া থাকে। এস্থলে আর একটী কথাও মনে রাখা আবশ্যক, অর্থাৎ যে সকল পদার্থে আমাদের শরীর নির্ম্মিত অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ এবং অস্থি প্রভৃতি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে সকল উপাদান বর্ত্তমান, সেই সকল উপাদানের সহায়তা করিতে সমর্থ, এরূপ আহারই যেমন জীব শরীরে উপকার হইয়া থাকে এবং তাহার অভাব-জনক কোন খাদ্য আহার করিলে যেমন শরীর রক্ষা হয় না; সেইরূপ যে সকল উদ্ভিদের চাষ আবাদ করিতে হয়, কোন্ কোন্ পদার্থ দ্বারা তাহাদিগের পুষ্টি-সাধন হইতে পারে, তাহা না জানিয়া চাষ আবাদ করিলে কোন ফল দর্শে না। এদেশে কৃষি কার্য্যের যে, দিন দিন অধোগতি সাধিত হইতেছে সার নির্ব্বাচন এবং তাহার উপযুক্ততার অভাব যে, একটী প্রত্যক্ষ কারণ

কোন গৃহস্থই তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া চাষে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং পর্য্যাপ্ত পরিমাণ যে ফলাদিতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি!

সারের মধ্যে কোন্ কোন্ পদার্থ বর্ত্তমান থাকে এবং সেই সেই পদার্থ কোন্ কোন্ উদ্ভিদের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা পাঠ করিয়া বোধ হয় এদেশের অনেকেই হাস্য করিয়া উঠিবেন কিন্তু তাঁহারা যদি ইয়ুরোপ এবং আমেরিকার কৃষি-কার্য্যের বিবরণ পাঠ করেন, তাহা হইলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, সারের গুণাগুণ পরীক্ষা ও তাহার ব্যবহার দ্বারা তাঁহারা কৃষি-কার্য্যের যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। সে যাহা হউক আমরা পাঠকবর্গকে সার সম্বন্ধে স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত করাইয়া প্রস্তাব শেষ করিব।

অম্লজান, যবক্ষারজান, আঙ্গরিকাম্ল ও জলজান এবং পটাশ, ম্যাগ্নেশিয়া, ফস্ফরস্, চূণ প্রভৃতি কতকগুলি বায়বীয় এবং কতকগুলি পার্থিব পদার্থ গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদ্ শরীর পরিপোষণ হইয়া থাকে। এই উভয়ের মধ্যে বায়বীয় পদার্থ (সার) তাহারা প্রয়োজন মত বায়ু হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং পার্থিব সার মূল দ্বারা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি-সাধন করতঃ ফুল, ফল, পত্র প্রভৃতি দ্বারা আমাদের উপকার সাধন করে। ফলকথা সহজে এইরূপ মনে রাখা উচিত, গাভীকে যেমন তাহার দেহের পুষ্টি-জনক খাদ্য প্রদান করিলে দুগ্ধ পাওয়া যায়। সেইরূপ যে কোন উদ্ভিদ্ হইতে ফল শস্যাদি গ্রহণ করিতে হইলে তাহার দেহের উপযুক্ত খাদ্য বা সার ক্ষেত্রে প্রদান না করিলে তাহা লাভ করিতে পারা যায় না।

নানাবিধ দ্রব্য হইতেই উদ্ভিদ্দিগের পোষণোপযোগী সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাণিদিগের মল-মূত্র, অস্থি ও বোদ মাটী এবং খৈল প্রভৃতি অনেক প্রকার সার ব্যবহার হইয়া থাকে। সচরাচর উদ্ভিজ্জ-সার, প্রাণি-সার এবং মিশ্র-সার এই ত্রিবিধ সার ব্যবহার করিতে হয়। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সার যে, আবার উদ্ভিদ্দিগের প্রকৃতি অনুসারে ক্ষেত্রে প্রদান করিয়া চাষ আবাদ করিতে হয়, পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক।

কোন্ কোন্ সার কি প্রকার নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়, তদ্বিবরণ পাঠ করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য আমরা স্থানান্তরে তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া সাধারণের গোচর করিব।

বঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবার।

বাঙ্গালীর গৃহস্থালী পাঁচটা লইয়া; পাঁচটিতে মিলিয়া মিশিয়া—পাঁচ প্রাণে এক প্রাণ হইয়া বাঙ্গালীর এই একান্নবর্ত্তী পরিবার—দুঃখের সংসারে সুখের প্রস্রবণ—সন্তোষের উৎস উৎপাদন করে। যখন নিরাশায় জীবনে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় বোধ হয়—যখন বিষাদের প্রচণ্ড আঘাতে হৃৎপিণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া দশদিক শূন্য দেখিতে হয়—যখন অখিল বিশ্বের মধ্যে "আহা" কথাটী বলিবার জন্য কাহাকেও খুঁজিয়া মিলে না—তখন এই পরিবারমণ্ডলী সেই হতাশ হৃদয়কে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে—তাহার সজীবতা প্রদান করে।

তাই বলি—একান্নবর্ত্তী পরিবার বঙ্গ গৃহে বড়ই আদরের জিনিষ। সেই জন্যই পাশ্চাত্য অর্থবাদ যতই বলুক না কেন, আমরা অন্তরের সহিত এ রীতির অনুরক্ত।

তবে ইহার অপব্যবহারের নিমিত্ত আজিকালি কেহ কেহ ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন। কিরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রার্থনীয়—কি উপায়ে তাহা সংগঠিত হইতে পারে এবং তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধিই বা কি—গৃহস্থালীর এই সকল অতি গুরুতর কথার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব।

সহবাস মানব প্রকৃতির মুখ্য অঙ্গ। সহবাস ব্যতীত মানব সমাজ কিছুতেই সজীব থাকিতে পারে না—লোকস্থিতি ক্ষণকালের নিমিত্তও টিঁকিতে পারে না। ইহা সামাজিক সংগঠন (Manufacture) নহে; ইহা প্রাকৃতিক উৎপত্তি (Growth)। জগতের আদিম অবস্থা হইতে আজি পর্য্যন্ত অতি অল্প মানব-প্রকৃতি এ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে। এই প্রকৃতি হইতে বাঙ্গালীর সংসার আজি একান্নবর্ত্তী পরিবারে পরিণত হইয়াছে।

নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিলে ইহাতে যে, কেবলমাত্র শুভই দৃষ্ট

হইবে এমত নহে। ইহাতে দোষও আছে, তবে দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগটা যে বেশী তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু জগতের কোন্ বস্তুই বা ভাল মন্দে জড়িত নয় ?—

প্রথমতঃ ইহাকে ধরিয়া আমাদের মানসিক প্রকৃতির বিচার করা যাউক। বঙ্গগৃহে পাঁচটীতে একত্র সহবাস দ্বারা স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা এবং সহানুভূতি প্রভৃতি আমাদের প্রকৃতির উচ্চ বৃত্তিসমূহ সবিশেষ পরিচালিত হয় এবং উন্নত ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা অতি সহজ কথা ও সকলেই বলিয়া থাকেন। সুতরাং অধিক করিয়া সে মোটা কথা বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। ভগ্নীর ত্যাগ স্বীকার—ভার্য্যার পরিচর্য্যা—জননীর স্নেহ-জনিত উৎকণ্ঠা,—জনকের অভয়দান—ভ্রাতার উৎসাহ বর্দ্ধন আমরা প্রত্যেকে প্রত্যহ উপভোগ করিতেছি। হিন্দু পরিবারের এই সমস্ত মহৎ ভাব দেখিয়াই জনৈক ইয়ুরোপীয় মহোদয় পণ্ডিত একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "কেন আমি হিন্দুগৃহে জন্মিলাম না।" অধিক কি আমরা একথাও মুক্তকণ্ঠে বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, কোম্‌তের (Religion of humanity) নরপূজা ধর্ম্মের বিধান, আদর্শ হিন্দু পরিবারের অপেক্ষা উচ্চদরের পদার্থ নহে একথা অতি রঞ্জিত নহে। আমাদের রামায়ণ মহাভারতে যে ভাবে নর চরিত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—ও যেরূপে পারিবারিক সহানুভূতি প্রদর্শিত হইয়াছে, বলিতে কি পাশ্চাত্য কল্পনায় সে ভাব উদয় হইতে পারে না এবং আমরা তাহা যতদূর হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ—হাজার সত্য হউক, না কেন—পৃথিবীর অন্য কোন জাতি সেভাব ততদূর উচ্চভাবে ধারণা করিতে সক্ষম নহে। তাই বলিয়া "ভারতেই যে মানব প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব" একথা আমরা বলিতেছি না। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বঙ্গের আদর্শ একান্নবর্ত্তী পরিবার অনেক সভ্য জাতির সংসার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; এবং বঙ্গে পারিবারিক সহানুভূতি যতদূর সম্ভব, তাহা অন্য কোন স্থানে সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমরা বিলক্ষণ সন্দিহান আছি।

এই পারিবারিক সহানুভূতি হইতে মানুষ যে সংসার-বিধান বা মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে (অন্য বিধানগুলি যেরূপ হউক না কেন) তাহা

পাশ্চাত্য ব্যবস্থা প্রণালী অপেক্ষা অতি উচ্চদরের পদার্থ। সমদর্শীতা এবং সহানুভূতির যতদূর পরাকাষ্ঠা আমাদের বিধানে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি আবার একদেশদর্শীতার চূড়ান্ত প্রমাণ পাশ্চাত্য নীতিতে জাজ্বল্যমান। একটী সাধারণ কথায় উদাহরণ স্বরূপ উত্তরাধিকার স্বত্বের বিষয় বিবেচনা করুন। অবশ্য অর্থবাদের (Economical coven) কথা ছাড়িয়া দিলে বিষয় বিভাগে এরূপ সমদর্শীতা অতি অল্প জাতির শাস্ত্রেই পাওয়া যায়।

এখন কথা এই যে, এরূপ ভালবাসা, সহানুভূতি ও মমতার মধ্যে কি হৃদয়-বিদারক বিচ্ছেদ, গ্লানিময় বিষাদ নাই? যদি থাকে তবে এরূপ একত্র সহবাসকে এত বাড়াইবার প্রয়োজন কি?—কিন্তু বিচ্ছেদ বিষম্বাদ নাই কোথায়?—ইতিহাসে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একত্র সহবাস ও তজ্জনিত সহানুভূতি সত্বেও অনেক রাজসংসারে পিতা পুত্রে—ভ্রাতা ভগিনীতে অতি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিবাদ সংঘটন হইয়াছে। তথাপি এই একান্নবর্ত্তী পরিবারে আমরা ভালবাসার বিলক্ষণ আঁটাআঁটি দেখি এবং হিন্দু সংসারের চক্ষে বোধ হয় যেন এ বন্ধন ছিন্ন করা বড় একটা সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ দুর্ঘটনা সত্বেও আমরা বলিব যে, এই একান্নবর্ত্তী পরিবারে সহবাস-জনিত ভালবাসার বিলক্ষণ আধিক্য আছে এবং সেই জন্যই অদ্যাপি ভ্রাতাগণের মধ্যে সংসার পৃথক হইলে আমাদের চক্ষে তাহা বড়ই বিসদৃশ বোধ হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য অনেক জাতির মধ্যে এরূপ ভ্রাতাগণের পার্থক্য ত দূরের কথা—এমন কি সচরাচর পিতা পুত্রের মধ্যে যে, সংসার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে তাহাও কিছুমাত্র দূষণীয় নহে। স্বীকার করিলাম এরূপ সাংসারিক পার্থক্যে আর্থিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে—স্বীকার করিলাম এরূপ পার্থক্যে অনেক সময় সাংসারিক ব্যাপারে স্বচ্ছন্দতা সংঘটিত হইতেও পারে কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ নীতি কি পাশব ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে না?—সন্তান উপযুক্ত হইল—খুঁটিয়া খাইতে শিখিল, আর উড়িয়া পলাইয়া গেল—পশ্চাতে বৃদ্ধ পিতা মাতার দিকে ফিরিয়া চাহিল না—তাহাদের জন্য ভাবিল না, এমন কি তাহাদের সহিত যে পূর্ব্বের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল, এমন ভাবও মনে স্থান দিল

না। নিজ হৃদয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন—স্বীয় অনুভূতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখুন—এরূপ নীতিকে পাশব ধর্ম্ম বলিবে কি না? যদি এই সংসারে মানব সুখ-ভোগের নিমিত্ত আসিয়া থাকে, আর যদি দয়া, ভক্তি, স্নেহ প্রভৃতি উচ্চ বৃত্তি সমূহের পরিচালনে সেই সুখের উদ্ভব হইতে পারে—এই সার্ব্বভৌম স্বর্গীয় মত যদি ঠিক হয়, তবে সকলেই ইহা একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে, এরূপ বিশ্লেষণ পশুর পক্ষেই শোভা পায় এবং এক কথায় ইহা সম্পূর্ণরূপে পাশব ধর্ম্ম।

সন্তান সূতিকা গৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাপ্ত বয়স পর্য্যন্ত পিতা মাতার পালনে, ভ্রাতা ভগ্নীর স্নেহে ও পরিবারস্থ অপর আত্মীয় বর্গের আদরে সম্বর্দ্ধিত হইল। এখন তাহার হৃদয়ের স্নেহ, মমতা প্রভৃতি মানব প্রকৃতির মুখ্য বৃত্তি সমূহের পূর্ণ বিকসিত অবস্থা। এ অবস্থায় যদি তাহাকে জগতের ভালবাসার শ্রেষ্ঠ পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়, তবে তাহার হৃৎপিণ্ড হইতে সমুদায় কোমল বৃত্তিগুলি নিশ্চয়ই সমূলে উৎপাটিত হয় এবং পরিণামে হৃদয় উদ্যানে সেগুলির সঞ্জীবতা বড়ই বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠে। তখন তাহার নীচ স্বার্থপর বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তখন সে কেবল আপনার প্রাণ, আপনার দেহের জন্যই ব্যগ্র—পরের দিকে ফিরিয়াও চাহিতে যেন নারাজ।

এইরূপ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিচ্ছিন্নতায় জীবনের মধুময় পারিবারিক সহানুভূতিটুকু নষ্ট হইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে নীরস স্বার্থপরতা হৃদয়কে অধিকার করে।*

* তাহার পরিচয় স্থূল বাঙ্গালীর হৃদয় ও ইংরাজের হৃদয়। সাধারণতঃ আমাদিগকে নীচ স্বার্থপর বলিয়া গালি দিয়া থাকে। আমরা সদর্পে বলি যে, সে গালির উপযুক্ত পাত্র ইংরাজ—বাঙ্গালী কখনই নহে। বাঙ্গালীর আতিথ্য—বাঙ্গালীর করুণা-প্রণোদিত দান—ইংরাজের স্বার্থ-ময় সামাজিকতা (Socialism) অপেক্ষা সর্ব্বব্যাপী এবং স্বর্গীয় ভাব পূর্ণ। এ কথা যে নিরপেক্ষ ইংরাজ আমাদের রীতি নীতি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে আজিকালি এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের বন্ধন শিথিল হইবার উপক্রম হইতেছে এবং তাই পাশ্চাত্য সম্ভোগ-বাদের (Utilita rianism) ভাব সমাজের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভরসা করি কৃতবিদ্য যুবকগণ এই পাশ্চাত্য নীতি বিলক্ষণ সাবধানে বিচার করিবেন।

অতঃপর বিবেচ্য এই যে, কিরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবার আদরের পদার্থ। অবশ্য আমরা এক্ষণে আদর্শ একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিশাল চিত্র প্রকটিত করিতে পারিব না। তবে স্থূলভাবে তৎসম্বন্ধে গুটিকয়েক প্রধান প্রধান কথা উল্লেখ করিবারমাত্র।

একান্নবর্ত্তী পরিবার আমাদের দেশে অনেক সময় ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিবর্গ ব্যতীত অপর কুটুম্বগণ কর্তৃকও গঠিত হয়। এরূপ স্থলে দেখা যায় যে, বিশেষ নিকটবর্ত্তী মাতুল, পিতৃব্য ব্যতীত বহুদূরের শ্যালক, ভগ্নীপতি প্রভৃতি যুটিয়া অনেক সক্ষম আত্মীয়ের স্কন্ধে ভারার্পণ করে। তাহাতে যে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিষময় ফল ফলিবে তাহার আর সন্দেহ কি? এরূপ অবস্থায় গলগ্রহগণ অক্ষম না হইয়াও আলস্যের ক্রীতদাস—সুতরাং সমাজের কণ্টক এবং প্রধানতঃ এই কারণেই একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতি ঘৃণা জন্মিতেছে। ইহাতে আরও বিশেষ ক্ষতি এই যে, এরূপ অলস গলগ্রহগণ সমন্বিত পরিবারমণ্ডলী প্রায়ই এক কর্ত্তা বা কর্ত্রীর সুশৃঙ্খলায় সর্ব্বক্ষণ থাকিতে পারে না এবং তাহা কখনই সম্ভবও নহে। তাহাতে ফল এই হয় যে, এরূপ পরিবারমণ্ডলী অশান্তির নিকেতন হইয়া উঠে।

তাই আমারা বলি যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার এরূপ সংখ্যায় ও এরূপ ব্যক্তিবর্গে গঠিত হওয়া আবশ্যক যে, সময় অনুসারে যাহার ভার বহনে বা যাহার সুব্যবস্থা সংস্থাপনে কর্ত্তার বা পারিবারিক কোন ব্যক্তির ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়; এবং যেন পারিবারিক প্রত্যেক ব্যক্তি গলগ্রহ না হইয়া (কর্ম্মক্ষম) জীবন পরিচালনা করিতে পারে। এরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবারে আলস্যের আশ্রয় দেওয়া হইবে না—বা এরূপ

পরিবার কখনই অশান্তির আলয় হইবে না। তাহা হইলে তদ্দারা ব্যক্তিগত সুখ বিলক্ষণ সংঘটিত হইবে। পাঠক মনে করিবেন না যে, আমরা পাশ্চাত্য ছায়া অবলম্বন করিয়া য়ুরোপীয় রীতিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পোষকতা করিতেছি।—তাহা কখনই নহে। তবে আমাদের কথার বিশেষ অর্থ এই যে, বহু পরিবারের অনেক সময় যে অনর্থ ঘটে উপরি উক্ত আদর্শে একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠিত হইলে সে সমুদায় অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—অথচ তজ্জনিত সুফল অনায়াসে সম্ভোগ করিতে পারা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিশেষ লাভ—ব্যক্তিগত সহানুভূতির অবাধ এবং পর্য্যাপ্ত পরিচালনা। যেখানে এই সহানুভূতির এই অন্তরের আত্মস্থলস্থ—মমতার অভাব সেখানে একান্নবর্ত্তী পরিবারের উদ্দেশ্য নিষ্ফল। অতএব পারিবারিক প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে এই ধারণা সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকা আবশ্যক—এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে এই বৃত্তির পরিচালনা নিতান্তই প্রোয়োজনীয়; এই তত্ত্বটী পারিবারিক প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষার বিষয়। যতদিন না বাঙ্গালীর গৃহে এই শিক্ষার প্রচার হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী পরিবারে উচ্চ লাভের প্রত্যাশা নাই। সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীর এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া বিশেষ আবশ্যকীয় হইয়াছে। জাতীয় চরিত্র এবং সামাজিক উন্নতির মূল ব্যক্তিগত উন্নতি—এই ব্যক্তিগত উন্নতির ভিত্তি আমাদের পক্ষে পারিবারিক রীতিতে সংস্থিত।

অগ্নি-দাহ।

যত প্রকার বিপদ আছে, তন্মধ্যে অগ্নি-দাহ যে একটী প্রধান বিপদ, তাহা কেনা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেন ;—অন্য কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ চেষ্টা করিতে সময় পাওয়া যায় কিন্তু এই বিপদ এরূপ ভয়ানক যে, কাহারও সাহায্য লইবার অবসর লাভ ঘটিয়া উঠে না ; বরং সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতে যে সময় প্রতীক্ষা করিতে হয়, সেই

সময় মধ্যে বিপদ আরও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। এজন্য কাহারও বস্ত্রাদিতে আগুন লাগিলে, সে সময় অন্যের সাহায্য লইবার জন্য ছুটিয়া যাওয়া কিম্বা অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ চেষ্টা করাই সৎ-পরামর্শ। পরিধান বস্ত্রাদিতে আগুন লাগিলে যদি সেখানে কম্বল, সতরঞ্চ এবং লেপ, কাঁথা প্রভৃতি কোন মোটা জিনিষ থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্যে যে-কোন জিনিষ গায়ে জড়াইয়া মাটিতে গড়াইলে আগুন নিবিয়া যায়। ঐ সকলের অভাব হইলে অমনি মাটীতে গড়াইলেও শরীরের চাপে অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে পারে এবং কাহার সাহায্য লইতে হইলে এইরূপ গড়াইতে গড়াইতে চীৎকার করিয়া লোক ডাকা সৎপরামর্শ। পরিধান ধুতি প্রভৃতি হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ছাড়িয়া উলঙ্গ হওয়াই ভাল। জামা প্রভৃতি আঁটা কাপড় হইলে হয় ছিঁড়িয়া না হয় পূর্ব্ববৎরূপে ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়াই বুদ্ধির কাজ। আর নিকটে যদি জল থাকে, তবে তদ্দ্বারা নির্ব্বাণের চেষ্টা পাওয়াও মন্দ নহে।

আগুন এরূপ ভয়ানক বিপদ যে, পোড়ার সময় এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ আগুন ঐ সময় মধ্যেই গুরুতর বিপদ করিয়া তুলে। অসাবধানতা বশতঃই যে অধিকাংশ স্থলে এই বিপদ ঘটিয়া থাকে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই স্বীকার করিবেন। আমরা সরকারী বিজ্ঞাপনীতে দেখিতে পাইয়া থাকি, এদেশে শীতকালে অধিকাংশ শিশু আগুনে পুড়িয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে। অতএব শীতকালে যেমন সর্ব্বদা শিশুদিগের গাত্রবস্ত্র দ্বারা জড়িত থাকে, সেই সঙ্গে গৃহ মধ্যে এরূপ নিয়মে আগুন রাখা উচিত, তদ্দ্বারা যেন কোন প্রকার বিপদ আক্রমণ করিতে না পারে।

সচরাচর দেখা যায়, দুই প্রকার নিয়মে আমাদের শরীর পুড়িয়া থাকে। অর্থাৎ গরম জল, দুগ্ধ প্রভৃতি গরম দ্রব্যের স্পর্শ বা আঁচে এবং আগুন লাগিয়া। এই উভয় প্রকার দাহের মধ্যে আগুনে পোড়াই নিতান্ত সাংঘাতিক। আগুনে পুড়িলেই যে, সকল স্থলে তাহা সাংঘাতিক হয় তাহা মনে করা উচিত নহে। আগুনে পোড়া প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থা

বা প্রথম প্রকারের পোড়া চর্ম্মের উপর অল্পমাত্র আঁচ লাগিয়া উহা লাল হইয়া উঠে, তদ্দারা ফোস্কা হয় না এবং কোন প্রকার বিপদেরও আশঙ্কা থাকে না, সামান্ত জ্বালা হইয়া নিবারিত হইয়া উঠে। দ্বিতীয় অবস্থা বা দ্বিতীয় প্রকার, উহার যন্ত্রণা অধিক হয় এবং দগ্ধ স্থানে ফোস্কা হইয়া উঠে। তৃতীয় অবস্থা বা তৃতীয় প্রকার দগ্ধ স্থান তলতলে হয় এবং ক্রমে ক্রমে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের মাংস উঠিয়া ভয়ানক দৃশ্য উপস্থিত করে, কখন কখন আবার দগ্ধের অল্পক্ষণ পরেও মাংস খসিয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপ পোড়াই ভয়ের বিষয়। যে পোড়াতে ফোস্কা উঠে অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার পোড়াতে যন্ত্রণা অধিক কিন্তু বিপদের আশঙ্কা অল্প। তৃতীয় অবস্থার পোড়া যদিও ভয়ানক কিন্তু শরীরের সকল স্থানে উহা সাংঘাতিক নহে। হস্ত পদাদি পুড়িলে তত ভয়ানক নহে কিন্তু গলা হইতে কোটিদেশ অর্থাৎ কোমর পর্য্যন্ত তৃতীয় প্রকার পোড়া—যার-পর-নাই ভয়ের বিষয়। আবার কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে, অধিক স্থান ব্যাপিয়া পোড়া অপেক্ষা অল্প স্থানে যদি গভীর গর্ত্ত হইয়া দগ্ধ হয়, তবে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার বিষয়।

যে কোন অবস্থায় পোড়ার চিকিৎসা সম্বন্ধে একটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হয়, অর্থাৎ দগ্ধ স্থানে যেন বাতাস লাগিতে না পায়, তাহার উপায় করাই প্রধান চিকিৎসা। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে পোড়ার সুচিকিৎসা হইতে পারে। এস্থলে তাহার স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রথম প্রকারের পোড়া তত ভয়ানক নহে কিন্তু তাই বলিয়া চিকিৎসায় তাচ্ছিল্য করা অকর্ত্তব্য। এজন্য পোড়া স্থানের উপর আস্তে আস্তে ময়দা ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ আবার পিজা তুলাতে ময়দা মাখাইয়া তাহার উপরও দিয়া থাকেন। ফলতঃ যাহাতে ঐ স্থানে বাতাস লাগিতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা করাই উচিত। এই পোড়াতে কোন কোন স্থলে দগ্ধ স্থানের ছাল উঠিয়া যায়, আবার কোন কোন স্থানে আদৌ ছাল উঠে না। অল্পমাত্র লাল হইয়া থাকে। যে কোন পোড়ার অবস্থার জ্বর হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের

পরামর্শানুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য এবং আবশ্যক বুঝিয়া মৃদু বিরেচক জোলাপ দিলে ভাল হয়।

দ্বিতীয় অবস্থার পোড়া যে, অপেক্ষাকৃত কঠিন, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এজন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসায় মন দিতে হয়। দগ্ধ স্থানের উপর বস্ত্রাদি কিছু লাগিয়া থাকিলে অতি সাবধানে তাহা যত শীঘ্র পার তুলিয়া ফেলিবে। উহা এরূপ সাবধানতার সহিত তুলিতে হইবে, ফোস্কা যেন কোন ক্রমে গলিয়া না যায়। কারণ ফোস্কার চামড়া দ্বারা ভিতরের ক্ষত যেরূপ আচ্ছাদিত থাকে, অন্য কোন পদার্থ দ্বারা সেরূপ আচ্ছাদিত হয় না। এজন্য অতি সাবধানে ফোস্কার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। যদি ফোস্কা গালা আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে উহার উপরে ছিদ্রাদি না করিয়া তাহার নিম্নে সূচী কিম্বা সূক্ষ্ম ছুরীর অগ্রভাগ দ্বারা ছিদ্র করিয়া জল বাহির করিলে চলিতে পারে। দগ্ধ স্থানে সমভাগ চূণের জল ও মসিনা তদ্ অভাবে নারিকেল তৈল একত্র ফেণাইয়া, তদ্দারা এক খণ্ড নেকড়া ভিযাইয়া ঐ স্থানে দেওয়া উচিত এবং উহা শুষ্ক হইলে তাহার উপর ঐ তৈল মিশ্রিত জল মধ্যে মধ্যে দেওয়া আবশ্যক। তিন চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত দগ্ধ স্থান শীতল জলে ডুবাইয়া অথবা উহার পটি দিলেও জালা নিবারিত হইয়া থাকে। তিসির খৈলের পুল্টিস্ দ্বারাও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। পরে তাহার উপর শুকা মলম কিম্বা মাখম দিয়া রাখিবে। কারণ ক্ষত শুষ্ক হইতে থাকিলে তাহা অত্যন্ত চড়্‌চড়্ করিতে থাকে।

যে স্থান পুড়িবে তাহা যতদূর বিস্তার করিয়া রাখিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশেষতঃ সন্ধিস্থল মাত্রেই সোজা করিয়া না রাখিলে ক্ষত শুষ্ক হইলে ঐ স্থানের চামড়া সঙ্কুচিত হইয়া জোড়া লাগিয়া কিম্বা বক্রভাবে থাকিয়া যাইবার গুরুতর সম্ভব।

তৃতীয় অবস্থার পোড়া চিকিৎসা প্রায়ই সুচিকিৎসক ভিন্ন শান্তি লাভের উপায় নাই। তবে চিকিৎসক আনায়ন করিতে যে পর্য্যন্ত সময় লাগিবে, সেই সময়টুকু যেন বৃথা নষ্ট না হয়, এজন্য যে সকল নিয়মে চিকিৎসা

করিতে হইবে, এক্ষণে তাহার বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পোড়ার সময় হইতে এক মুহূর্ত্তও বৃথা যেন নষ্ট না হয়, কারণ ঐ সময়ের মধ্যেও প্রভূত অপকার হইতে পারে।

এই ভয়ানক পোড়াতে রোগীকে প্রথমেই চীৎ করাইয়া শয়ন করাইতে হইবে এবং ঘর ও বিছানা গরম রাখিতে হইবে। কারণ উহাতে প্রায়ই কম্প উপস্থিত হইয়া থাকে, এজন্য গরম জল পূর্ণ বোতল রোগীর দেহের নিকট স্থাপন রাখিতে হইবে। গরম জলে তার্পিণ তৈলের ছিটা দিয়া সেই জলে ফ্লানেল কাপড় ভিজাইয়া ফোমেণ্ট করিতে হইবে। অল্প স্থান দগ্ধ হইলে শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিলে চলিতে পারে। কিন্তু উহা অধিক স্থান ব্যাপিয়া হইলে তুলি করিয়া তার্পিণ তৈল পোড়া স্থানে লেপিয়া দেওয়া ভাল। পরে তাহাতে সমভাগ তার্পিণ ও মসিনা তৈল মাখাইতে হইবে। অনন্তর কেবল মাত্র মসিনা তৈল মাখাইয়া তাহার উপর তুলা লাগাইয়া সেইরূপ অবস্থায় তিন চারি দিন রাখিয়া পরে তুলিয়া ফেলিবে। তুলা তুলিলে প্রায়ই ক্ষত শুষ্ক দেখা যাইবে।

দগ্ধ স্থানে যে সকল ঔষধ দিতে হইবে, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই জানিয়া রাখা অতীব আবশ্যক। এই আবশ্যকীয় ঔষধ সমূহের স্থূল স্থূল বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল।

(১) চূণের জল ও মসিনা তৈল ফেণাইয়া দিতে হইবে।

(২) গ্লিসিরিণ পালকে করিয়া দগ্ধ স্থানে দিতে হইবে।

(৩) গোলআলু কুরিয়া তাহার মধ্যস্থ শাঁসের পুল্টিস লাগাইবে।

(৪) দগ্ধ স্থানে ময়দা ছড়াইয়া দিবে।

(৫) দগ্ধ স্থানে গঁদের জল দেওয়া ভাল। উহাতে যদি চড়্‌চড়্ করিতে থাকে, তবে তাহাতে গ্লিসিরিণ দিবে।

(৬) একটা বড় পিয়াজ ও গোলআলু বাটিয়া তাহাতে এক পলা সুইট বা নারিকেল তৈল মিশাইয়া পুরুভাবে প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপের উপর একখানি নেকড়া বাঁধিয়া ক্ষত স্থান ঢাকিয়া রাখিবে।

(৭) ক্ষত স্থানে ছাল উঠিয়া গেলে ভিনিগার ও জল এক সঙ্গে

মিশাইয়া গরম করিয়া লাগাইতে হইবে। উহার অভাবে সমভাগে চূণের জল ও সুইটঅয়েল ফেণাইয়া দিতে পারা যায়। এই সকলের অভাবে তার্পিণ তৈল দিলেও চলিতে পারে।

(৮) শীতল জলে ঘনভাবে সাবান গুলিয়া পাতলা নেকড়ায় উহা মাখাইয়া দগ্ধ স্থানে দিতে পারা যায়। শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার ঐ নেকড়ার উপর সাবান জল দিতে হইবে। আচ্ছাদনের নেকড়া কেন তুলিয়া ফেলা না হয়।

(৯) নারিকেল তৈল ও মোম এক সঙ্গে গলাইয়া যে মলম প্রস্তুত হইবে, ঐ মলম নেকড়ায় মাখাইয়া ক্ষত বা দগ্ধ স্থানে দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে তাহার উপর শীতল জল দ্বারা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

(১০) ফুলখড়ি এবং সুইটঅয়েল অভাবে (জলে) গুলিয়া দগ্ধ স্থানের চারিধারের কতক উপরে পুরুভাবে প্রলেপ দিতে হইবে। ইহা ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারিত হইবে। শুষ্ক না হয় এজন্য সর্ব্বদা উহা দ্বারা ভিজা রাখিতে হইবে এবং রাত্রিকালে একখণ্ড ফ্লানেল দ্বারা উহা জড়াইয়া রাখিলে শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

(১১) দগ্ধ স্থানে ঝোলা গুড় লেপিয়া দিলেও উপকার হইয়া থাকে।

(১২) আঙুল পুড়িলে ফাক ফাক করিয়া রাখিতে হইবে এবং সন্ধিস্থল পুড়িলে বাড় বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক। নতুবা জোড়া লাগিবার বিশেষ সম্ভব।

গরম দ্রব্য দ্বারা গলার ভিতর পুড়িয়া গেলে শীতল জল কিম্বা বরফ সেবন করিলে উপকার হইতে পারে।

যে পোড়াতে চামড়া হইতে হাড় পর্য্যন্ত পুড়িয়া উঠে, সেই পোড়াতে মাথায় রক্ত উঠে এবং পরিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও উপস্থিত হইয়া থাকে। বালকদিগের প্রথমে কম্প উপস্থিত হয়, কম্প অন্তে শরীর শীতল হইয়া সর্ব্বসন্তাপনাশী মৃত্যু উপস্থিত হইয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে।

পোড়াতে ধনুষ্টঙ্কার রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে অবহেলা করা উচিত নহে।

গরম দ্রব্য দ্বারা গলার ভিতর পুড়িয়া গেলে শীতল জল কিম্বা বরফ সেবন করিলে উপকার হইতে পারে।

যে-কোন প্রকারের কঠিন পোড়াতে, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য মৃদু বিরেচক দ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া উচিত।

আগুনে পোড়া যেরূপ ভয়ানক বিপদ পুনঃ পুনঃ তাহা উল্লেখ করিয়া কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। আগুনে পোড়ার পর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা অপেক্ষা যাহাতে এই বিপদ আক্রমণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করাই সুপরামর্শ। বাস্তবিক একটু সতর্ক থাকিলে এই বিপদের হাত হইতে যে, মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা যদিও সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু কোন কোন সময় এই দুর্ঘটনা এরূপ ভয়ানকরূপে উপস্থিত হয় যে, তৎকালে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ভিন্ন বিপদ হইতে মুক্তি লাভের আর কোন প্রকার আশাই থাকে না। সে যাহা হউক এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রত্যেক গৃহস্থেরই যেরূপ পূর্ব্ব-সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, এক্ষণে তদ্‌সম্বন্ধে কতিপয় স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাইয়া থাকি, শীতকাল হইতে আরম্ভ হইয়া গ্রীষ্মকালের মধ্যেই অধিক পরিমাণে অগ্নি-দাহ ঘটিয়া থাকে। এজন্য এই সময় বিশেষরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক। গৃহের অগ্নি ভালরূপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করা উচিত; কেননা অনেক স্থলে এরূপও দেখা গিয়াছে, গৃহস্থগণ ভাল করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ না করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত কিম্বা শয়ন করিয়াছেন, পরে সেই নির্ব্বাণ-প্রায় অগ্নি হইতে সামান্য স্ফুলিঙ্গ ধিকি ধিকি প্রজ্জ্বলিত হইয়া বিস্তর অনর্থ ঘটাইয়া তুলিয়াছে। আগুনের নিকট বস্ত্রাদি রাখার দোষেও অনেক সময় তাহাতে আগুন লাগিয়া গৃহাদি দগ্ধ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বিছানায় মশারি খাটাইয়া তন্মধ্যে প্রদীপ রাখিয়া লিখন পঠন করাতেও এই বিপদ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। রাত্রিকালে বিছানার নিকট কখনই প্রদীপ রাখা উচিত নহে, কারণ অনেক সময় এরূপও দেখা যায় যে, বাতাসে মশারি

প্রভৃতি প্রদীপের উপর উড়িয়া পড়াতেও ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া উঠে। রাত্রিকালে আলনার নিকট অথবা বস্ত্রাদির বাক্স খুলিবার সময় প্রদীপ প্রভৃতির আগুনেও কখন কখন নানাপ্রকার বিপদ হইতে দেখা যায়। বাতি, গ্যাস প্রভৃতি ধরাইবার সময় কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে যে, কাগজ অথবা অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা ঐ সকল জ্বালিয়া পরে সেই আগুন ছুড়িয়া ফেলাতে অন্য পদার্থে তাহা ধরিয়া শেষে ভয়ানক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। তামাক খাওয়ার পর আগুণ সমেত কলিকা রাখার দোষেও বিপদ ঘটিয়া থাকে। কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে যে, উনানের উপর কাষ্ঠাদি উতা অর্থাৎ শুকাইতে দিয়া সকলে নিশ্চিন্ত থাকে, পরে কোন প্রকার ঘটনা বশতঃ ঐ কাষ্ঠে আগুণ লাগিয়া অবশেষে গৃহাদি দগ্ধ হইয়া গৃহস্থগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন, কেবল যে, তাঁহাদিগেরই সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, এরূপও নহে, সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া অবশেষে প্রতিবেশীগণেরও যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইয়া যায়। শীতবস্ত্র এবং পোশাকাদি পরিধান করিয়া আগুণের নিকট অতি সাবধানে যাতায়াত করা উচিত। বালক বালিকাদিগকে দেসালাই কিম্বা অন্য কোন আগুণের জিনিষ লইয়া ক্রীড়া করিতে দেওয়া সর্ব্বতোভাবে অন্যায়; বাজী পুড়াইবার দোষেও বিস্তর বিপদ ঘটিয়া থাকে।

অগ্নির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য অর্থাৎ গৃহ ও অট্টালিকাদিতে আগুণ লাগিলে অনেক সময় দেখা যায়, সামান্য এক একটী দ্রব্যের অভাবে শেষে ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য প্রত্যেক গৃহস্থ ঘরে এক একখানি মই রাখা আবশ্যক। যাঁহারা অট্টালিকায় বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের শয়ন গৃহে আধ ইঞ্চি কিম্বা সিকি ইঞ্চি মোটা এক একফুট অন্তর অন্তর এক একটী গাঁইট থাকে, এরূপ এক এক গাছি দড়ী দ্বিতল কিম্বা ত্রিতল গৃহের গরাদেই বাঁধিয়া রাখা উচিত। হটাৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিম্নে নামিয়া আসিবার অসুবিধা হইলে উক্ত দড়ী অবলম্বন করিয়া নামিলে অগ্নি-দাহের বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা হইলে

একে একে বাঁধিয়া নামাইয়া দিতে পারা যায়। দড়ীর অভাবে গৃহস্থিত বস্ত্রাদি সংযোগেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। যে স্থলে সে সুবিধাও ঘটিয়া উঠে না, তথায় উপর হইতে লম্ফ দিয়া পড়াই ব্যবস্থা। কিন্তু লাফ দিয়া পড়াতে একটী বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে গিয়া আর একটী বিপদের ক্রোড়ে আশ্রয় লওয়া হয়। অর্থাৎ অধিক উচ্চ হইতে পতিত হইলে হস্ত পদাদি ভাঙ্গিয়া এমন কি জীবন পর্য্যন্তও নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। এজন্য প্রথমে লাফ দিয়া না পড়িয়া গৃহস্থিত লেপ, তোসক প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য থাকে, তাহা গৃহের নিম্নে ফেলিয়া দিয়া গরাদে প্রভৃতি আশ্রয় অবলম্বন করতঃ সরলভাবে ঝুলিতে হইবে, অবশেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্ব পাতিত লেপের উপর পড়িলে ততটা বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

অগ্নি-দাহ উপস্থিত হইলে চঞ্চল না হইয়া স্থিরভাবে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় করাই গুরুতর কর্ত্তব্য। কারণ আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, ঐরূপ ব্যস্ততা জন্য বিপদ আরও ভয়ঙ্কররূপে উপস্থিত হইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া তুলিতে ত্রুটি করে না। অগ্নিদাহকালে যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় অর্থাৎ অগ্নি নির্ব্বাণ ও জীবন রক্ষা সম্বন্ধে যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, সেই সকল বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

অট্টালিকাদিতে আগুণ লাগিলে দরোজা ও জানালা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক; কারণ বাহিরের বাতাস গৃহে প্রবেশ করিলে অগ্নি আরও প্রবল হইয়া উঠে। অতএব বায়ু প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া অগ্নি নির্ব্বাণের উপায় করা উচিত। পর্দা ও মশারিতে আগুণ লাগিলে একখানি কম্বল অথবা মোটা ভারি গোছের কাপড় দ্বারা বারম্বার আঘাত করিলে আগুণ নির্ব্বাণ হইয়া আসিবে। আর যদি সময় থাকে, তবে কম্বল ও কাঁথা প্রভৃতি ভিজাইয়া তাহার উপর ফেলিয়া দিলেও চলিতে পারে। নীচের সিঁড়িতে আগুণ প্রবল হইয়া দাঁড়াইলে সত্বর ছাদে উঠিয়া মই লাগাইয়া নামিতে হইবে। যদি একান্তই আগুণ

লাগা সিঁড়ির পথ ভিন্ন নামিয়া আসিবার কোন উপায় না থাকে, তবে যত শীঘ্র পারা যায়, হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া আসিতে হইবে। হামাগুড়ি দেওয়ার কারণ এই যে, তৎকালে গৃহমধ্যে এত ধূম সঞ্চিত হয় যে, তদ্দারা শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু ঘরের মেজেতে যে বায়ু সঞ্চার থাকে, তদ্দারা কোন অপকার ঘটে না। আর ঐ সময় কম্বল সতরঞ্চ এই সকলের অভাবে ময়লা কাপড় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া অতি সতর্কভাবে বাহির হইয়া আসিবার উপায় করা উচিত, সুবিধা হইলে উহা ভিজাইয়া লইতে পারিলে আরও ভাল হয়। আগুণ নির্ব্বাণ করার দোষেও যে, অনেক সময় এই বিপদ ঘটিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কখন কখন এরূপ ঘটনাও হইয়াছে যে, গৃহস্থগণ আগুণ নির্ব্বাণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে দুই একখানি অঙ্গারের এক মুখে সামান্য আগুণ থাকে এবং অপর মুখ শীতল হইয়া যায়, বিড়াল কিম্বা ইঁদুরে সেই ঠাণ্ডামুখ কামড়াইয়া লইয়া গিয়া অন্য পদার্থের উপর রাখিয়াও এই সর্ব্বনাশ করিয়া তুলে।

কখন কখন দেখা যায় রন্ধন-শালায় তৈলাদি জ্বলিয়া অনর্থ ঘটিয়া থাকে। তৈল জ্বলিয়া উঠিলে তাহার উপর কলাপাতা প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া ভাল। হটাৎ যদি সেই পাত্রটী নামাইয়া ফেলা যায় তাহাও উত্তম। মাটীর হাঁড়ি হইলে কোন দ্রব্য দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলাও সৎপরামর্শ। পল্লী মধ্যে আগুণ লাগিলে প্রথমেই কর্ত্তব্য গ্রামের সমুদায় লোক একত্রিত হইয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করা; কিন্তু যখন তাহা নির্ব্বাণের আশা না থাকে, তখন স্ব স্ব গৃহস্থিত দ্রব্যাদি বাহির করিতে হইবে; গো, অশ্ব প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশু ও বৃদ্ধ স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া অগ্নির আক্রমণ নিবারণ জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যে সময় গ্রাম মধ্যে অগ্নি-ভয় উপস্থিত হইবে, সেই সময় প্রত্যেক গৃহে অর্থাৎ চালের উপর জল-পূর্ণ কলসী সাজাইয়া রাখা আবশ্যক। অগ্নি-দাহকালে নিতান্ত বিচলিত না হইয়া স্থিরভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করা যে উচিত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

কারণ যে পরিমাণে চঞ্চল হইয়া সময় নষ্ট করা যায়, সেই পরিমাণে ক্ষতি-গ্রস্থ হইতে হয়।

যে কোন কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে হইলে সুব্যবস্থা করা উচিত। সুব্যবস্থা গুণে অল্প সময়ে এবং অল্প লোক দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, বিশৃঙ্খলভাবে অধিক সময় ব্যাপিয়া বহু সংখ্যক লোক দ্বারা তাহা নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না। এজন্য অগ্নি-দাহ উপস্থিত হইলেই কতক লোক গৃহস্থিত বালক বালিকা, পীড়িত ও বৃদ্ধগণ এবং দ্রব্যাদি বাহির করিবার ব্যবস্থা করিবেন। অপর সকলে অগ্নি নির্ব্বাণ জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা দেখিবেন। গৃহাদিতে আগুন লাগিলে নিকটে যে জলাশয় থাকে, তাহা হইতে জল আনিয়া নির্ব্বাণ করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। বিলম্বে বিলম্বে জল ঢালিলে যে, আগুন নির্ব্বাণ করা যায় না, তাহা সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য, এজন্য এবিষয়ে একটী নিয়ম জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি জল আনিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা যেন অগ্নি-দাহ স্থান হইতে জলাশয় পর্য্যন্ত শ্রেণী বদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পরের হাতে হাতে জল আনিয়া আগুণের উপর ঢালিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ নিয়মে জল ঢালিলে ক্রমাগত জলধারা পতিত হওয়াতে উহা নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে।

যে গৃহে অগ্নি-দাহ উপস্থিত হয়, তাহার নিকটবর্ত্তী গৃহাদিতে যাহাতে উহা লাগিতে না পারে, তজ্জন্য ঐ সকল গৃহের উপর জল লইয়া প্রস্তুত থাকা আবশ্যক অর্থাৎ যখন যে স্থানে আগুণ পড়িবে, তৎক্ষণাৎ যেন তাহা নির্ব্বাণ করা হয়। আগুণ নিবারণ অসাধ্য বোধ হইলে দগ্ধ গৃহ কাটিয়া ভূমিসাৎ করা ভাল। কারণ আগুণ নীচে পতিত হইলে উহা আর অধিক দূরে সঞ্চারিত হইতে পারে না। অনেক সময় এরূপও দেখা গিয়াছে, দগ্ধ গৃহের অগ্নি ভাল রকম করিয়া নির্ব্বাণ না করিয়া গৃহস্থগণ নিশ্চিন্ত হয়েন, অনন্তর তাহা হইতে অগ্নি সঞ্চারিত হইয়া আবার মহা অনর্থ ঘটাইয়া তুলে। রন্ধনাদি কালে গৃহে আগুণ লাগিলে অনেক রমণী-গণ মনে করিয়া থাকেন, সামান্যমাত্র জল দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করিতে

পারিবেন, এই আশ্বাসে তাঁহারা লোক ডাকিয়া গোল না করিয়া নিজেই উহা নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন কিন্তু সে সামান্য চেষ্টার কোন ফল না হইয়া বরং বিপদ আরও প্রবল হইয়া উঠে। এজন্য প্রথম হইতেই লোকজন ডাকিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত উহা নির্ব্বাণের চেষ্টা পাওয়া উচিত। বিপদ প্রবল আকার ধারণ করিতে না পায়, তাহার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

গৃহ-পালিত গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুগণ যাহাতে অগ্নি-দাহ হইতে রক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা করা অতীব কর্ত্তব্য, তাহা যেন প্রত্যেক গৃহস্থেরই মনে রাখা উচিত। কোন কোন সময় এরূপও দেখা যায়, গৃহাদি দাহ-কালে গর্ব্বাদির বন্ধন রজ্জু কাটিয়া দিলে তাহারা বাহিরে আসিয়া আবার প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ করিয়া জীবন হারাইয়া থাকে, এজন্য তাহাদিগকে দূরে তাড়াইয়া দেওয়াই সুব্যবস্থা। অশ্বের একটী মহৎ দোষ অগ্নি-দাহ কালে তাহারা প্রায়ই বাহিরে আইসে না। হাজার টানাটানি করুন না কেন, কিছুতেই নড়িতে চাহে না, এজন্য তাহাদিগের গলদেশে হাল পরাইয়া তাহা ধরিয়া টানিলে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিয়া থাকে। অগ্নি-দাহ কালে প্রজ্বলিত গৃহ হইতে অশ্ব বাহির করিবার পক্ষে ইহা একটী অতি সুন্দর কৌশল।

প্রতি বৎসর বাজী পুড়াইতেও বিস্তর বালকাদির বিপদ ঘটিয়া থাকে। অতএব বারুদ হইতে অতি সাবধানে থাকা যে, কতদূর উচিত, তাহা প্রত্যেকই বুঝিতে পারিতেছেন। যে গৃহে বারুদ থাকে, তথায় অগ্নি লইয়া যাওয়া যে, একটী বিপদকে আহ্বান করা—তাহা যেন সকলেরই স্মরণ থাকে। আজকাল বারুদের ন্যায় আর একটী বিপদের দ্রব্য গৃহস্থ গৃহে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ বিপদ-জনক দ্রব্য ক্যারোসিন অয়েল। ক্যারোসিন তৈল যার-পর-নাই দাহ্য পদার্থ; সামান্যমাত্র অগ্নি-স্পর্শে উহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। প্রজ্বলিত তৈলে জল ঢালিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারা যায় না। এজন্য অতি সতর্কতার সহিত উহা ব্যবহার করিতে হয়। যে স্থানে অগ্নির

কোন সংস্পর্শ থাকে না, এরূপ স্থানে উহা রাখাই উচিত। ফলতঃ যে কোন প্রকারেই হউক অগ্নির হাত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে হইলে সাবধানতাই যে, তাহার একমাত্র অব্যর্থ উপায় তাহা যেন প্রত্যেক গৃহস্থ-দিগেরই মনে থাকে।

আসন্ন প্রসবার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য।

প্রায় অধিকাংশ গর্ভবতীকে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রসব কাল উপস্থিত হইলেই মহা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এই আশঙ্কার কারণ নিজের জীবন রক্ষা এবং ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনা। যাঁহারা দুই তিনবার প্রসব করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এইরূপ বড় আশঙ্কা থাকে না; কিন্তু প্রথম বার যাঁহারা গর্ভ-ধারণ করেন, তাঁহাদিগেরই মধ্যে ঐরূপ ভয়ের কারণ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। বহুদর্শন দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, কোন গর্ভবতীকেই ঐরূপ অলীক আশা প্রকাশ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। গর্ভে সন্তানের প্রজনন, বর্দ্ধন এবং নির্ব্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হওন সম্বন্ধে জগদীশ্বর যে, অনির্ব্বচনীয় ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা গর্ভবতী অনায়াসেই প্রসব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ফলতঃ এ সম্বন্ধে কোন প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ না করাই সৎপরামর্শ। প্রকৃতির কেমন চমৎকার নিয়ম যে, সন্তান গর্ভে স্বচ্ছন্দে সুরক্ষিত হইয়া প্রসূত হইয়া থাকে। অতএব স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া সাহস অবলম্বনপূর্ব্বক প্রসবের জন্য প্রতীক্ষা করাই প্রত্যেক গর্ভবতীর পক্ষেই প্রধান কর্ত্তব্য।

প্রসবকালে সকল গর্ভবতীকে এক প্রকার নিয়মে যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না; এমনও দেখা গিয়াছে একই গর্ভবতী ভিন্ন ভিন্ন বার প্রসব কালে ভিন্ন ভিন্ন রকম কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। ফলতঃ যত প্রকার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হউক না কেন, তাহাতে ভীত হওয়া উচিত নহে। তবে যে যে স্থলে অস্বাভাবিক প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই যন্ত্রণার তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন আসন্ন-প্রসবার উদর কিছু নামিয়া পড়ে। উদর নামিয়া পড়িবার নিয়ম ঠিক একরূপ নহে, কারণ কাহার কাহার প্রসবের কয়েক দিন পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে উহা নীচের দিকে নামিয়া আইসে। গর্ভিণী তাহা আদৌ অনুভব করিতে পারেন না, কাহার কাহার হটাৎ এক রাত্রির মধ্যে, আবার কাহার কাহার প্রসবের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও উদর নামিয়া পড়িতে দেখা যায়। এ কার্য্য দ্বারা স্থল বিশেষে গর্ভিণীর সুবিধা এবং কোন কোন স্থলে অসুবিধাও ঘটিয়া থাকে; যে যে স্থলে উদর উপরে বর্দ্ধিত থাকায় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং পাকস্থলীতে চাপ পড়াতে আহারে অনিচ্ছা দেখা যায়, উহা নিম্নে ঝুলিয়া পড়াতে সে কষ্টের হাত হইতে গর্ভিণী পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু কখন কখন আবার ইহাও দেখা যায়, উদর নিম্নে নামিয়া পড়ায় মূত্রাশয় এবং অন্ত্রাদিতে চাপ পড়াতে প্রস্রাবত্যাগে কষ্ট ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে ব্যাঘাত করিয়া তুলে। এজন্য কোন কোন আসন্ন-প্রসবাকে ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসবের পূর্ব্বে যদিও গর্ভিণীর নানাপ্রকার শারিরীক কার্য্যের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে থাকে, কিন্তু তিনি প্রায় তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন না।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত প্রসব-বেদনা ভিন্ন এক প্রকার কৃত্রিম বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐরূপ কৃত্রিম বেদনা উপস্থিত হইবার যদিও নানাপ্রকার কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে সর্ব্বদা এই গুলিই প্রধান কারণ মনে রাখিতে হয়, অর্থাৎ পেটফাঁপা, উদরাময়, দেহের দুর্ব্বলতা এবং মানসিক দুর্ভাবনা। এই সকল কারণে প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে সুচিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া তাহা নিবারণ চেষ্টা করাই সুপরামর্শ। অনেক স্থলে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল রমণীগণ অনেকবার প্রসব করিয়াছেন, তাঁহারা পর্য্যন্তও স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বেদনা অনুভব করিতে পারেন না। যে বেদনায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না, সেইরূপ বেদনাকে কৃত্রিম বেদনা কহে। অর্থাৎ প্রসব বেদনা উপস্থিত হইবার দশ পোনর দিবস পূর্ব্বে কখন কখন পৃষ্ঠে ও অন্ত্র হইতে

যে এক প্রকার বেদনা উপস্থিত হইয়া কোটি ও উরুদেশে নামিয়া থাকে, এবং কখন কখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল বলিয়া বোধ হইয়া উঠে, এইরূপ বেদনা কৃত্রিম বেদনার মধ্যেই গণ্য করা হইয়া থাকে। অজ্ঞ লোকে কৃত্রিম বেদনার লক্ষণ ও ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে প্রকৃত বেদনা মধ্যেই গণ্য করে। আমরা অনেক সময় শুনিয়া থাকি, কোন কোন গর্ভবতী দশ পোনর দিন ধরিয়া প্রসব বেদনা ভোগ করিতেছেন। বাস্তবিক প্রকৃত প্রসব বেদনা এত দিন ধরিয়া কষ্ট দেয় না। তবে কৃত্রিম বেদনা উপস্থিত হইয়া যখন প্রকৃত বেদনার সহিত যোগ দিয়া থাকে, তখনই ঐরূপ ভ্রম জন্মাইয়া দেয়। ফলকথা গর্ভিণীর যে কোন বেদনা উপস্থিত হউক না কেন, সর্ব্বদা সুচিকিৎসক কিম্বা বহুদর্শিণী বিচক্ষণা গৃহিণীর উপদেশানুসারে কার্য্য করা উচিত।

প্রসবকালে যে সকল দ্রব্য আবশ্যক করে, আসন্ন প্রসবার জন্য তৎসমুদায় সংগ্রহ করিয়া রাখা অতীব আবশ্যক। কারণ পূর্ব্বে ঐ সকল সংগৃহীত না থাকিলে প্রসবকালে তজ্জন্য বিব্রত হইতে হয়, কেবল মাত্র যে, বিব্রত হইতে হয়, তাহাও নহে, তজ্জন্য সময় সময় নানা প্রকার অপকারও সাধিত হইয়া থাকে। এজন্য তৎপক্ষে বিহিতবিধানে সতর্ক হওয়া বুদ্ধিমান গৃহস্থের যে একটী গুরুতর কর্ত্তব্য তাহা যেন সকলের মনে থাকে।

প্রসবকালে ধাত্রীর সাহায্য সম্পূর্ণ আবশ্যক হইয়া উঠে, এজন্য যে গৃহে আসন্ন প্রসবা বর্ত্তমান, সেই গৃহে প্রসবের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই ধাত্রীকে স্বগৃহে বাস করাইতে পারিলে ভাল হয়। কারণ অনেক সময় এরূপও দেখা গিয়াছে যে, হটাৎ গভীর রাত্রে প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, অথবা সে সময় বৃষ্টি ও ঝটিকা প্রভৃতি দুর্য্যোগ বশতঃ গৃহের বাহির হওয়া অত্যন্ত কষ্ট-কর হইয়া উঠিয়াছে, কিম্বা ধাত্রী কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছে এবং গর্ভিণীর বাড়ীতে এমন কেহ বিচক্ষণা স্ত্রীলোক নাই যে, তাঁহা দ্বারা সাহায্য লইতে পারা যায়। এই সকল কারণ বশতঃ ধাত্রীকে নিজ গৃহে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। অভাব পক্ষে ধাত্রী যেখানে বাস করে, বাড়ীর কিম্বা প্রতিবেশী

আত্মীয়কে তাহার গৃহ দেখাইয়া রাখা উচিত। অর্থাৎ প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই যেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া আনিতে পারে।

ধাত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে গৃহস্থগণকে একটু মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রসব কার্য্যে যাহাদিগের পারদর্শিতা থাকে, সেইরূপ ধাত্রী দ্বারা প্রসব করান যে কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। কারণ অনেক সময় ধাত্রীর দোষেও বিস্তর অনর্থ ঘটিয়া থাকে। প্রসবকালে ধাত্রীর উপরই যে, প্রসূতির শুভাশুভ নির্ভর করে, তাহা সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক।

রাতকাণা এবং বধির (কালা) স্ত্রীলোককে ধাত্রী কার্য্যে কখনই নিযুক্ত করা উচিত নহে। প্রসব-কার্য্যে অশক্ত, দুর্ব্বলা কিম্বা বৃদ্ধা ধাত্রী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। স্নেহশীলা ধাত্রী নিযুক্ত করাই উচিত। যে ধাত্রীর সন্তানাদি হইয়াছে এরূপ ধাত্রী প্রসব বেদনা এবং প্রসূতীর অবস্থা বিশেষরূপ বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রসবকালে প্রসূতিকে নানা প্রকার সান্ত্বনা দ্বারাও প্রবোধ দিতে হয়। এই জন্যই আর্য্য-শাস্ত্রবেত্তা ঋষিগণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যে স্ত্রীলোক স্বজাতীয়া, কুলীনা, সদ্বংশজাতা, মধ্যম বয়স্কা, সাধুশীলা, শুদ্ধ দুগ্ধা, বহুক্ষীরা, সবৎসা, স্বাধীনা ও নির্লোভনীয়া এবং যাহার অন্তঃকরণে বাৎসল্য ভাবের আধিক্য আছে, যে রমণী প্রবঞ্চক নহে এবং যে বালককে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকে, সেইরূপ ধাত্রীই সম্পূর্ণ প্রশস্ত। (১)

ধাত্রী ভিন্ন প্রসবকালে সাহায্যের জন্য আত্মীয় স্ত্রীলোকের আনু-

(১) পিতাথ যদি বালস্য বিদধ্যাদুপমাতরম্।
সুবিচার্য্য গুণান্দোষান্কুর্য্যাদ্ধাত্রীংতদেদৃশীম্॥
সবর্ণাং মধ্যবয়সাং সচ্ছীলাংমুদিতাংসদা।
শুদ্ধদুগ্ধাম্বহুক্ষীরাং সবৎসামতিবৎসলাম্॥
স্বাধীনামন্নসন্তুষ্টাং কুলীনাং সজ্জনাত্মজাম্।
কৈতবেন পরিত্যাক্তাং নিজপুত্রসদৃশাং শিশৌ॥
ইতি ভাবপ্রকাশঃ

কূল্য প্রয়োজন হইয়া থাকে, এজন্য পূর্ব্বেই তাহা স্থির করিয়া রাখা উচিত। প্রসূতির কষ্ট দেখিলে যাঁহারা বিহ্বল হইয়া উঠেন, এরূপ স্ত্রীলোককে সূতিকা গৃহে যাইতে না দেওয়াই সুপরামর্শ। কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে, মাতা কন্যার সাহায্যার্থে সূতিকাগারে গমন করিয়া পরিশেষে কন্যার কষ্ট দর্শনে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহাকে অধৈর্য্য দেখিয়া কন্যাও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ স্থলে নিকট সম্পর্কীয় কার্য্য-কুশলা স্ত্রীলোক নির্ব্বাচন করাই কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে বর্ণিত আছে, "প্রসবকার্য্যে কুশলা চারিটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নখ ছেদনপূর্ব্বক আসন্ন প্রসবার পরিচর্য্যা করিবে, তাহা হইলে প্রসবের কোন আশঙ্কা থাকেনা।"

সহজ কথায় এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, প্রসবকালে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন এবং যে সকল লোকের সাহায্য আবশ্যক হইয়া থাকে, তৎসমুদায় ঠিক সেই সময়ের ব্যাবহারোপযোগী সংগৃহীত না হইলে গুরুতর ক্ষতি হইবার সম্ভব। যাহাতে সামান্য ক্রটি বশতঃ প্রভূত অনিষ্টের সম্ভব, তাহাতে উদাসীন থাকা প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে যে, একটী মহাপাপ তাহা বোধ হয় কাহাকেও বিশেষ করিয়া যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে হয় না। প্রসব কার্য্য এক পক্ষে যত সহজ মনে করা যায়, অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রসবে যেমন কোন প্রকার আশঙ্কা থাকে না তেমনই অনেক স্থানে আবার নানা প্রত্যক্ষ ও অলক্ষ্য কারণে উহা যার-পর-নাই গুরুতর ভয়ানক ব্যাপার মনে করিতে হয়। এজন্য বিজ্ঞ চিকিৎসক-দিগের পরামর্শানুসারে যতদূর সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারা যায়, তাহাতে মনোযোগী থাকা অতীব আবশ্যক।

আসন্ন প্রসবা যে কোন্ সময় প্রসব করিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, এজন্য যতদিন সুচারুরূপে প্রসব কার্য্য শেষ না হয়, ততদিন গৃহস্থগণকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অনেক স্থলে আমরা দেখি-য়াছি, এই সতর্কতার ক্রটি বশতঃ বিস্তর অপকার সাধিত হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে সাবধান থাকাই একমাত্র সুপরামর্শ।

প্রকৃত প্রসব বেদনা বুঝিতে না পারিয়া অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, অজ্ঞ গৃহস্থগণ গর্ভিণীকে সূতিকা গৃহে লইয়া গিয়া প্রসবের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। অসময়ে এইরূপ চেষ্টা করায় পরিশেষে যে তদ্দ্বারা বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার বিস্তর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য আমাদের বিশেষ অনুরোধ প্রত্যেক গৃহস্থেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক—প্রকৃত কিম্বা কৃত্রিম প্রসব বেদনা কাহাকে বলে। কৃত্রিম বেদনায় বাস্তবিক গর্ভিণীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া থাকে। এই যন্ত্রণা নিবারণ জন্য সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কৃত্রিম বেদনা উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে স্থিরভাবে শয়ন করিতে দেওয়া উচিত এবং সেই সময় মৃদু বিরেচক কোন প্রকার জোলাপ দিলে বেদনা নিবারিত হইতে পারে। কারণ অনেক স্থলে কোষ্ঠ বদ্ধতা দোষেও কৃত্রিম বেদনা উপস্থিত হইতে দেখা যায়; পূর্ব্বে কৃত্রিম বেদনা সম্বন্ধে যে সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন গর্ভে সন্তান নড়া চড়াতেও উহা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রকৃত বেদনায় গর্ভিণীর সন্তান নির্গম-পথে অর্থাৎ গর্ভাশয়ের মুখ বিস্তারিত হইতে দেখা যায় এবং প্রসব দ্বার দিয়া এক প্রকার ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে। আর বেদনা প্রায় সমান অন্তর অন্তর উপস্থিত হয়। বেদনা উপস্থিত হইলে যেমন ক্লেশ বোধ হইয়া থাকে, তাহার বিরামে সেইরূপ আবার কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না।

কোন কোন আসন্ন প্রসবার উদর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়া থাকে। যখন দেখা যাইবে যে, উহা ঝুলিয়া পড়াতে গর্ভিণীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, তখন এক খণ্ড পরিষ্কৃত বস্ত্র দ্বারা শিথিলভাবে উহা বাঁধিয়া দিলে অনেক উপশম হইয়া থাকে।

আসন্ন প্রসবার পক্ষে যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, তৎসমুদায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই জানিয়া রাখা অতীব আবশ্যক। ঐ সকল ভিন্ন আর যাহা যাহা সংগ্রহ করা আবশ্যক, সূতিকার গৃহের উপদেশ সম্বন্ধে সেই সকলের উল্লেখ করা যাইবে।

বিষ প্রয়োগে গোজাতির জীবন নষ্ট।

অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, গবাদি পশু বিষ খাইয়া অকালে প্রাণ হারাইয়া থাকে। গো-জাতি আপনা হইতেও উহা খাইয়া থাকে, কখন কখন নিষ্ঠুর চর্ম্ম-ব্যবসায়ী মুচিদিগের দ্বারাও এই কার্য্য সাধিত হয়। চর্ম্ম বিক্রয় দ্বারা লাভের বিলক্ষণ আশা থাকে। সেই আশায় উক্ত ব্যবসায়ীগণ এই জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অনেক দিন হইতে এদেশে একটী রীতি আছে, মৃত গবাদি পশু ভাগাড়ে ফেলিয়া দিলে মুচিরা সেই মৃত পশুর চর্ম্ম তুলিয়া লয় এবং চর্ম্ম ব্যবসায়ীদিগের নিকট তাহা বিক্রয় করে। কোন কোন স্থানে আবার জমীদারদিগের সহিত মুচিদিগের মৃত পশুর চর্ম্ম দেওয়ার জন্য বৎসর বৎসর নির্দ্দিষ্ট কর দিবারও বন্দোবস্ত আছে। এতদ্ভিন্ন মুচিরা চর্ম্ম ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে এরূপ এগ্রিমেণ্ট লইয়া থাকে যে, কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহারা এত সংখ্যক চর্ম্ম প্রদান করিবে এবং তজ্জন্য অগ্রে দাদনও লইয়া থাকে। সুতরাং প্রয়োজন মত চর্ম্ম সংগ্রহ না হইলে তাহারা বিষ প্রয়োগ দ্বারা গো-জাতির জীবন নষ্ট করিয়া থাকে এবং মৃত পশুর চর্ম্ম লইয়া লাভবান হয়। এই ঘৃণিত নিষ্ঠুর ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা প্রতি বৎসর বিস্তর পশুর জীবন নষ্ট হইতে দেখা যায়।

সকল স্থলেই যে, এই কারণে পশুর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে তাহাও নহে, অনেক স্থলে আবার দেখা যায়, পশুগণ আপন হইতেও বিষাক্ত ঘাস ও গাছ গাছড়া খাইয়াও মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই দুই প্রকার বিষে গবাদি পশুর জীবন নষ্ট হয়। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের বিষ উদ্ভিদ্ জাতীয় গাছ গাছড়া, দ্বিতীয় জাতীয় বিষ ধাতু ঘটিত।

বিষ প্রয়োগের রীতি।—প্রথম রীতি, খানিক বিষ অর্থাৎ যে পরিমাণ বিষে পশুর মৃত্যু ঘটিতে পারে, সেই পরিমাণ বিষ লইয়া ময়দা অথবা ঘৃতের সহিত মিশাইয়া কলাপাতা কিম্বা পশুদিগের খাদ্য অন্য কোন প্রকার পাতায় মাখাইয়া পশুদিগের মুখের মধ্যে দেয়। যেখানে এইরূপে বিষ

প্রয়োগ অসুবিধা ঘটিয়া উঠে, সেই স্থলে উক্ত বিষাক্ত পত্র গবাদির চরিবার স্থানে ফেলিয়া দেয়, নিরীহ পশুগণ জানে না যে, তাহাদিগের মৃত্যু সম্মুখে বর্ত্তমান, সুতরাং তাহারা স্বচ্ছন্দে তাহা ভক্ষণ করিয়া অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

দ্বিতীয় রীতি।—যে স্থানে ভাল রকম ঘাসাদি খাদ্য থাকে, অর্থাৎ পশুরা সর্ব্বদা চরিয়া বেড়ায়, সেইখানে সেই ঘাসাদির উপর বিষ ছড়াইয়া রাখে, পশুরা তথায় চরিতে গিয়া মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করে।

তৃতীয় রীতি।—কোন প্রকার তীক্ষ্ণ-ধার অর্থাৎ ধারাল অস্ত্রে বিষ মাখাইয়া সেই অস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা গবাদির চর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া রক্তে যোগ করিয়া দেয়, অথবা মল কিম্বা জরায়ু দ্বারে প্রবিষ্ট করিয়া থাকে।

বিষ।—পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, পশুদিগের জীবন নষ্ট করিতে যে সকল বিষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই সকল প্রায় সেঁকো কিম্বা হরিতালে প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই দুই দ্রব্যের মধ্যে সেঁকো বিষের পরিমাণই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন কাটবিষ, ধুতুরা, মাদার এবং কুঁচিলা প্রভৃতি বাছড়া বিষও ব্যবহার হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন, চর্ম্ম ব্যবসায়ীগণ মুচিদিগকে ঐ সকল বিষ প্রদান করিয়া এই নির্দ্দয়াচরণের সহায়তা করে।

যে সময়ে দেশ মধ্যে পশ্বাদির মহামারী অর্থাৎ মড়ক উপস্থিত হয়, সেই সময় এই দুর্ঘটনা অধিক ঘটিয়া থাকে। আবার এরূপ দেখা যায়, দেশ মধ্যে বসন্ত রোগ প্রবল হইয়া পশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, সেই সময় উক্ত রোগে মৃত পশুদিগের পাকস্থলী ও আঁতের মধ্য-গত দূষিত বিষাক্ত দ্রব্য লইয়াও পশুদিগের চরানী ভূমিতে ছড়াইয়া দিয়া আইসে। বসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক অর্থাৎ ছোঁয়াচে রোগ, সুতরাং বসন্তের বীজ পশুদিগের শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জীবন শেষ করিয়া তুলে।

অনেক স্থলে আবার দেখিতে পাওয়া যায়। বৃষ্টির অভাবে পশুদিগের খাদ্য তৃণ পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে, তখন অবোধ পশুগণ উদরের জ্বালায় নানা প্রকার বিষাক্ত গাছ গাছড়া আহার করিয়াও মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন

করিয়া থাকে। ভেরেণ্ডা গাছ ও বীজ আহার করিয়াও গবাদির মৃত্যু হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—বিষ খাইলে গবাদির প্রায় কয়েকটী লক্ষণ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। সেই সকল লক্ষণ প্রত্যেক গৃহস্থেরই জানিয়া রাখা গুরুতর কর্ত্তব্য। কারণ ঐরূপ লক্ষণ দেখিলেই তাহার প্রতীকারের উপায় করিতে পারা যায়।

বিষ খাইলে পশুর হঠাৎ পীড়া হয়; কাঁপিতে থাকে, তলপেটে অত্যন্ত বেদনা হয়; এই বেদনা জন্য দেখা যায়, পশু পা ও শিং দিয়া পেটে গুতা মারিতে থাকে, বারম্বার পাঁজরের দিকে তাকায়, মুখ হইতে ফেণা ভাঙে, অত্যন্ত পিপাসা বৃদ্ধি হয়, ধনুষ্টঙ্কারের মত সর্ব্বদাই খেঁচুনি হইতে থাকে এবং * সিমলা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, ক্রমাগত নাদে, ঘেঙ্গানি হয় ও সেই সঙ্গে অল্পাধিক রক্ত নির্গত হয়। বিষের পরিমাণানুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে মৃত্যু উপস্থিত হয়। সচরাচর প্রায় দুই হইতে চারি ঘণ্টার মধ্যেই পশুদিগের মৃত্যু উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

ব্যবস্থা।—অধিক পরিমাণে বিষ প্রয়োগ করিলে কোন প্রকার চিকিৎসায় প্রায় তাহার উপকার দর্শে না। ফলতঃ বিষ প্রয়োগের ন্যূনাধিক পরিমাণ অনুসারে চিকিৎসা দ্বারা উপকার হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে আবার এরূপও দেখা গিয়াছে যে, যে স্থলে পশু অল্প পরিমাণ বিষ খাইয়াছে এবং উপযুক্ত ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিলে আরাম করিতে পারা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় গৃহস্থগণের নিকট কোন প্রকার ঔষধ না থাকায় তাঁহারা তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হয়েন না।

অল্প পরিমাণ বিষ পশুর দেহে প্রবিষ্ট হইলে এবং যে সকল লক্ষণ উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই সকল সাংঘাতিক অবস্থা উপস্থিত না হইতে হইতে যদি নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করান যায়, তবে অনেক স্থলে আরোগ্য হইবার বিশেষ সম্ভব।

* সিমলা রোগ লিখিবার সময় তাহার লক্ষণ সমূহ লিখিত হইবে

দ্রব্যের নাম।	পরিমাণ।
গন্ধকের গুঁড়া	এক ছটাক।
মসিনার তৈল	আধ পোয়া।
ভাতের মাড় (তপ্ত)	আধ সের।

তালিকার লিখিত দ্রব্য সমূহ একত্রিত করিয়া পশুকে সেবন করাইতে হইবে। এই ঔষধের রেচকতা শক্তি।

ঔষধ।

দ্রব্যের নাম।				পরিমাণ।
মসিনার তৈল	...	...	...	এক পোয়া।
গন্ধকের গুঁড়া	...	...	...	আধ পোয়া।
শুঁঠের গুঁড়া	...	...	...	সওয়া তোলা।
ভাতের গরম মাড়	...	...	...	আধ সের।

লিখিত দ্রব্য সকল এক সঙ্গে গুলিয়া পশুকে সেবন করাইলে ভেদ হইবে। ইহাও একটী বিরেচক ঔষধ।

বিষাক্রান্ত পশুদিগের পক্ষে বিরেচক ঔষধই একমাত্র উপকারী। এজন্ত যে সময় দেশ মধ্যে ঐরূপ মড়ক উপস্থিত হয়, সেই সময় প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট লিখিত ঔষধ কয়েকটী সংগ্রহ করিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ উহার অভাবে যখন প্রভূত অনিষ্টের গুরুতর সম্ভব, তখন তাহাতে ঔদাস্ত করা মূর্খতার কার্য্য। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি, তাদৃশ ঔষধ জানা না থাকায় অনেক গৃহস্থ বিশেষরূপ ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন। পথ্যের মধ্যে প্রথমে তিসির মাড় অধিক পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। এই সময় একটী কথা বিশেষরূপ মনে রাখা আবশ্যক, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বেদনা নিবারণ এবং পেট নামা বন্ধ না হয়, ততক্ষণ আদৌ জল দেওয়া উচিত নহে। কারণ ঐ সময় পশুকে জল পান করিতে দিলে প্রভূত অপকারের সম্ভব।

পশু যেমন আরোগ্য লাভ করিয়া সুস্থ হইতে থাকিবে, সেই সঙ্গে

সঙ্গে অল্প পরিমাণ কলাই সিদ্ধের সহিত ভুষির জাব দিতে পারা যায়। পরে অর্থাৎ দুই এক দাস্তর পরে কাঁচা নরম ঘাস দিলে চলিতে পারে, এই সময় শক্ত ঘাস দেওয়া উচিত নহে।

পরীক্ষা।—মৃত পশুর ছোট ছোট ভুঁড়ির কিয়ৎ পরিমাণ অর্থাৎ আঁত ও পাকস্থলীর যে স্থলে সংযোগ হয়, সেই স্থানের কিয়দংশ লইয়া একটী বড় রকম বোতলের মধ্যে রাখিয়া তাহা তীব্র মদ দিয়া পূর্ণ করতঃ উত্তমরূপে ছিপি আঁটিয়া রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য উক্ত পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করিলে তাহা নির্দ্ধারিত হইবে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডাক্তার সাহেবের নিকট এবিষয়ের সাহায্য চাহিলে তৎক্ষণাৎ তাহা পাওয়া যায়। সুতরাং গ্রাম মধ্যে এইরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে এবং কাহারও প্রতি সন্দেহ ঘটিলে লিখিত নিয়মে পরীক্ষা করা আবশ্যক। কারণ এই নিষ্ঠুর কার্য্যের শাসন না করিলে উক্ত ব্যবসায়ীগণের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইয়া উঠে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বৎসর বৎসর গৃহস্থগণের ক্ষতি এবং নিরীহ পশুদিগের অকালে জীবন নষ্ট ঘটিয়া থাকে।

অশ্ব-পালন।

আমাদের দেশে আজি কালি গবাদি পশুর ন্যায় অশ্ব-পালন প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত হইতেছে। কিন্তু গো-পালনে হিন্দু-সন্তান যতদূর যত্ন ও অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন, অশ্ব-পালনে ততদূর করেন না। অথচ কি পল্লীগ্রামে, কি নগরে, কি ফকীর, কি আমীর সকলেই প্রায় সাংসারিক সৌকার্য্যার্থে অথবা বিলাস-লালসায় ঘোটক পুষিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় সুচারুরূপে অশ্ব-পালনে অভিজ্ঞতা না থাকা অতি বিড়ম্বনার কথা।

অশ্ব-পালনে প্রধানতঃ ইহার বাস গৃহ, খাদ্য এবং স্বাস্থ্যের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। খাদ্য সাধারণতঃ অশ্বের আকার এবং উহার শ্রমের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। গাড়ীর অশ্ব এবং টাটু ঘোড়া যখন সর্ব্বদাই কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তখন দিনের মধ্যে অন্ততঃ চারিবার দানা

খাওয়ান আবশ্যক এবং আরোহণের অশ্বকে প্রত্যহ তিনবার দানা দিলেই চলিতে পারে। "পনি" ঘোটককে দুইবার করিয়া দানা দিলেই বেশ চলিতে পারে এবং সেই সঙ্গে ভালরূপ প্রতিপালিত হইলে এই আহারেই বিলক্ষণ সুন্দর অবস্থায় থাকিবে। অশ্ব-স্বামীকে অশ্বের খাদ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতীয় দানার বিভিন্ন প্রকারের গুণ এবং উপকারিতার কথা মনে রাখিতে হইবে।

অশ্বকে আহার প্রদানের নিয়মিত সময় ও তাহার নির্দ্ধারিত পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যখন প্রত্যহ চারিবার খাদ্য প্রদত্ত হয়, তখন প্রথম বারের সময় প্রাতে ৭টা, দ্বিতীয় বারের সময় ১২টা এবং তৃতীয় বারের কাল বৈকালে ৪টা এবং রাত্রিতে ৮টার সময় হওয়া আবশ্যক। আর তিনবার দানা দিতে হইলে প্রাতে একবার, মধ্যাহ্নে একবার ও রাত্রিতে একবার দেওয়া উচিত। দুইবার হইলে প্রাতে একবার ও রাত্রিতে একবার দিলেই চলিবে। প্রত্যেকবারে আহারের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচালির কুচি দেওয়ার ব্যবস্থা ভাল। এইরূপ করিলে দানা ঝাড়িবার আর বিশেষ দরকার হয় না। আর অশ্বের দন্ত সুদৃঢ় হইলে দানা না ঝাড়াই কর্ত্তব্য। যখন পূর্ণ মাত্রায় দানা প্রভৃতি খাদ্য দেওয়া হয় তখন প্রত্যহ ১২ পাউণ্ড পরিমিত ঘাস দিলেই চলিতে পারে। গোলআলু ও গোধুম, কলাই এবং ছাতু সময়ে সময়ে খাদ্য পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত ব্যবহার করা সুব্যবস্থা। আলু খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিবার পূর্ব্বে অল্প সিদ্ধ করা আবশ্যক। থানে আবদ্ধ ঘোটককে দুই এক মাসের নিমিত্ত ময়দানে চরিবার জন্য সময়ে সময়ে ছাড়িয়া দিলে ঘোটক দীর্ঘ-জীবী হয়; এরূপ ধারণা অনেকের আছে, সেটী বড়ই ভুল এবং বিপদসঙ্কুল। ঘোটকের পদ বিশ্রামের নিমিত্ত আস্তাবলে বিশ্রাম করানই উচিত। নতুবা ঐরূপ হঠাৎ পরিবর্ত্তনে ঘোটকের উপকার না হইয়া বরং বিলক্ষণ অপকার ঘটে। অশ্বের খাদ্য ও প্রতিপালন সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মানুষ্ঠান অবশ্যই তাহার শ্রম, ঋতু, আকার ও জাতি অনুসারে নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক এবং অশ্ব-স্বামীর ও অশ্ব-রক্ষকের অভিজ্ঞতার উপরি তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সুতরাং এরূপ স্থলে সে সম্বন্ধে অধিক কথা বলা

অসম্ভব। অশ্ব-পালনে অশ্ব-শালা সম্বন্ধে (আস্তাবল) কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা আছে। কেবলমাত্র অশ্বের খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে না। ঘোটকের বাসস্থানের সুব্যবস্থা না করিলে পর্য্যাপ্ত এবং উপযুক্ত আহার প্রদানে কোন ফল দর্শে না। য়ুরোপীয়দিগের ঘোটক সমূহ যে, কেবল পর্য্যাপ্ত আহারেই বলিষ্ঠ, সুন্দর ও দীর্ঘজীবী হয় তাহা নহে। পরন্তু উপযুক্ত বাস-গৃহ তাহাদের উন্নতির অন্যতর মুখ্য কারণ। আমাদের দেশে যদিও অনেক ধনী নিজে নিজে অশ্বকে পর্য্যাপ্ত ও উপযুক্ত আহার প্রদান করেন; কিন্তু অশ্বের বাস-স্থান সম্বন্ধে সচরাচর অনেকটা অসাবধানতা দেখাইয়া থাকেন। আর সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। অনেক সময়ে পর্য্যাপ্ত খাদ্যের প্রাপ্তিতে তেজীয়ান ঘোটকের বাহ্যিক আকৃতি যদিও উত্তম থাকে কিন্তু এই বাস-স্থানের দুরবস্থায় তাহাদিগের অভ্যন্তরস্থ তেজ এবং শক্তির হ্রাস হয়। এই মোটা কথাটী দেশীয়গণ লক্ষ্য করেন না। এবিষয়ে দেশীয় অশ্ব-স্বামীগণের য়ুরোপীয়দিগের অনুষ্ঠিত নিয়ম সমূহ অনুকরণ করাই কর্ত্তব্য। গৃহ অন্ধকূপের ন্যায় হওয়ায় ঘোটক অনেক সময় দম আটকিয়া মরিয়া যায়। এ ব্যাধির ঔষধ নাই এবং এ রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ না থাকায় তাহা নিরূপণ বা নিবারণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

অশ্বের প্রকোষ্ঠ সাধারণতঃ খিলানে গাঁথা হইলেই ভাল হয়। উহা অশ্বের আকৃতি অনুসারে প্রশস্ত ও দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। থানে আবদ্ধ ঘোটকের চতুঃপার্শ্বে প্রায়ই স্থান থাকে না। ইহা অতীব অন্যায়। তাই বলিয়া তেজীয়ান অশ্বের চারিদিকে অনাবশ্যকীয় অধিক স্থান অনর্থক রাখাও ভাল নহে। তাহাতে অশ্বের তেজস্বিতার হানি হয়। গৃহ মধ্যে এরূপ গবাক্ষ বা বাতায়ন রাখা উচিত যদ্দ্বারা বায়ু এবং আলোক গৃহ মধ্যে সুচারুরূপে প্রবেশ করিতে পারে। গবাক্ষ কিন্তু এরূপ স্থানে থাকিবে যাহাতে বাহিরের আলোকের জ্যোতি ঠিক সোজাভাব ঘোটকের চক্ষে আসিয়া পতিত না হয়। অর্থাৎ অশ্বের সম্মুখভাগে না রাখিয়া পার্শ্বভাগে গবাক্ষ বা বাতায়ন রাখাই উচিত। গৃহ পার্শ্বে এরূপ ড্রেণ (পয়ঃপ্রণালী) থাকা উচিত, যদ্দ্বারা প্রত্যহ আস্তাবলের ময়লা সমূহ পরিষ্কাররূপে বাহির হইতে পারে।

আস্তাবলের মেজে প্রায় সমতল হইয়া উক্ত ড্রেণের দিকে অতি ঈষৎ নিম্ন হওয়া উচিত। কিন্তু যেন এরূপ নীচ না হয় যে, তদ্দ্বারা সেই গৃহে অবস্থান কালীন অশ্বের শরীরের কোন ভাগ উচ্চ বা নীচু বলিয়া উপলব্ধি হয়। কেননা সেরূপ হইলে অশ্বের পরিচালনকালীন পদ ভঙ্গ হইতে পারে এবং চাইলে বিশেষ দোষ ঘটে। অশ্বের ভোজন-পাত্র কাষ্ঠ অপেক্ষা লৌহ নির্ম্মিত হইলেই ভাল হয়। অনেক বিলাসী অশ্ব-স্বামী সুন্দর ছোট ছোট লৌহ শিকল দ্বারা থানে বাঁধিবার কালে অথবা অন্য সময়ে অশ্বের পদ বন্ধন করিয়া রাখেন। ইহা অতীব অনিষ্ট-কর রীতি। যে অশ্ব কেবল তাহার পদ চতুষ্টয়ের নিমিত্তই মানুষের উপকারী জন্তু বলিয়া গণ্য এবং তাহার যে পদের অনিষ্ট হইলে সে আর কোন উপকারেই আইসে না, এই শৃঙ্খল বন্ধন দ্বারা অশ্বের সেই মহোপকারী পদকেই অকর্ম্মণ্য করা হয়। ইহার জন্য দড়া অথবা চর্ম্ম ব্যবহার করাই প্রশস্ত। অশ্বের পদ কোন দৈবগতিকে বেদনা পাইলে অথবা ভঙ্গ হইলে যত দিন তাহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অশ্বপদোপযোগী চর্ম্ম-বন্ধন (বুট) ব্যবহার করান উচিত।

অশ্বকে দিনের মধ্যে দুই বারের অধিক জল পান করান কর্ত্তব্য। কিন্তু বিশেষ পরিশ্রমের সময় অথবা অশ্ব গরমে উত্তেজিত হইলে সে সময়ে জল দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া অশ্ব হঠাৎ মারা পড়ে। বোধ হয় এ সাধারণ নিয়মটী সকলেই জানেন। তবে অনেক ধনীর সন্তান নাকি কোন কোন সময়ে এই অত্যাবশ্যকীয় নিয়মটীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া স্বীয় বাহনের কালস্বরূপ হইয়া উঠেন, তাই এই সহজ কথাটী এখানে বলিয়া রাখিলাম।

অশ্বকে যেমন অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইবার চেষ্টা করান অন্যায়, সেইরূপ প্রত্যহ পরিমিতরূপ চালনা না করাও অহিত-কর এইরূপ দৈনিক পরিচালনা হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিলে অশ্ব যেরূপ দুরন্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠে এবং ক্রমে অভ্যস্থ "চাইল" ভুলিয়া যায়, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

দূষিত খাদ্য নিরূপণ।

খাদ্য যে শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রধান উপযোগী, সে কথার আন্দোলন সুসভ্য সমাজে নিষ্প্রয়োজনীয়। আহারীয় দ্রব্যে পুষ্টি-কর পদার্থের সংযোগ যেরূপ আবশ্যকীয়—তাহাতে দূষিত পদার্থ না থাকা তদপেক্ষা সহস্র গুণে প্রয়োজনীয়। খাদ্য যত পুষ্টি-কর উপকরণেই প্রস্তুত হউক না কেন, যদি তাহাতে কোনরূপে অণু পরিমাণেও দূষিত পদার্থের সংযোগ থাকে, তবে তদ্দারা খাদ্যের সমুদয় গুণ বিনষ্ট হয় এবং দেহের বিলক্ষণ অপকার ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ খাদ্যের সুস্বাদ করণে যতদূর কৌশল ও যত্ন নিয়োজিত হয়, তাহার উপ-করণের পুষ্টিকারিতা ও পরিষ্কার সম্বন্ধে ততদূর মনোযোগ দেওয়া হয় না। সুতরাং আমাদের দেশের প্রায় অধিকাংশ খাদ্য সুস্বাদু হইয়াও সাতিসয় অপকারী। দেশীয় পিষ্টক এবং মিষ্টান্ন যে সকল উপকরণে প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশই অহিত-কর। আমাদের দেশে অসাময়িক মৃত্যু, দৈহিক দৌর্ব্বল্য এবং নানাবিধ রোগের প্রধান কারণ এইরূপ দূষিত খাদ্যের ব্যবহার। এই সমুদয় হৃদয়-বিদারক অনিষ্টা-পাত নিবারণের একমাত্র প্রধান উপায় খাদ্য পদার্থের প্রতি সবিশেষ মনেযোগ রাখা। বিশেষতঃ ওলাউঠা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব কালে খাদ্যের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি প্রয়োগ যে, কতদূর প্রয়ো জনীয় তাহা বলিয়া উঠা যায় না। কতিপয় প্রধান চিকিৎসক নির্দ্দেশ-করিয়াছেন যে, দূষিত খাদ্যেই অনেক সময়ে এই ভয়ঙ্কর রোগের কারণ হইয়া উঠে, অথবা ইহার বিশেষ সহায়তা করে।

খাদ্যের সবিশেষ দোষ নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা দ্রব্য-গুণ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যতীত সাধারণ লোকের থাকা অসম্ভব। কিন্তু বাজারের সাধারণতঃ এমন অনেক জিনিষ দূষিত উপাদানে প্রস্তুত হয় যে, সংসারী ব্যক্তি তাহা অনায়াসেই চিনিয়া লইতে পারেন। হালুইকারের দোকানের অনেক খাদ্য অধিক ভারী করিবার জন্য বা অতিরিক্ত পরিমাণে সুস্বাদু করিবার নিমিত্ত যে

উপাদান নিয়োজিত হয় তাহা প্রায়ই অপকারী। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্তও এরূপ স্থলে অনাবশ্যকীয় অহিত-কর পদার্থ প্রয়োগে খাদ্যকে দূষিত করা হয়। আজি কালি আমাদের দেশীয় অনেক সহরে সন্দেশ, মিঠাই প্রভৃতি দেশীয় খাদ্যে, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার নিমত্ত রাংতার আবরণ প্রদত্ত হয়। ইহাতে খাদ্যদ্রব্য সাতিশয় দূষিত হয়। সেরূপ জিনিষ কোন মতেই ব্যবহার করা উচিত নহে। বরং এরূপ রীতি যাহাতে নিবারিত হয়, তাহার উপায় বিধান করা সকল ভদ্র ব্যক্তির কর্ত্তব্য। মিষ্ট দ্রব্যের সৌন্দর্য্য করণার্থে বা রঙের উৎকর্ষ সাধন জন্য সচরাচর দূষিত উপাদানের প্রয়োগ হইয়া থাকে। গৃহস্থমাত্রেরই এইরূপ খাদ্যের চাক্‌চিক্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। এরূপ খাদ্য ব্যবহারের ফল অনেক সময় হাতে হাতে পাওয়া যায় না সত্য। কিন্তু সেই অবশ্যম্ভাবী কুফল অজ্ঞাতসারে আমাদের স্বাস্থ্যের মূল ছেদন করে এবং চরমে ধ্বংসের কারণ হয়। এদেশে ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, ময়দা প্রভৃতি অপর ভোজ্য দ্রব্যে সচরাচর যে সকল দূষিত উপাদান প্রয়োগ করা হয়, অনেক সময় তাহা চিনিয়া উঠা যায় না। কোন কোন স্থলে দূরবীক্ষণের সাহায্যে যদিও চিনিয়া লওয়া যায় সত্য কিন্তু সে ব্যবস্থা অতি অল্প লোকের মধ্যেই খাটে। সুতরাং ক্রেতাকে সে অবস্থায় নিজের অভিজ্ঞতা বা কৌশলের উপর নির্ভর করিতে হয়। এরূপ স্থলে একটু বিশুদ্ধ নমুনা লইয়া তাহার সহিত ক্রীত দ্রব্যের তুলনা দ্বারা বিশেষ-রূপে (নিজের সাধ্যমত) তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখাই প্রশস্ত।

দোকানের মিষ্ট দ্রব্য সচারাচর বিনা আবরণে খোলা স্থানে সজ্জিত থাকে। তাহাতে বাহিরে কত ধূলা, পোকা, ছাই, ভস্ম যে আসিয়া পড়ে, তাহা যিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত নিজ নয়ন ও রসনা সার্থক করিবার মানসে সেই দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন তিনিই জ্ঞাত আছেন। এরূপ খাদ্যে আবার বিসূচিকা ও ক্ষতস্থের রস পায়ী মক্ষিকাগণ সময়ে সময়ে ঐ সকল রোগের বীজ ছড়াইয়া যায়। তদুপরি মক্ষিকাগণ খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে সচারাচর নিজ নিজ অণ্ড নিক্ষেপ করিতেও ত্রুটি করে না। খাদ্যের সহিত ঐ অণ্ড

উদরস্থ হইয়া এক প্রকার ক্রিমির উৎপাদন করে। সেই ক্রিমি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিলক্ষণ অহিত-কর। এই সমস্ত নানা কারণে বাজারের খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার করা অপেক্ষা নিজ নিজ গৃহে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইলে তাহা স্বল্প ব্যয়ে অধিকতর স্বাস্থ্যকর হয়।

বাজারে সচরাচর যে মাংস বিক্রীত হয় তাহা বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া ব্যবহার করাও অনুচিত। কারণ মাংস ব্যবসায়ীগণ প্রায়ই শস্তা মূল্যে পাঁটা আদি ভোক্ত্য জীব ক্রয় করিয়া থাকে। সে সকল জীব অনেক সময় বসন্ত প্রভৃতি পীড়াক্রান্ত বা শৃগাল কুক্কুর দংষ্ট হইতে পারে। সেইরূপ জীবের মাংস যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব হানি-জনক তাহা বলা বাহুল্য। এই নিমিত্তই হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা পূজায় বিনা বলিতে অর্থাৎ বৃথা মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর পূজায় পশুকাদি যে সকল জীব বলিদান করা যায়, তাহা ঐরূপ দূষিত হইলে চলে না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দূষিত এবং বাসী মাংস প্রায়ই রস-বিহীন ও বিশুষ্ক বোধ হয়। দোকানদারেরা কোন কোন স্থলে ক্রেতার চক্ষে ধূলি দিবার নিমিত্তও বাসী মাংসের সহিত তাজা মাংসের ভাঁজ দিয়াও থাকে, বিশেষ লক্ষ্য করিলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা উহা নির্ব্বাচন করিতে পারা যায়।

গৃহস্থগণ অজ্ঞ ভাবেও অনেক সময়ে স্বহস্তে বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকেন; আমরা অনেক সময় এরূপও দেখিয়াছি, কোন কোন গৃহস্থ খাদ্য দ্রব্যের প্রতি মায়া বশতঃ অতিরিক্ত খাদ্য দ্রব্য গৃহে গৃহীত বা প্রস্তুত হইলে উহা এককালে ব্যবহার করিতে না পারিয়া বাসী করিয়া আহার করিয়া থাকেন। সামান্য খাদ্যের মায়াতে যে জীবনের মায়া পরিত্যাগ করা কতদূর মূর্খতার কাজ তাহা বুদ্ধিমান গৃহস্থমাত্রেই বুঝিতে পারেন। যে কোন প্রকার খাদ্যই হউক না কেন, তদ্দ্বারা যখন স্বাস্থ্যের অণুমাত্র অপকারের সম্ভব দেখা যাইবে, তখন তাহা বিষ-তুল্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

জীবনোপায় খাদ্য সমূহ বিষ সংযুক্ত হইলে—আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র-কারদিগের মত অনুসারে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহাও নিম্নে

সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। * গৃহস্থবর্গের সে সকল কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ থাকা প্রয়োজন।

অন্ন বিষাক্ত হইলে বিলেপীর মত গাঢ় হয়। তখন উহার ফেণ-গালা কঠিন হয়; এবং সিদ্ধ হইতে অনেক সময় লাগে। এরূপ লক্ষণা-ক্রান্ত অন্ন হইলে ময়ূরের গলার ন্যায় এক রকম আভা বাহির হইতে থাকে; উহা দেখিতে বাসী ভাতের মত বোধ হয়। ঐ আভা গায়ে লাগিলে মূর্চ্ছা হইতে পারে এবং মুখ দিয়া লাল বাহির হয়। বিষাক্ত হইলে ভাতের স্বাভাবিক গন্ধ এবং রঙ্ থাকে না তখন উহা কাদার মত হইয়া যায়।

বিষ সংযুক্ত অন্ন আগুণে ফেলিয়া দিলে গোলাকার হইয়া জ্বলিতে থাকে এবং তাহা হইতে চট্‌চটে শব্দ বাহির হয় এবং কোন কোন সময়ে অগ্নির আদৌ শিখা থাকে না, আর কখন কখন অগ্নি হইতে ধূম নির্গত হয় এবং কখন কখন তাহা হইতে ময়ূর কণ্ঠের ন্যায় নানা বর্ণ সংযুক্ত আভা প্রকাশিত হইতে থাকে। বিষাক্ত অন্ন এইরূপে পরীক্ষা করা বিশদ এবং প্রশস্ত।

দাইল এবং অন্যান্য তরকারী বিষাক্ত হইলে ত্বরায় শুষ্ক হয় এবং তাহার ঝোল ময়লা হইয়া যায়। সেই সকল তরকারীতে কম বা বেশী অঙ্গ সংযুক্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায় এবং কখনও বা তাহা আদৌ দেখা যায় না। আর তাহাতে ফেণা এবং বুড়বুড়ি নির্গত হইতে থাকে। শাক এবং মাংস বিষাক্ত হইলে ছিন্ন ভিন্ন এবং রস-হীন অনুভূত হয়।

মাংসের যূষ বিষাক্ত হইলে তাহাতে নীল বর্ণের রেখা দেখা যায়। দুগ্ধ বিষাক্ত হইলে তাহাতে তামার রঙের দাগ দেখা যায়। বিষ সংযুক্ত হইলে দধিতে শ্যাম বর্ণের রেখা, তক্রে হলুদ এবং কাল রঙের রেখা, ঘৃতে, জলের ন্যায় রেখা, মদ্য ও জলে কাল রঙের রেখা এবং মধুতে বিষ মিশ্রিত হইলে হরিদ্বর্ণের রেখা, তৈলে বিষ সংলগ্ন হইলে সূর্য্য রঙের রেখা

* বাগভট বা অষ্টাঙ্গ হৃদয় দেখ।

দেখা যায়। কাঁচা ফল বিষাক্ত হইলে পাকিয়া উঠে ও পাকা ফল বিষাক্ত হইলে পচিয়া যায়।

জীব জন্তুকে খাওয়াইয়া বিষাক্ত পদার্থ নিরূপণ করিতে পারা যায়। বিষাক্ত ভাত খাইলে মাছি মরিয়া যায়, কাকের স্বর ভাঙ্গিয়া আইসে, বিড়াল ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়।

মনুষ্যের মুখে বিষ লাগিলে লালা পড়িতে থাকে, জিহ্বা এবং ঠোঁঠ জড়াইয়া আইসে, দাহ এবং ঝিম্ ঝিম্ ব্যথা হয়, দন্ত বিশীর্ণ হয়, জিহ্বা কোনরূপ তার পায় না এবং চোয়াল লাগিয়া আইসে।

এরূপ অবস্থা হইলে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য এবং বিষ-নাশক ঔষধ যত সত্বর পাওয়া যায় তত শীঘ্র সেবন করা উচিত।

ভিত্তি বা বনিয়াদ।

বনিয়াদ অর্থাৎ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে, মাটির উপর হইতে দেওয়াল না গাঁথিয়া, মাটি খুঁড়িয়া উহার ভিতর হইতে গাঁথিয়া তুলিবার উদ্দেশ্য কি? বৃষ্টির জল বসিয়া বা অন্য কোন কারণে, দেওয়ালের নিম্ন-ভাগের মাটি শিথিল হইলে, অসমানরূপে বসিয়া পাছে উহা ফাটিয়া যায় কিম্বা হেলিয়া বা ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় এতদূর পর্য্যন্ত মাটি খুঁড়িয়া গাঁথা আবশ্যক যে, ততদূর ঐ সকল বিঘ্ন-কারক কারণ ঘটিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থাকে। যে মাটির উপর হইতে দেওয়াল গাঁথিতে আরম্ভ করিবে, উহা এরূপ শক্ত হওয়া আবশ্যক যে, উহা যেন তাহার উপরিস্থিত দেওয়াল ও ছাদ প্রভৃতির ভার অনায়াসে বহন করিতে পারে। যদি তাদৃশ শক্ত না হয় তাহা হইলে উপরিস্থ ভারবহনে অসমর্থ হইয়া মাটি বসিয়া যাইবে এবং দেওয়াল ফাটিয়া, হেলিয়া বা পড়িয়া যাইবে। এইজন্য বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে না পারে এতদূর খুঁড়িলেই যে যথেষ্ট হইল, এরূপ নহে; যতদূর পর্য্যন্ত উপযুক্ত কঠিন মাটি না পাওয়া যায়, ততদূর খুঁড়া অথবা অন্য কোন উপায়ে ঐ নরম মাটি শক্ত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

বনিয়াদের উপরই গৃহাদির স্থায়িত্ব অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং বনিয়াদ গাঁথিবার সময় বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অনেকে এরূপ মনে করেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, মাটির নীচের গাঁথনি একরূপ হইলেই হইল, উপরে ভাল করিয়া গাঁথা আবশ্যক। কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা বলিবার আবশ্যক নাই— গোড়া কাটিয়া আগায় জল প্রদান যে নিরর্থক তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অধিকাংশ গৃহস্থই আপনার মতানুসারে গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন; এঞ্জিনিয়ারের সাহায্য গ্রহণ করেন না এবং অনেক স্থানে উহা পাইবারও সুবিধা নাই। সুতরাং বনিয়াদ (যাহার দোষে গৃহাদি ফাটিয়া, হেলিয়া বা পড়িয়া যায়) কতদূর খুঁড়িতে এবং উহা কত প্রশস্ত করিতে হইবে সকলেরই ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু জানা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বঙ্গদেশে বৃষ্টির জল, সাধারণতঃ মাটির নীচে এক বা দেড়হাতের অধিক প্রবিষ্ট হয় না; সুতরাং এদেশে সাধারণ বাটী নির্ম্মাণ করিতে হইলে, বনিয়াদ দুই হস্ত খুঁড়িলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু দুই হস্ত নীচে যদি ভাল মাটি না মিলে, তাহা হইলে যতদূর না ভাল মাটি পাওয়া যায়, ততদূর খুঁড়িতে হইবে। ভরাট মাটি, অতিশয় বালি মিশ্রিত মাটি, ফাঁপা মাটি কোনরূপ শিথিল মাটি বা কর্দ্দমময় মাটি না হইলেই তাহাকে ভাল মাটি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যদি অল্প নীচে ভাল মাটি পাওয়া না যায় এবং যতদূর নীচে ভাল মাটি মিলে ততদূর খুঁড়িয়া ভরাট গাঁথিয়া তুলিতে অধিক ব্যয় হয়, তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে ও সহজে বনিয়াদ গাঁথিবার একটী নিয়ম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১) যদি বনিয়াদের অনুপযুক্ত মাটি তুলিয়া ফেলিয়া, ভাল মাটি বাহির করা অধিক ব্যয়-সাধ্য ও কষ্ট-কর না হয়, তাহা হইলে ঐ মাটি উঠাইয়া ফেলিয়া, ভাল মাটির উপর আন্দাজ এক হস্ত উর্দ্ধে ভরাট গাঁথিয়া মাঝে মাঝে পিল্লা উঠাইতে হয়। পরে ঐ পিল্লা সকলের মাথায় মাথায় খিলান করিয়া, তাহার উপর নিয়ম মত গাঁথিয়া যাইতে হয়।

ঐ খিলানগুলি সম্পূর্ণরূপে মাটির ভিতর থাকা আবশ্যক এবং মধ্যের ও পার্শ্বের স্থানগুলি মাটি দ্বারা উত্তমরূপে ভরাট করিয়া দিতে হয়।

(২) যদি নরম মাটি এতদূর নিম্ন পর্য্যন্ত থাকে যে, উহা একেবারে উঠান অতিশয় ব্যয় সাপেক্ষ ও কষ্ট-কর, তাহা হইলে অল্পমাত্র খুঁড়িয়া এক বা দেড়হস্ত অন্তর সমস্ত বনিয়াদের ভিতর কূপ খনন করিতে হয়। ঐ কূপের নিম্নভাগ, যতক্ষণ না ভাল মাটি স্পর্শ করে, ততদূর খনন করিতে হয়। পরে উহা চূণ ও সুরকি মিশ্রিত খোয়া দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে দুর্ম্মুশ করিতে হয়। প্রথমে এক ফুট আন্দাজ খোয়া ফেলিয়া দুর্ম্মুশ করিতে হয়। উহা উত্তমরূপে বসিলে, তাহার উপর আবার ঐ পরিমাণে খোয়া ফেলিয়া, সেইরূপ পিটাইতে হয়। এইরূপে স্তরে স্তরে পিটাইয়া কূপটী পরিপূর্ণ করিতে হয়। নতুবা একেবারে খোয়া দ্বারা পূর্ণ করিয়া পিটাইলে উহা শক্ত হয় না। কূপের উপরিভাগ মাটির কিছু নীচে থাকা আবশ্যক। অনন্তর ঐ সকল কূপে কূপে খিলান করিয়া তাহার উপর হইতে ভরাট গাঁথিয়া তুলিতে হয়, খিলানগুলি সম্পূর্ণরূপে মাটির নীচে থাকা আবশ্যক।

(৩) কূপ খনন না করিয়া, দুই হস্ত পরিমিত বনিয়াদ খুঁড়িয়া, তাহার ভিতর সাল, সেগুণ, সুন্দরী বা অন্য কোন শক্ত কাষ্ঠের মোটা মোটা খুঁটি কাছাকাছি পুতিয়া, ঐ সকলের মাথা বনিয়াদের নিম্নভাগের সহিত সমান করিয়া কাটিতে হয়। ঐরূপ কাছাকাছি কাষ্ঠ পুতিলেই সেই স্থান শক্ত হইয়া উঠে, এবং তাহার উপর হইতে গাঁথিয়া তুলিলে, দেওয়াল ফাটিবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

(৪) কেহ কেহ উক্তরূপে খুঁটি না পুতিয়া, বাহাদুরি বা অন্য কোন কাষ্ঠ বনিয়াদের নীচে ফেলিয়া তাহার উপর হইতে গাঁথিয়া তুলেন। ইহাও মন্দ নহে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা তৃতীয় নিয়মটী ভাল।

(৫) যদি বনিয়াদের খোয়া স্থানে গভীর কূপ বা গর্ত্ত থাকে, তাহা হইলে উহা উপরোক্তরূপ খোয়া বা মাটি দ্বারা পুরাইয়া, উহার এক পার্শ্বস্থ খোয়া গাঁথনির উপর হইতে অপর পার্শ্বের গাঁথনির উপরে খিলান করিয়া

তাহার উপর হইতে গাঁথিয়া যাইতে হয়। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, উপরের ভার ঐ গর্ত্তে কিছুমাত্র না পড়ে। গর্ত্তটী ভালরূপে পুরাইবার উদ্দেশ্য এই যে, পার্শ্বের জমি, (যাহার উপর খিলান থাকিবে) উপরের গর্ত্তের ভিতর ঢসিয়া না পড়ে। খিলানটী ঠিক্ যেন মাটির উপর গাঁথা না হয়। অন্যূন এক হস্ত ভরাট গাঁথিয়া তাহার উপর খিলান করা উচিত। কূপ বা গর্ত্তটী তাদৃশ গভীর না হইলে উহার তলা হইতে গাঁথিয়া উঠান ভাল।

(৬) যদি বনিয়াদের নীচের জমি তাদৃশ মন্দ না হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ অন্যূন অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত খোয়া (উত্তমরূপে পিটাইয়া যেন অর্দ্ধ হস্ত পুরু থাকে) দিয়া তাহার উপর সরু সরু লৌহের হাল লম্বালম্বি বিছাইতে হয়। অনন্তর চারি থাক ইট গাঁথিয়া তাহার উপর পুনর্ব্বার ঐরূপে হাল বিছাইতে হয়। এইরূপে প্রতি চারি থাক ইটের উপর ঐরূপে লৌহের হাল পাতাইয়া গাঁথিয়া যাইলে দেওয়াল বসিবার অতি অল্প সম্ভব থাকে; এবং কিঞ্চিৎ বসিলেও উহা সমভাবে বসে, সুতরাং ফাটিবার বা ভাঙ্গিবার আশঙ্কা থাকে না।

কোন কোন স্থানে মাটির নীচে অলক্ষিতরূপে অনেক গর্ত্ত থাকে। উহা পরীক্ষা না করিয়া তাহার উপর গাঁথিয়া তুলিলেই উপরের ভারে ঐ স্থান বসিয়া যায়। এইজন্য বনিয়াদ খুঁড়িয়া উহা উত্তমরূপে পিটাইয়া দেওয়া উচিত। পিটাইলে নিম্নস্থ গর্ত্ত জানিতে পারা যায়। না পিটাইয়া, জল ঢালিয়া দিলেও সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। বনিয়াদে কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া দিলে, যদি উহার নীচে গর্ত্ত থাকে তাহা হইলে জল সেই গর্ত্তে প্রবেশ করে।

ভরাট মাটির উপর বনিয়াদ করা কোনরূপে উচিত নহে। যদি বনিয়াদ ফাটিবার কালে, অসাবধানতা বশতঃ কোন স্থানে অধিক গভীর হইয়া যায়, তাহা হইলে উহা মাটি দ্বারা না পুরাইয়া গাঁথিয়া বা খোয়া দ্বারা ভরাট করা উচিত।

বালুকাময় মাটির উপর ভার পড়িলে, বালিগুলি পার্শ্বে স্থান পাইলে

সেই দিকে সরিয়া যায়। এইজন্য নিকটে পুষ্করিণী বা বড় গর্ত্ত থাকিলে এইরূপ মাটির উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা উচিত নহে; কারণ উপরের ভারে বালি সরিয়া যাইলে, দেওয়াল অসমানরূপে বসিবার, সুতরাং ফাটিবার বিশেষ সম্ভাবনা কিন্তু যদি বাধ্য হইয়া এইরূপ স্থানেই বাটী নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা হইলে বনিয়াদের পার্শ্বে উক্ত পুষ্করিণী বা গর্ত্তাদির অভিমুখে এক বা দুই সারি কাষ্ঠের খুঁটি গায়ে গায়ে অনেক নীচে পর্য্যন্ত পুতিতে হয়। এইরূপ করিলে ঐদিকে বালি সরিয়া যাইতে পারে না।

বনিয়াদ কত গভীর করিতে হইবে, উপরে কেবল এই বিষয়ই লিখিত হইল। কিন্তু বনিয়াদ উপযুক্ত গভীর হইলেই যে যথেষ্ঠ হইল, এরূপ নহে। বনিয়াদের গভীরতা অপেক্ষা, উহার প্রস্থের উপর গৃহাদির স্থায়িত্ব অধিক নির্ভর করে। মাটি তাদৃশ ভাল না হইলেও, যদি বনিয়াদ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্থ করা যায়, তাহা হইলে উপরের ভার, অধিক স্থানে ছড়াইয়া পড়ায় মাটি সহজে বসিতে পারে না; সুতরাং গৃহাদি ফাটিবারও বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। যেমন নরম মাটিতে লাঠির আগা সহজেই বসিয়া যায়; কিন্তু ঐ মাটির উপর দাঁড়াইলে, পা তত সহজে বসে না. এবং একখানি বড় তক্তা ফেলিয়া, তাহার উপর দাঁড়াইলে, উহা কিছুমাত্র বসে কি না সন্দেহ, সেইরূপ যে মাটিতে বনিয়াদ সরু করিলে, দেওয়াল বসিবার সম্ভব থাকে, সেখানে বনিয়াদ অপেক্ষাকৃত প্রশস্থ করিলে, দেওয়াল বসিবার আশঙ্কা থাকে না। অনেকে মনে করেন, যে মাটির ভিতরে গাঁথনি অধিক প্রশস্থ করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু উপরোক্ত কারণে, তাঁহাদের সে বিশ্বাসটী যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বনিয়াদে কত ভার পড়িবে এবং উহার মাটি, কত ভার বহন করিতে সক্ষম, তাহা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া, বনিয়াদের প্রস্থ নিরূপণ করিতে হয়, কিন্তু স্থপতি বিদ্যায় যাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই, এইরূপ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। এইজন্য বনিয়াদের প্রস্থের একটী স্থূল নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

বঙ্গদেশের মাটি তাদৃশ শক্ত নহে। এদেশে সাধারণ মাটির উপর

গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে, উহার প্রথম তলের দেওয়ালের ভিত্তি বা প্রস্থ যত, বনিয়াদের প্রস্থ, উহা অপেক্ষা একফুট আট ইঞ্চ (অর্থাৎ দুইখানি ইটের দৈর্ঘ্য) অধিক করা উচিত। মাটি বিশেষ শক্ত হইলে, বনিয়াদের প্রস্থ অপেক্ষাকৃত কম দিলে চলিতে পারে, এবং উহা বালুকাময় বা অন্ত কোন কারণ বশতঃ খারাপ হইলে, বনিয়াদের প্রস্থ, বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক দিতে হয়। কিন্তু উক্ত প্রস্থ রাখিয়া যে, মাটির নিম্নের সমস্ত গাঁথনি গাঁথিতে হইবে এরূপ নহে। প্রথমে ঐ প্রস্থে, একফুট উর্দ্ধে গাঁথিতে হইবে। এই একফুট পাকা গাঁথনি না গাঁথিয়া, চুণ, সুরকি ও খোয়া দিয়া দুর্ম্মুশ করিলে বরং ভাল হয়। কারণ এরূপ করিলে সমস্ত গাঁথনিটী জমিয়া একখানি প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় শক্ত হয়। পরে ঐ একফুট গাঁথনি বা খোয়ার উপর, প্রত্যেক ধারে আড়াই ইঞ্চ (একুনে পাঁচ ইঞ্চ অর্থাৎ একখানি ইটের প্রস্থ) বাদ দিয়া, আবার একফুট উর্দ্ধে গাঁথিতে হয়। অনন্তর উহার উপর পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিবারে আড়াই ইঞ্চ কাটান দিয়া আবার একফুট গাঁথিতে হয়। তৎপরে আবার পূর্ব্বের ন্যায় কাটান দিয়া গৃহের মেজের সমতল পর্য্যন্ত গাঁথিয়া তুলিয়া, আবার প্রতিপার্শ্বে আড়াই ইঞ্চ করিয়া কাটান দিয়া, প্রথম তলের দেওয়ালের পত্তন দিতে হয়। মাটির ভার-বহ শক্তির ন্যূনাধিক্য অনুসারে, বনিয়াদের প্রস্থ অপেক্ষাকৃত অধিক বা অল্প হইলে, গাঁথনির কাটানের সংখ্যা এরূপে নির্ণয় করিতে হইবে, যেন মাটির উপরের গাঁথনির প্রস্থ, গৃহের প্রথম তলের দেওয়ালের প্রস্থ অপেক্ষা পাঁচ ইঞ্চ মাত্র অধিক থাকে।

প্রথম তলের দেওয়ালের ভিত্তি না জানিলে, উপরোক্ত নিয়মানুসারে বনিয়াদের প্রস্থ ঠিক করিতে পারা যায় না। প্রথম তলের দেওয়ালের ভিত্তি স্থির করিবার নিয়ম, আমরা এ প্রবন্ধে লিখিব না। ভবিষ্যতে লিখিবার আশা রহিল।

উল্লিখিতরূপে গভীরতা ও প্রস্থ স্থির করিয়া বনিয়াদ কাটিলে, উহার নিম্নভাগ সাবধানের সহিত সমতল করা উচিত। ঢালু বনিয়াদের দোষ এই যে, ইহার উপরিস্থ গাঁথনি নিম্নাভিমুখে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করে ;

সুতরাং উক্ত গাঁথনি ফাটিয়া বা পড়িয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। পুষ্করিণীর ঘাট বা নিতান্ত ঢালুস্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে উহার বনিয়াদি, ঐ স্থানের ন্যায় ঢালুরূপে না কাটিয়া, সিঁড়ির ধাপের ন্যায় থাক থাক করিয়া ক্রমশঃ নিম্নরূপে সমতলভাবে কাটা উচিত। গাঁথিবার কালে, ইট্‌গুলি ইহার উপর যেন সমতল ভাবে থাকে—ঢালু হইলে গাঁথনির দৃঢ়তার অনেক হ্রাস হয়।

বৃহৎ বৃহৎ গৃহাদি নির্ম্মাণের কিয়ৎকাল মধ্যে, কিছু না কিছু বসিয়া থাকে। যাহাতে অণুমাত্র বসিতে না পারে বনিয়াদের উদ্দেশ্য এরূপ হইলেও, উহাতে কৃতকার্য্য হওয়া অতীব দুরূহ। সমভাবে সমস্ত বাটী বসিলে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু অসমানরূপে অল্প বসিলেই দেওয়াল ফাটিয়া বা হেলিয়া যায়। এইজন্য গৃহাদি অল্প বসিলেও, যাহাতে সমভাবে বসে, এরূপে বনিয়াদের প্রস্থ ও গভীরতা নির্ণয় করা উচিত।

লিখিবার কালি।

লিখিবার জন্য কাল, লাল এবং নীল প্রভৃতি নানা বর্ণের কালি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল কালির মধ্যে কাল কালিরই আদর অধিক; অর্থাৎ অধিকাংশ লিখনে এই কালি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লিখিবার কালি যত তরল অর্থাৎ পাতলা হয়, ততই উত্তম। ঘন কালি লিখন অপেক্ষা চিত্র-কার্য্যে সমধিক উপযোগী। কালি প্রস্তুত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে প্রকার কালি প্রস্তুত হইত এবং সেই কালিতে যে সকল লিখন কার্য্য সম্পন্ন হইত, এক্ষণে তাহার আদর হ্রাস হইয়া বিলাতী কালির ব্যবহার বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। বিলাতী কালির একটী গুণ এই যে, উহা লিখিবার সময় জলের ন্যায় লেখনী চালিত করিয়া দেয়, যত শুষ্ক হইতে থাকে ততই উহার রং ফুটিয়া আইসে ও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে এবং উহা ঘামিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে দাগ লাগে না।

সচরাচর ভাল বিলাতী কালি প্রস্তুত করিতে হইলে মাজু ফল, হীরাকস্, গঁদ, বকম কাঠ এবং জল ব্যবহার হইয়া থাকে। বকম কাঠে রং ঘন, হীরাকস্ ও মাজু ফলে বর্ণ কাল, জলে তরলতা এবং গঁদে চাকচিক্য হয়। ভাল কালি না হইলে কিছুদিন পরে কাল রং উঠিয়া গিয়া লাল্‌ছে রং থাকিয়া যায়। এজন্য লিখিবার পক্ষে ভাল স্থায়ী কালি প্রস্তুত করাই সুপরামর্শ।

কালি প্রস্তুত করা অতি সহজ কার্য্য। মনে করিলে প্রত্যেক গৃহস্থই স্ব স্ব ব্যবহারোপযোগী কালি প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। যে যে নিয়মে এবং যে যে উপকরণ দ্বারা কালি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

উপকরণ ও পরিমাণ।

মাজুফল (ছেঁচিয়া)	এক সের।
গঁদ	এক পোয়া।
হীরাকস্	এক পোয়া।
বকম কাঠ	এক পোয়া।
জল	আধ মণ।

মাজুফল ও বকম কাঠ এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত জলে উত্তমরূপ সিদ্ধ করিতে হইবে। উহা সুসিদ্ধ হইলে তাহাতে গঁদ দিতে হইবে এবং সর্ব্ব শেষে হীরাকসের গুঁড়া দিলেই কাল কালি প্রস্তুত হইল।

প্রকারান্তর।—ফুটন্ত জলে মাজুফল ও বকম কাঠ কুড়িদিন পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া পরে তাহাতে গঁদ ও হীরাকস দিলেই লিখনোপযোগী কালি প্রস্তুত হইল।

উপকরণ ও পরিমাণ।

বকম কাঠের জল	হাজার ভাগ।
ক্রমেট অফ্ পটাস্	এক ভাগ।

বকম কাষ্ঠের ভাগ অধিক পরিমাণে লইয়া তদ্দ্বারা জল প্রস্তুত করিতে

হইবে। ঐ জলে ক্রমেট অফ পটাস্ মিশ্রিত করিলে অতি উৎকৃষ্ট ব্লুব্ল্যাক্ কালি প্রস্তুত হইবে। উহাতে কোন প্রকার অম্লরস পড়িলেও উহার দাগ উঠিবে না এবং ষ্টীল পেনে লিখিলে উহা ক্ষয় হইবে না।

উপকরণ ও পরিমাণ।

হরিতকী	...	...	...	আধ সের।
চৌরী	...	...	...	আধ সের।
মাজুফল	...	...	...	এক সের।
হীরাকসের গুঁড়া	...	...	...	এক পোয়া।
নীল বড়ির গুঁড়া	...	...	...	আধ পোয়া।
জল	...	...	...	আধ মণ।

হীরাকস্ ও নীল বড়ি ভিন্ন লিখিত মসলাগুলি উত্তমরূপে সিদ্ধ কর, এবং সেই জলে কুড়িদিন পর্য্যন্ত উহা ভিজাইয়া রাখ। পরে তাহাতে নীল বড়ি ও হীরাকস্ দিয়া ছাঁকিয়া লও। অতি উত্তম ব্লুব্ল্যাক্ কালি প্রস্তুত হইবে।

প্রকারান্তর। গরম জলে মাজুফল ভিজাইয়া তাহাতে অল্প পরিমাণ ভেনেডেটা অফ্ এমোনিয়া মিশাইলে যে উৎকৃষ্ট কালি হইবে, তদ্দারা যাহা লেখা যাইবে, দীর্ঘকালেও তাহা নষ্ট হইবে না অর্থাৎ বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটিবে না। কেহ কেহ এই কালিকে চিরস্থায়ী কালিও কহিয়া থাকেন।

রঙ্গিণ কালি।

যে কোন রঙের কালি প্রস্তুত করিতে হইলে সেই সকল রঙের উপকরণ জলে ভিজাইয়া তাহাতে একটু ফট্‌কিরি ও গঁদ মিশাইলে সেই সেই রঙের কালি প্রস্তুত হইবে।

বাজারে যে সকল রঙ বিক্রীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদ্দারা বস্ত্রাদি রঙ্গিণ করা হয়, সেই সকল রঙ জলে গুলিয়া তাহাতে আবশ্যক মত গঁদ ও ফট্‌কিরি মিশাইয়া লইলেও রঙ্গিণ কালি প্রস্তুত হইবে।

লিখিতরূপ নিয়ম জানা থাকিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব ইচ্ছানু-

সারে লাল, সবুজ এবং বেগুণে প্রভৃতি বর্ণের কালি প্রস্তুত করিয়া লিখন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন।

বেগুণে কালি।

বকম কাষ্ঠের সিদ্ধ জলে ফট্‌কিরি মিশাইলে বেগুণে কালি প্রস্তুত হইবে।

লাল কালি।

ক্রিম্‌দানা	...	...	...	আধ ছটাক।
গরম জল	...	...	...	আধ সের।
লাইকার এমোনিয়া	...	...	...	আধ ছটাক।

গরম জলে ক্রিম্‌দানা ভিজাইয়া রাখিবে। যখন দেখিবে উহা শীতল হইয়াছে, তখন আধ পোয়া জলে লাইকার এমোনিয়া মিশাইয়া দিবে। অনন্তর এক সপ্তাহ পরে উহা ছাঁকিয়া লইবে, দেখিবে উত্তম লাল কালি প্রস্তুত হইয়াছে। তালিকায় জলের যে পরিমাণ লিখিত হইয়াছে, এমোনিয়া গুলিতে স্বতন্ত্র জল না লইয়া ঐ জলের মধ্য হইতে লইতে হইবে।

হরিদ্রা রঙের কালি।

গাম্বুজ (আধগুঁড়া)	...	...	...	আধ ছটাক।
গরম জল	...	...	...	তিন ছটাক।
স্পীট্‌	...	...	...	দেড় কাঁচ্চা।

প্রথমে গরম জলে গাম্বুজ ভিজাইবে। উহা উত্তমরূপ ভিজিলে তাহাতে স্পীট্‌ দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লইবে, হরিদ্রা রঙের কালি প্রস্তুত হইবে।

সোণালী বা সোণা রঙের কালি।

গঁদের জলে সোণার * স্তবক বা গুঁড়া উত্তমরূপে মাড়িয়া লইলেই এই কালি প্রস্তুত হইবে।

---

* ডাকের সাজে উহা ব্যবহার হইয়া থাকে।

গুঁড়া কালি।

মাজুফল	আধ পোয়া।
হীরাকস	আধ ছটাক।
গঁদ	আধ ছটাক।
চিনি (পরিষ্কৃত)	দেড় কাঁচ্চা।

উপরি লিখিত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক কর। পরে প্রত্যেক দ্রব্য খিচ-শূন্যভাবে গুঁড়া করিয়া লও। এখন সমুদায় গুঁড়া বা চূর্ণ এক সঙ্গে মিশাও। এই মিশ্রিত চূর্ণ সমান তিনটী ভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথক পৃথক মোড়ক কর এবং আবশ্যক হইলে আধ সের জলে এক একটী ভাগ গুলিয়া লইবে, অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালি প্রস্তুত হইবে।

যাঁহারা সর্ব্বদা বিদেশে যাতায়াত করিয়া থাকেন, এই গুঁড়া তাঁহা-দিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। কারণ প্রয়োজন হইলেই কালি প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন।

দেশী কালি।

প্রথমে ভূষা বেশ করিয়া মাড়িতে থাক। পরে তাহাতে গঁদের জল দিয়া পুনর্ব্বার মাড়িয়া লও। যখন দেখা যাইবে যে, উহা উত্তম মিশ্রিত হইয়াছে, তখন তাহাতে চাউল চুয়ান জল মিশাইয়া লইবে, দেশী কালি প্রস্তুত হইল।

অদৃশ্য কালি।

আমোদ প্রমোদ জন্য এক প্রকার কালি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কালির একটী আশ্চর্য্য গুণ যে, লিখিবার সময় কিম্বা পড়িবার কালে আদৌ হরপ দেখা যায় না। সকলই অদৃশ্য থাকে, পরে তাহাতে উত্তাপ কিম্বা অন্য কোন দ্রব্যের সংযোগ করিলেই হরপ প্রকাশিত হয় এবং ঐ সংযোগ পৃথক করিলেই আবার অদৃশ্য হইয়া থাকে, এইজন্য এই কালিকে অদৃশ্য কালি কহে। অদৃশ্য কালি প্রস্তুত করা অতি সহজ, মনে করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই উহা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। যে

নিয়মে এই কৌতুক-জনক কালি প্রস্তুত করিতে হয়, এক্ষণে তাহা লিখিত হইতেছে।

সমভাগ সিবাদল ও তুতে জলে গুলিয়া তদ্দ্বারা লিখিলে উহা দেখা যাইবে না। পাঠ করিবার সময় তাহাতে আগুণের তাত লাগাইলেই স্বরূপ প্রকাশ হইবে এবং শীতল হইলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অদৃশ্য হইবে।

পিয়াজের রসে লিখিয়া উক্ত নিয়মানুসারে আমোদ করিতে পারা যায়।

মাজুফলের জলে লিখিয়া তাহাতে হীরাকসের জল লাগাইলেও স্বরূপ বাহির হইবে। আবার হীরাকসের জলে লিখিয়া মাজুফলের জল দিলেও ঠিক ঐরূপ হইবে।

সোরা ও লবণ জলে গুলিয়া লিখিলে অদৃশ্য হইবে, পঠনকালে উহাতে অগ্নির উত্তাপ লাগাইলে হরিদ্রা বর্ণের স্বরূপ দেখা যাইবে।

ক্লোরাইড্ কিম্বা নাইক্রোমিউরিয়েট্ অফ কোবল্ট জলে গুলিয়া লিখিলে আদৌ দেখা যাইবে না, আগুণের তাতে উহা সবুজ বর্ণের স্বরূপ দেখা যাইবে এবং শীতল হইলে পুনরায় অদৃশ্য হইবে।

স্যাসিটেট অফ্ কোবল্ট জলে গুলিয়া তাহাতে কিছু সোরা মিশাইয়া লিখিলে অদৃশ্য হইবে এবং আগুণের তাতে গোলাপী রঙের বর্ণ দেখা যাইবে। শীতল হইলে অদৃশ্য হইবে।

ক্লোরাইট অফ কোবল্ট ও ক্লোরাইট অফ নিকেল্ জলে গুলিয়া লিখিলে কোন প্রকার বর্ণ দেখা যাইবে না, পড়িবার সময় লেখার উপর আগুণের তাত দিলে সবুজ বর্ণের অক্ষর দেখা যাইবে।

কালি প্রস্তুত সম্বন্ধে যে সকল উপকরণ লিখিত হইল, তৎসমুদায় বেনের দোকানে এবং ডিস্পেন্সরীতে পাওয়া যায়। মূল্য অধিক নহে, সুতরাং ইচ্ছা করিলে সকলেই উহা প্রস্তুত করিতে পারেন।

কালি গৃহস্থদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী। অতএব যাহা সর্ব্বদা ব্যবহারে লাগিয়া থাকে, তাহার জন্য পর-মুখাপেক্ষী হওয়া অত্যন্ত লজ্জার বিষয়!

ভূমি বা মৃত্তিকা।

যে কোন প্রকার কৃষি-কার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মৃত্তিকা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। কারণ মৃত্তিকার উপরেই কৃষি কার্য্যের জীবন নির্ভর করিয়া থাকে। মৃত্তিকা যে পরিমাণে উর্ব্বরা হইবে, কৃষি-জাত দ্রব্যও যে, সেই পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া কৃষকের আশা পূর্ণ করিবে, ইহা যেন প্রত্যেকের মনে জাগরিত থাকে। মৃত্তিকাই কৃষি কার্য্যের প্রধান সম্বল, কৃষকের যাবতীয় আশা ভরসা মৃত্তিকা গর্ভে নিহিত বিবেচনা করিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কি উপায়ে সাধারণে মৃত্তিকার স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত জানিতে পারেন, এস্থলে তাহার পরিচয় লিখিত হইতেছে।

মৃত্তিকার মধ্যে যদিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ উহা দুই ভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ চিক্কণ ও বালুকা। চিক্কণকে সচরাচর আটালু বা এটেল এবং বালুকাকে বালি বা বলেও কহিয়া থাকে। এই উভয় প্রকার মৃত্তিকার সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়।

কেবলমাত্র আটালু কিম্বা বেলে মাটিতে প্রায়ই কোন প্রকার চাষ আবাদ চলে না। আটালু বা চিক্কণ মৃত্তিকার লক্ষণ—তাহার কাদা গায়ে লাগিলে আঠার মত লাগিয়া থাকে, জল দিয়া ঘর্ষণ না করিলে উঠে না, প্রখর রৌদ্রেও হটাৎ উত্তপ্ত হয় না, যাহা স্বভাবতঃ অত্যন্ত কঠিন এবং উপরে জল পড়িলে নিম্নে তাহার শোষণের শক্তি না থাকে, তাহাকেই আটালু মৃত্তিকা কহে।

যে মৃত্তিকা রৌদ্রে সহসা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, শরীরে লাগাইয়া দিলেও পড়িয়া যায় এবং জল ধারণ করিতে পারে না, উপরে জল পতিত হইলে তাহা মৃত্তিকার নিম্নে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তাহাকে বালুকা বা বেলে মাটী কহে।

চিক্কণ ও বালুকা মিশ্রিণে যে মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়, তাহা আবার সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত যথা খিয়ার, পলি, দোঁয়াশ এবং চড়া।

খিয়ার।—যে মৃত্তিকায় ভালরূপ বৃষ্টি না হইলে প্রায়ই চাষ চলে

না, মৃত্তিকা স্বভাবতঃই অত্যন্ত কঠিন, এমন কি লাঙ্গল কর্ষণেও কষ্ট বোধ হয়, চাষের পূর্ব্বে কোদাল দ্বারা ভূমি খনন করিয়া চাষ করিতে হয় এবং বৃষ্টি হইয়া মৃত্তিকা কোমল হইলে তাহা কর্ষণ করিতে পারা যায়, তাহাকে খিয়ার কহিয়া থাকে। এই মৃত্তিকায় চিক্কণের ভাগ অধিক এবং বালুকার ভাগ অল্প।

পলি।—পলি মাটীতে সহজেই লাঙ্গল কর্ষণ করিতে পারা যায়। কারণ উহার উপরি ভাগের মৃত্তিকা রসাল থাকে, সুতরাং ততটা কঠিন হয় না, নিম্নে বেলে মাটী থাকে এবং উপরিকার মৃত্তিকাতে চিক্কণ ও বালুকা সমভাগে মিশ্রিত থাকে, তাহাকে পলি মাটী কহে। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ বৃষ্টি কিম্বা বন্যার জল প্লাবিত তীরস্থ ভূমিতে এই প্রকার মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া থাকে। অনেক প্রকার উদ্ভিদের পক্ষে পলি মাটী সারের ন্যায় কার্য্য করে।

দোঁয়াশ।—যে মৃত্তিকায় পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার মৃত্তিকা সম অথবা কিঞ্চিৎ অধিক বা অল্প মিশ্রিত থাকে, সহজে হল চালিত হয় এবং নিয়মিত সময়ের মধ্যে যাহাতে জল প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাকে দোঁয়াশ মৃত্তিকা কহে।

চড়া।—যে মাটীতে আটালুর ভাগ অল্প এবং বালুকার পরিমাণ অধিক দেখা যায়, গ্রীষ্মকালে রৌদ্র প্রবল হইলে ভূমি নীরস হয় এবং তৃণাদি শুষ্ক হইতে থাকে, তাহাকে চড়া কহে।

যে কয়েক প্রকার মৃত্তিকার বিষয় উল্লেখ করা হইল, সকল জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে যে, তাহা অনুকূল নহে, তাহা যেন মনে থাকে। অর্থাৎ উদ্ভিদের প্রকৃতি ভেদে কোন কোন শ্রেণীর পক্ষে পলি, কোন কোন জাতির পক্ষে খিয়ার প্রশস্ত। ফলতঃ উদ্ভিদের প্রকৃতি ভেদে মৃত্তিকা নির্ণয় করিয়া কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে লাভের সম্ভব। কোন্ কোন্ জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে কোন্ কোন্ মৃত্তিকার কত ভাগ প্রয়োজন, তাহা জানিতে হইলে বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়। কিন্তু তাহা অত্যন্ত গুরুতর। এজন্য এসম্বন্ধে কতিপয় সহজ সহজ উপায় আছে,

সেই সকল উপায় জ্ঞাত হইয়া চাষে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ যে ভূমিতে বালির ভাগ অপেক্ষা চিক্কণের ভাগ অল্প, তাহাতে লতা জাতীয় গাছ রোপণ করিলে তাহাদের পোষণের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। আর গুল্মাদির পক্ষে চিক্কণ ও বালুকা উভয় ভাগ সমান হইলেই চলিতে পারে। বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে বালুকার ভাগ অল্প এবং চিক্কণের পরিমাণ কিছু অধিক হইলেই ভাল হয়।

যে মৃত্তিকায় গাছ গাছড়া স্বভাবতঃই তেজাল ভাবে জন্মিয়া থাকে, সেই মৃত্তিকা উর্ব্বরা জানিতে হইবে, আর যাহাতে গাছ পালা ভাল রকম বাড়ে না, নিস্তেজ ভাবে থাকে, তাহা অনুর্ব্বরা। অত্যন্ত উচ্চ, রস-শূন্য ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সামান্য মাত্র। সমস্ত দিন যে মৃত্তিকায় রৌদ্র লাগে না তাহাতে প্রায়ই শস্যাদি হয় না। বর্ষাকালে যে ভূমিতে জল উঠিয়া থাকে, তাহা কৃষি কার্য্যের উপযোগী। বাঁশ প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদের আওতায় ভালরূপ শস্যাদি জন্মে না। যে ভূমি প্রতি বৎসর উঠিত অর্থাৎ চাষ আবাদ করা হয়, তাহাতে সার না দিলে ক্রমে তাহার উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস হইয়া আইসে। বন্যা কিম্বা বৃষ্টির জলে যে ভূমি প্রতি বৎসর ভিজিতে পায় অর্থাৎ সিক্ত হয় তাহা চাষের পক্ষে উর্ব্বরা। সার না দিয়া যদি দুই তিন বৎসর অন্তর ক্ষেত্র পতিত অর্থাৎ চাষ না করা যায়, তাহা হইলে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফসলের পরিমাণ দেখিয়াও মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যে ভূমিতে প্রতি বৎসর দুই তিন বার আবাদ হইয়া থাকে, তাহা উর্ব্বরা, আর যাহাতে বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র একবার শস্য জন্মে, তাহা অনুর্ব্বর মনে করিতে হইবে। ক্ষেত্রে সোক্ষ ধান বুনিলে যদি উহা মোটা দানায় ফলন হয়। তবে সেই মৃত্তিকার তেজ অধিক জানিতে হইবে। দোঁয়াশ মৃত্তিকা প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিদের পক্ষেই প্রশস্ত। যে ভূমির মৃত্তিকা আবশ্যক মত রসাল অর্থাৎ যাহাতে জলের ভাগ অধিক নহে, তাহাই অধিকাংশ উদ্ভিদের পক্ষে

প্রশস্ত। যে মৃত্তিকার যে জাতীয় শস্যাদি জন্মিয়া থাকে, তাহা স্থির করিয়া চাষে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

মৃত্তিকা পরীক্ষা সম্বন্ধে একটী সহজ কৌশল আছে, তাহা জ্ঞাত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই উহা নির্ব্বাচন করিতে পারেন। অর্থাৎ যে কোন ভূমির এক খণ্ড মৃত্তিকা লইয়া ওজন করিলে যে পরিমাণ হইবে, এবং ঐ পরিমিত মৃত্তিকা খণ্ড যদি দগ্ধ করিয়া আবার ওজন করা যায় এবং তাহাতে যে পরিমাণের হ্রাস হইবে, তাহা উহার সার ছিল বিবেচনা করিতে হইবে। মনে কর এক সের ওজনের মৃত্তিকা খণ্ড দগ্ধের পর তিন পোয়া হইল, তাহা হইলে উহাতে এক পোয়া সার ছিল। আর যদি ঐ অবশিষ্ট মৃত্তিকা জলে গুলিয়া জল ফেলিয়া দেওয়ার পর বালুকা শুকাইয়া ওজনে এক পোয়া হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে, দুই ভাগ চিক্কণ ও এক ভাগমাত্র বালুকা উহাতে বর্ত্তমান।

যে কোন চাষ আবাদে ভূমির অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাওয়াই কৃষকের গুরুতর কার্য্য। কারণ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি না করিয়া চাষে যত কেন পরিশ্রম ও ব্যয় কর না সমুদায়ই পণ্ডশ্রম হইবে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির উপায় করিতে হইবে। প্রত্যেক মৃত্তিকারেণুতে যে, আমাদের জীবনোপায় নিহিত আছে, তাহা যেন সকলেরই মনে জাগরিত থাকে।

দাড়িম্ব।

দাড়িম্বকে সচরাচর ডালিম ও দাড়িম্ কহিয়া থাকে। ডালিম যে প্রকার সুখাদ্য ফল সে পরিচয় কাহাকেও লিখিয়া বুঝাইয়া দিতে হয় না। কি সুস্থদেহ কি পীড়িত সকলেরই পক্ষে দাড়িম সুপথ্য। পীড়িত ব্যক্তিদিগের জন্য ডালিমের অত্যন্ত আদর। এজন্য প্রত্যেক গৃহস্থের আবাস বাটীতে দুই একটী গাছ রোপণ করিলে প্রয়োজন মত ফল লাভ করিতে পারা যায়।

সকল মৃত্তিকায় রোপণ করিলে ডালিমের ভালরূপ গাছ হয় না। নিতান্ত নীরস অর্থাৎ যাহাতে বালির অংশ অধিক এবং জলীয় ভাগ (প্রযোজন মত) অল্প, সেইরূপ মৃত্তিকায় ডালিমের আবাদ করা উচিত নহে। আবার যাহাতে রসের ভাগ প্রচুর অর্থাৎ জলীয়াংশ অধিক সেইরূপ মৃত্তিকায় রোপণ করিলে ফল পাকিবার পূর্ব্বে ফাটিয়া যায়। এজন্য অগ্রে মৃত্তিকা নির্ব্বাচন করিয়া চারা রোপণ করা উচিত। বালুকার পরিমাণ অল্প এবং সরস ভূমিতে উহা রোপণ করা প্রশস্ত।

সচরাচর তিন প্রকার ডালিম দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কোন কোন জাতীয় দাড়িম্ব অত্যন্ত মধুর, অম্লরসের লেশমাত্রও থাকে না। দ্বিতীয় প্রকার অম্ল মধুর আস্বাদনের অর্থাৎ অম্ল কিম্বা মিষ্ট রসের তীব্রতা থাকে না, উভয় রসের সমান সংযোগে উহার আস্বাদন অতীব উপাদেয়। তৃতীয় শ্রেণীর ডালিমে আদৌ মিষ্টতা থাকে না, অম্লরসের প্রচুরতা দেখিতে পাওয়া যায়। ডালিমের মধ্যে ইহাই অতি জঘন্য। এই অম্ল জাতীয় ডালিমের দানা শুষ্ক করিয়া রাখিলে তদ্দ্বারা সকল সময়ে ইচ্ছানুসারে চাট্‌নি প্রস্তুত করিতে পারা যায়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এইরূপ শুষ্ক ডালিমের চাট্‌নীর জন্য অত্যন্ত আদর। দেশীয় ডালিম নামে যে এক শ্রেণীর অম্লরস বিশিষ্ট ফল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বীজ পুতিয়া এবং কলম বাঁধিয়া দুই প্রকার নিয়মেই ডালিমের চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছি, বীজ অপেক্ষা কলমের চারায় উৎকৃষ্ট ফল হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে একটী কথা মনে রাখা উচিত, যেরূপ উৎকৃষ্ট জাতীয় গাছে কলম বাঁধা যাইবে, ফলও সেই পরিমাণে উপাদেয় হইবে। ফলতঃ ভাল জাতীয় বৃক্ষ নির্ব্বাচন করিয়াই কলম বাঁধাই উচিত। অনেকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে কোন বৃক্ষে কলম বাঁধিয়া প্রস্তুত করিলেই তাহা ভাল হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা মনে করা উচিত যে, মূল গাছ যে প্রকার গুণবিশিষ্ট তদুৎপন্ন কলমেও যে সেই গুণ ধারণ করিবে, তাহা যেন সকলেরই মনে থাকে। গুল-কলম

দ্বারা ডালিমের চারা উৎপাদন করিতে হয়। চেষ্টা করিলে বৎসরের মধ্যে সকল সময়েই কলম বাঁধিতে পারা যায়। তবে বর্ষাকালে বাঁধিলে সহজেই চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের মধ্যে প্রায় সকল স্থানে দাড়িমের গাছ হইয়া থাকে। তবে সকল স্থানের মৃত্তিকা একরূপ নহে, তজ্জন্য আস্বাদনের ভিন্নতা লক্ষিত হইতে দেখা যায়। ডালিমের টাট্কা বীজে চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা শুষ্ক হইলে তাহাতে উৎপাদিকা শক্তি থাকে না। কলমের পক্ষে যেমন উৎকৃষ্ট জাতীয় গাছ নির্ব্বাচন করিতে হয়, সেইরূপ বীজ সম্বন্ধেও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ভাল জাতীয় ডালিমের টাট্কা বীজ ঝুরা মাটীতে রোপণ করিয়া মৃত্তিকার অবস্থানুসারে মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল সেচন করিলে বীজ হইতে চারা বাহির হয়। গাম্‌লা প্রভৃতি কোন পাত্রে চারা তৈয়ার করিয়া পরে সেই চারা তুলিয়া উদ্যান মধ্যে নিয়মিত স্থানে রোপণ করিলেই চলিতে পারে।

ডালিম-গাছের শিকড় অধিক মাটীর ভিতর প্রবেশ করে না, সুতরাং গর্ত্ত অধিক গভীর না করিলে কোন ক্ষতি হয় না। বৃক্ষের মূলের মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে জল সেচন দ্বারা সরস রাখিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অধিক রসাল ভূমিতে ডালিম ভাল হয় না, অতএব মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ার মাটী খুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। মৃত্তিকা খনিত হইলে রৌদ্রে উহা শুষ্ক হইয়া রস মরিয়া যাইবে।

চারার অবস্থায় পশ্বাদিতে আহার করিলে গাছের বৃদ্ধি বিষয়ে বড় ক্ষতি হয়। এজন্য গোবাদি পশুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য উত্তমরূপে ঘিরিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

পক্ষী ও কীটাদি ডালিমের একটী বিষম শত্রু। এজন্য এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা ফল বাঁধিয়া রাখিলে উহা অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। ফলে বস্ত্রাদি খুব আঁটিয়া না বাঁধিয়া একটু ডিলা অর্থাৎ সল করিয়া বাঁধা উচিত। কারণ অত্যন্ত কসিয়া বাঁধিলে ফলের বৃদ্ধি সম্বন্ধে ব্যাঘাত হইতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ডালিম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাকিয়া থাকে। বিদেশীয় ফল শীতকালে পাকিয়া উঠে। দেশীয় ডালিম প্রায় বৈশাখ মাস হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে পাকিয়া থাকে। কোন কোন গাছে বৎসরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়েও পাকিতে দেখা যায়।

ডালিম জলপানে ব্যবহার হয়। তদ্ভিন্ন রোগীদিগের পথ্যে উহার সমধিক আদর। অনেক প্রকার রোগে ডালিমের শিকড়, ফুল, পাতা, ছাল এবং ফলের খোসা পর্য্যন্ত ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে।

বৈদ্য-শাস্ত্র মতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ডালিমের ভিন্ন ভিন্নরূপ গুণ নিরূপিত আছে।

মিষ্ট জাতীয় ডালিমের গুণ—তৃপ্তিকর, শুক্রবৃদ্ধিকর, স্নিগ্ধ, বলকর, লঘুপাক, ত্রিদোষঘ্ন এবং তৃষ্ণা, দাহ, জ্বরনাশক ও হৃৎকণ্ঠ মুখ-রোগ নাশক।

মধুরাম্ল জাতীয় ফলের গুণ—লঘুপাক, পিত্তকর, রুচিকর এবং ক্ষুধা বৃদ্ধিকর।

কেবল অম্ল ডালিমের গুণ—বায়ু কফ-নাশক এবং পিত্ত-জনক।

গৃহ পরিষ্কার।

গৃহাদি পরিষ্কার রাখা গৃহস্থের একটী প্রধান কার্য্য। গৃহের কর্ত্তা ও কর্ত্রীর সতত এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। গৃহাদি অপরিষ্কৃত হইলে কেবল যে, উহা দেখিতে কদর্য্য হয় এরূপ নহে, অপরিষ্কৃত স্থানে বাস করিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া নানাপ্রকার পীড়া হইবার গুরুতর সম্ভব। পরিষ্কৃত গৃহ যে কেবলমাত্র গৃহস্থবর্গের প্রীতির কারণ তাহা নহে, যে সেই গৃহে প্রবেশ করে তাহারই অন্তঃকরণে এক প্রকার আনন্দ সঞ্চার হইয়া থাকে।

অনেক গৃহস্থকে এরূপ দেখা যায়, তাঁহাদিগের দাস দাসীর অভাব নাই, গৃহ সামগ্রী পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বর্ত্তমান কিন্তু উহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি না থাকায় উহা অত্যন্ত কদর্য্য অবস্থায় থাকে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিজের যত্নের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক গৃহস্থ যদি সতত পরিষ্কার থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গৃহাদি বাস্তবিক আনন্দধাম মনে হয়।

গৃহ পরিষ্কার বলিলে কেবলমাত্র যে, গৃহটী পরিষ্কার করিলেই হইল এরূপ মনে করা উচিত নহে, কারণ পরিষ্কৃত গৃহে যদি ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি মলিন এবং অব্যস্থিতভাবে যথেচ্ছ বিন্যস্ত থাকে, তাহা হইলেও সে গৃহ পরিষ্কৃত বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গৃহাদি পরিষ্কার রাখা গৃহস্থের প্রধান কার্য্য। যদিও বাড়ীর কর্ত্তা কিম্বা গৃহিণীর মনোযোগের উপর উহা নির্ভর করে কিন্তু পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির এ সম্বন্ধে সমান যত্ন না থাকিলে কখনই গৃহাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায় না। এজন্য পরিষ্কার থাকিতে অভ্যাস করা সকলেরই পক্ষে সমান কর্ত্তব্য। গৃহাদি পরিষ্কার সম্বন্ধে ইংরাজগণ আমাদিগের অপেক্ষা বিস্তর উন্নতি লাভ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, কি নিয়মে গৃহাদি পরিষ্কার রাখিতে হয়, এই প্রস্তাবে তদ্বিষয়ক কতিপয় স্থূল স্থূল নিয়ম লিখিত হইবে।

প্রতিদিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয় গৃহের দ্বার ও জানালা প্রভৃতি বায়ু প্রবেশের পথগুলি খুলিয়া দেওয়া উচিত। কারণ রাত্রিকালে গৃহ মধ্যে যে রুদ্ধ বায়ু থাকে তাহা শ্বাস প্রশ্বাসে এক প্রকার দূষিত হইয়া উঠে, প্রাতঃকালে নির্ম্মল বায়ু প্রবেশ করিলে সেই দূষিত বায়ু স্থানান্তরিত করিয়া দেয়। অনন্তর শয্যাদি ঝাড়িয়া গৃহে ঝাঁইট দিতে হয়। ঝাঁইট দিবার সময় ঘরের কোণ প্রভৃতি সন্ধিস্থল সমূহ উত্তম রূপে পরিষ্কৃত করা উচিত। অনন্তর গৃহস্থিত দ্রব্য সমূহ অর্থাৎ বাক্স এবং আলমারি প্রভৃতি পরিষ্কার ঝাড়ন অথবা নেকড়া দ্বারা আস্তে আস্তে পুঁছিয়া ফেলিতে হয়।

প্রতিদিন যেমন গৃহ পরিষ্কার করিতে হইবে, সেইরূপ প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া উত্তমরূপে সমস্ত গৃহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্য সমূহ পরিষ্কার করা উচিত। অট্টালিকাদির দেওয়াল ঝাড়িতে হইলে ঝাঁটার মাথায় পরি-

ষ্কার নরম গোছের নেকড়া জড়াইয়া আস্তে আস্তে ঝাড়িলে ভাল হয়। ঘরের মেজে ধুইয়া দিলে সমুদায় ময়লা ধৌত হয়। দেওয়ালে চিত্র (অর্থাৎ পেইণ্ট) থাকিলে সাবান দ্বারা ধৌত করা উচিত নহে, কারণ তদ্দ্বারা উহা নষ্ট হইতে পারে। মিহি গোছের বালিতে জল ঢালিয়া ঝাঁটা দ্বারা মেজে ধৌত করিলে কোন স্থানে ময়লা কিম্বা কোন প্রকার দাগ থাকে না। ফ্লানেল কাপড় ভিজাইয়া তদ্দ্বারা চিত্রিত দেওয়াল পরিষ্কার করিলে কোন অপকার হয় না। বৈঠকখানা ঘরে কার্পেট ও গালিচা প্রভৃতি তুলিয়া রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া পুনর্ব্বার পাতা উচিত। গৃহ সামগ্রী অর্থাৎ বাক্স, চেয়াব, টেবিল এবং আলমারি প্রভৃতি ব্রস্ দ্বারা ঝাড়িলে ভাল হয়, তদভাবে মোটা নেকড়া অথবা ঝাড়ন দ্বারা ঝাড়িলে চলিতে পারে। চেয়ারের নীচে হয় ব্রস্ করিবে, নতুবা একটী লাঠির ঘা দিয়া ঝাড়িয়া দিলে ভাল হয়। পর্দ্দাগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া দিতে হইবে।

জানালাগুলি সপ্তাহে এক বা দুইবার ধুইয়া দেওয়া উচিত। প্রতি-দিন জানালাগুলি একবার করিয়া ঝাড়িয়া দিলে ময়লা জমিতে পারে না। ঘরের বিছানা প্রভৃতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া লইলে উহা উত্তম পরিষ্কার থাকে। খাট ও তপ্তপোস প্রভৃতির কোণগুলি বেশ করিয়া ঝাড়া উচিত। কারণ ঐ সকল স্থানে মাকড়াসা প্রভৃতির জাল এবং ছারপোকার অত্যন্ত উৎপাত হইয়া থাকে।

ইমারত প্রভৃতি প্রতি বৎসর একবার করিয়া মেরামত করা আব-শ্যক। অট্টালিকা মেরামত করিতে হইলে অর্থাৎ চূণকাম কিম্বা রং দিতে হইলে প্রথমে উপরিভাগে কার্য্য আরম্ভ করা সুপরামর্শ। কারণ অগ্রে নীচে মেরামত করিয়া উপরে কাজ আরম্ভ করিলে চূণ ও রং প্রভৃতি লাগিয়া নীচে ময়লা হইবার বিশেষ সম্ভব।

মনোযোগের ত্রুটি হইলে অট্টালিকাদির ন্যায় মাটীর ঘর প্রভৃতিরও সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর ও কদর্য্য হইয়া উঠে। যে স্থানে বাস করিতে

হয় তাহা যতদূর পরিষ্কৃত করিতে পারা যায়, তাহাতে দৃষ্টি রাখাই গৃহস্থ-গণের গৃহকার্য্যের একটী প্রধান অঙ্গ। মেটে ঘরের মেজে প্রতিদিন গোময় দেওয়া উচিত। দেওয়াল ও মেজে প্রভৃতিতে কোন স্থানে ইঁদুরের গর্ত্ত হইলে তাহা উত্তমরূপে বুজাইয়া দেওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কারণ অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ গর্ত্তে সর্প আসিয়া বাস করিয়াও থাকে। গৃহ-সামগ্রী পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে সজ্জিত করিয়া রাখিলে ইঁদুর প্রভৃতির বড় উৎপাত হয় না। মাটীর মেজে হইলে অল্প পরিমাণে জল ছিটাইয়া ঝাঁইট দেওয়া ভাল।

আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি, গৃহ সামগ্রী সাজাইয়া রাখিবার দোষেও অনেক গৃহ অত্যন্ত অপরিষ্কৃত হইয়া থাকে। অতএব কোন্ স্থানে কোন্ দ্রব্য রাখিলে পরিস্কার দেখায় তাহা নির্ব্বাচন করিয়া ঘর সাজান আবশ্যক। শয়ন-গৃহে অধিক দ্রব্য না রাখাই সুপরামর্শ। যে স্থানে যে দ্রব্য রাখিবার ব্যবস্থা ব্যবহার করিয়া পুনর্ব্বার তথায় তাহা রাখাই সৎযুক্তি।

থুথু প্রভৃতি ফেলিলে গৃহ কেবলমাত্র যে, ময়লা হয় এরূপ নহে, তাহা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ সঞ্চার হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে বাড়ী পরিস্কার সম্বন্ধে দুই প্রকার নিয়ম করা আবশ্যক। অর্থাৎ সদর মহলের পরিস্কারের ভার কর্ত্তার দৃষ্টির উপর এবং অন্তঃপুরের পরিস্কারিতা সম্বন্ধে কর্ত্রীর তত্ত্বানুসন্ধান করা উচিত। গৃহের আবর্জ্জনাদি গৃহের সম্মুখে না ফেলিয়া বাড়ীর দূরে নিক্ষেপ করাই উত্তম। গৃহের নিকট মলমূত্র ত্যাগ করিলে দুর্গন্ধে যে স্বাস্থ্যের মহা অনিষ্ট-কর হইয়া উঠে তাহা বোধ হয় সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। বাড়ীর মধ্যে কোন স্থানে দুর্গন্ধ হইলে তথায় চূণ ছড়াইয়া দিলে তাহা নিবারিত হইয়া থাকে। দুর্গন্ধ নাশের পক্ষে কার্ব্বোলিক য়্যাসিড সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। এদেশে যে ধুনা পুড়াইবার ব্যবস্থা আছে তাহাও অতি উত্তম।

গৃহস্থগণ কি প্রকার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন, তাহার প্রথম সাক্ষী আবাস বাটী। আবাস বাটী দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় কোন

গৃহস্থ পরিষ্কার সম্বন্ধে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন। বাস্তবিক পরিষ্কার বাড়ী দেখিলেই মনে একপ্রকার আহ্লাদ সঞ্চার হয়। গৃহস্থগণ ইচ্ছা করিয়া সে আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইলে কাহার না ক্ষোভ জন্মে ?

অপরিস্কৃত অট্টালিকা অপেক্ষা পরিস্কৃত কুটীর সহস্র গুণে রমণীয়। পরিস্কৃত গৃহে বাস করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়। অনেকের মনে এইরূপ ধারণ যে, অধিক অর্থ ব্যয় না করিলে পরিস্কৃত থাকা যায় না।—এই বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভুল তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রত্যেক গৃহস্থ যদি নিজ নিজ হস্তে গৃহাদি পরিষ্কার করিতে যত্নশীল হয়েন, তাহা হইলে ঐ আপত্তি খণ্ডন হইতে পারে। ঝাঁইট ও পাইট গৃহের নিত্য কার্য্য ; সুচারুরূপে নিত্য নিত্য উহা সম্পাদন করিলে গৃহাদিতে আর ময়লা সঞ্চিত হইতে পারে না। যাঁহাদিগের দাস দাসী থাকে, তাঁহাদিগের উচিত নিজের তত্ত্বাবধানে পরিষ্কার করিতে দেওয়া। নূতন দাস দাসী হইলে যে নিয়মে পরিষ্কার করিতে হইবে, প্রথমে কিছুদিন তাহাদিগকে তাহা দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে গৃহে রোগী থাকে, তথায় পরিষ্কার সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রোগীর আবাস গৃহের ন্যায় তাহার শয্যাদির প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়। রোগীর গৃহাদিতে যে কোন প্রকার দুর্গন্ধের সঞ্চার হইতে না পারে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা বিধেয়। সঙ্গতিশালী ব্যক্তিগণ রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি সর্ব্বদা কাচাইয়া লইতে পারেন, কিন্তু অসঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণ অবস্থানুসারে সাবান, সাজিমাটী এবং ক্ষার প্রভৃতি দ্বারা বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া সে অভাব মোচন করিতে সমর্থ হয়েন।

পরিষ্কার সম্বন্ধে উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব বিবেচনার উপর নির্ভর করাই সৎপরামর্শ। সর্ব্ব প্রকার মলিনতা পরিত্যাগ করাই গৃহস্থগণের প্রধান কর্ত্তব্য, যতদিন পর্য্যন্ত সাধারণের মনে এইরূপ ধারণ না হইবে, ততদিন উপদেশে কোন ফল দর্শিবে না।

ম্যাকাসার অয়েল।

এই তৈল চুলের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী, কিছু দিন উহা ব্যবহার করিলে চুল মসৃণ ও চাকচিক্যশালী হইয়া উঠে এবং মস্তক শীতল থাকে। যাঁহাদিগের মাথা গরম এবং পাতলা চুল থাকে, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারজনক। ম্যাকাসার তৈলের ন্যায় আরও নানা প্রকার সুগন্ধ তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কি নিয়মে ঐ সকল তৈল প্রস্তুত করিতে হয়, ব্যবসায়ীগণ প্রায় তাহা গোপন রাখিয়া থাকে, সুতরাং গৃহস্থবর্গকে একমাত্র বাজারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল প্রস্তুত করা অতি সহজ এবং সামান্য ব্যয়-সাধ্য। এমন কি মনে করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই উহা প্রস্তুত করিতে পারেন। ঐ সকল তৈল প্রস্তুত করিতে যে সকল মসলা প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহার হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই বেনের দোকান ও ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। পাঠকবর্গের কৌতুক ভঞ্জন জন্য ম্যাকাসার তৈল প্রস্তুতের নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

উপকরণ ও পরিমাণ।

অলিভ অয়েল বা তিল তৈল ... ... আধ সের।
য়্যানক্যানেট্ ... ... আধ ছটাক।
ওরিগেনম্ ... ... ষাইট ফোঁটা।

ওলিভ অয়েল, বাদাম তৈল, তিল তৈল এবং উৎকৃষ্ট রেড়ী তৈলেও ম্যাকাসার তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। এই সকল তৈলের মধ্যে যে কোন প্রকার তৈল দ্বারা প্রস্তুত করা উচিত। য়্যানক্যানেট্ এক প্রকার শিকড়। উহা বেনের দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই শিকড়ের গুণ উহা যে কোন তৈলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা লাল হইয়া থাকে। প্রথমে তৈলে য়্যানক্যানেট ভিজাইতে হইবে, যখন দেখা যাইবে তাহার লাল রং হইয়াছে, তখন তাহাতে ষাইট ফোঁটা ওরিগেনম্ মিশাইয়া বোতল মধ্যে মুখ আঁটিয়া রাখিতে হইবে। এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাহা

ব্যবহার না করিয়া প্রতিদিন দুইবার করিয়া ঐ বোতলটী উত্তমরূপে নাড়িতে হইবে। অনন্তর তাহা ছাঁকিয়া লইলেই তৈল প্রস্তুত হইল।

উপকরণ ও পরিমাণ।

বাদাম তৈল	...	...	তিন পোয়া।
য়্যান্‌ক্যানেট্‌	...	...	আধ ছটাক।
ওরিগেনম্‌ তৈল	...	...	ষাইট ফোঁটা।
রোজম্যারি তৈল	...	...	ষাইট ফোঁটা।
জায়ফল তৈল	...	...	পোনর ফোঁটা।
গোলাপী আতর	...	...	পোনর ফোঁটা।
নিরোলী তৈল	...	...	ছয় ফোঁটা।
মৃগনাভির আরক (এসেন্স)	...	...	চারি ফোঁটা।

প্রথমে তৈলে য়্যান্‌ক্যানেট্‌ ভিজাইয়া উহার রং লাল করিয়া লইবে। পরে তাহাতে তালিকার লিখিত দ্রব্যগুলি একে একে মিশাইয়া বোতলে পূরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলেই অতি উৎকৃষ্ট ম্যাকাসার তৈল প্রস্তুত হইল।

উপকরণ ও পরিমাণ।

ক্যাষ্টর অয়েল (রেড়ির তৈল)	...	...	তিন পোয়া।
য়্যান্‌ক্যানেট্‌	...	...	আধ ছটাক।
মৃগনাভি	...	...	দুই রতি।
লবঙ্গ তৈল	...	...	কুড়ি ফোঁটা।
বর্গামট্‌ তৈল	...	...	কুড়ি ফোঁটা।

উৎকৃষ্ট টাট্‌কা রেড়ীর তৈল গরম করিয়া তাহাতে দশ মিনিট পর্য্যন্ত য়্যান্‌ক্যানেট্‌ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। যখন দেখা যাইবে বেশ লাল ও শীতল হইয়াছে, তখন তাহাতে লিখিত দ্রব্যগুলি একে একে মিশাইয়া লইলেই ম্যাকাসার তৈল প্রস্তুত হইল।

উপকরণ ও পরিমাণ।

ক্যাষ্টর অয়েল	...	...	পাঁচ পোয়া।
য়্যান্‌ক্যানেট্‌	...	...	আধ ছটাক।

স্পিরিট্	আড়াই ছটাক।
জায়ফলের তৈল	ষাইট ফোঁটা।
রোজম্যারি তৈল	ত্রিশ ফোঁটা।
নিরোলী তৈল	কুড়ি ফোঁটা।
মৃগনাভির আরক	দশ ফোঁটা।
গোলাপী আতর	চল্লিশ ফোঁটা।

লিখিত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া মিলাইতে হইবে; এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত উহা কোন একটী পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। অনন্তর উহা থিতাইলে আস্তে আস্তে সেই থিতান তৈল ছাঁকিয়া লইলেই উত্তম ম্যাকাসার তৈল তৈয়ার হইল।

উপকরণ ও পরিমাণ।

ওলিভ বা তিল তৈল	আধ সের।
ওরিগেনম্ তৈল	ষাইট ফোঁটা।
রোজম্যারি তৈল	পঁচাত্তর ফোঁটা।

লিখিত দ্রব্যসমূহ এক সঙ্গে মিশাইয়া লইলেই ম্যাকাসার প্রস্তুত হইল। এই তৈল ব্যবহার করিলে চুলের বৃদ্ধি এবং কুকড়ান আকার হইয়া থাকে।

উপকরণ ও পরিমাণ।

সুইট্ বা ওলিভ অয়েল	দেড় ছটাক।
ল্যাভেণ্ডার তৈল	আধ ছটাক।

উপরের লিখিত তৈল দুইটী এক সঙ্গে মিশাইলে যে তৈল প্রস্তুত হইবে, তাহা ব্যবহার করিলে মাথার যে যে স্থানে পাতলা চুল হইয়া থাকে, তথায় চুল ঘন হইয়া থাকে।

ম্যাকাসার তৈল প্রস্তুত সম্বন্ধে যে যে পরিমাণ লিখিত হইল, গৃহস্থগণ স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে তাহার পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারেন। লিখিত নিয়ম ভিন্ন আরও নানা প্রকার উপায়ে ম্যাকাসার তৈল প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য প্রযুক্ত তাহা না লিখিয়া সহজ সহজ নিয়ম কয়েকটী লিখিত হইল।

সুগন্ধ তৈল।

নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প এবং বহু প্রকার গন্ধবিশিষ্ট মসলা দ্বারা যে তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই তৈলকে সুগন্ধ তৈল কহে। যে সকল নিয়মে ঐ সকল গন্ধবিশিষ্ট তৈল প্রস্তুত করিতে হয় ; তৎসমুদায়ের প্রস্তুত প্রণালী জানিতে পারিলে গৃহস্থগণ অনায়াসেই নিত্য ব্যবহার্য্য তৈল প্রস্তুত করিতে পারেন।

যে সকল তৈল মাখিলে স্নিগ্ধ বোধ হয় ; সেই সকল তৈল দ্বারা গন্ধ-তৈল প্রস্তুত করাই সুপরামর্শ। এজন্য বাদাম, তিল এবং নারিকেল প্রভৃতি তৈলে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক দিন হইতে এদেশে ফুলেল প্রভৃতি নানা প্রকার তৈল ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ প্রায় কেহই তাহার প্রস্তুত নিয়ম অবগত নহেন। এজন্য এ প্রস্তাবে নানা প্রকার সুগন্ধ তৈল প্রস্তুত করিবার নিয়ম লিখিত হইল।

ফুলেল তৈল।—তিল কিম্বা বাদাম তৈলে কাপড় ভিজাইয়া তাহার উপর সৌরভবিশিষ্ট ফুল সাজাইতে হয়। এক্ষণে ঐ পুষ্প স্তবকের উপর আবার তৈলাক্ত (তৈলে ভিজান) বস্ত্র আচ্ছাদন করিতে হইবে। এইরূপে স্তবকে স্তবকে ফুল ও কাপড় সাজাইয়া রাখিলে ফুলের গন্ধ ঐ বস্ত্রে আকৃষ্ট হইবে। যে পর্য্যন্ত বস্ত্রে উত্তমরূপ গন্ধ সঞ্চার না হইবে, সেই অবধি ঐরূপ করিতে হইবে। যখন বেশ বুঝিতে পারা যাইবে, বস্ত্রে উত্তম গন্ধ হইয়াছে, তখন সেই বস্ত্র নিংড়াইয়া লইলে সেই তৈল সুগন্ধবিশিষ্ট হইবে। সহজ উপায়ে ফুলেল তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে লিখিত নিয়মটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। পুষ্প সম্বন্ধে একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক, যে কোন ফুল হউক না কেন উহা যেন এক জাতীয় হয়।

প্রকারান্তর।—প্রথমে তিলগুলির খোসা ছাড়াইয়া উত্তমরূপে ঝাড়িয়া বাছিয়া লইতে হইবে। পরে রৌদ্রে একটী পরিষ্কৃত পাত্রে এক স্তবক তিল সাজাইয়া তাহার উপর এক স্তবক ফুল সাজাইতে হইবে। এইরূপে চারি পাঁচ স্তবক সাজান হইলে তাহা রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। যে পর্য্যন্ত তিলে উত্তমরূপ গন্ধ প্রবিষ্ট না হইবে, সেই পর্য্যন্ত প্রতিদিন নূতন নূতন

ফুল লইয়া উল্লিখিতরূপে শুকাইতে হইবে। অনন্তর উহা গন্ধবিশিষ্ট হইলে পরিষ্কৃত ঘানিতে তাহা ভাঙিয়া লইলে উত্তম ফুলেল তৈল প্রস্তুত হইবে।

গোলাপী তৈল।—গোলাপ পুষ্প দ্বারা এই তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে বলিয়া উহার নাম গোলাপী তৈল হইয়াছে। গোলাপী তৈল প্রস্তুতের নানা প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কতিপয় সহজ সহজ নিয়ম এই প্রস্তাবে লিখিত হইতেছে।

উপকরণ ও পরিমাণ।

ওলিভ কিম্বা নারিকেল তৈল	...	...	আধ সের।
গোলাপের পাপড়ি (বাটা)	...	...	দুই ছটাক।

ম্যাকাসার তৈল প্রস্তুত সম্বন্ধে যে সকল তৈল (রেড়ী ভিন্ন) উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সমুদায় তৈল দ্বারা গোলাপী তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল গোলাপে উত্তম গন্ধ আছে, সেই সকল গোলাপ হইতে ব্যবহৃত হয়। এস্থলে আর একটী কথা মনে রাখা উচিত, বাসি ফুল না লইয়া কেবলমাত্র বিকাশ হইয়া আসিতেছে, এরূপ ফুলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ফুলের বোঁটা প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। এখন ঐ পাপড়িগুলি একটী পরিস্কৃত পাত্রে বাটিয়া তাহা তৈলে মিশাইতে হইবে। এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তৈল রৌদ্রে কিম্বা কোন স্থানে রাখিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত তৈলে উত্তমরূপ গন্ধ না হয়, সে অবধি তৈল ছাঁকিয়া পূর্ব্ববৎ পাপড়ি বাটা মিশাইতে হইবে। যখন দেখা যাইবে তৈলের অতি সুঘ্রাণ হইযাছে, তখন তাহা ছাঁকিয়া লইলেই গোলাপী তৈল প্রস্তুত হইল। যদি তৈলের লাল রং করিতে ইচ্ছা হয়, তবে তাহাতে য়্যান্‌ক্যানেট দিতে হইবে।

যে কোন প্রকার তৈলে য়্যান্‌কানেট ভিজাইয়া লাল করিয়া তাহাতে আতর দিলেই সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে।

অন্য প্রকারে প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

উপকরণ ও পরিমাণ।

ওলিভ অয়েল	পাঁচ পোয়া।
আতর	ষাইট ফোঁটা।
রোজম্যারি তৈল	ষাইট ফোঁটা।

লিখিত দ্রব্য কয়টী এক সঙ্গে মিশাইলে উৎকৃষ্ট গন্ধ তৈল প্রস্তুত হইবে। তৈলের বর্ণ লাল করিতে হইলে পূর্ব্ব নিয়মে রং ফলাইতে হয়।

প্রকারান্তর।—ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ফুলের দ্বারা প্রস্তুত করিলে তৈলে ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ সঞ্চার হয় এবং সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ ফুলের নামানুসারে তৈলেরও বিশেষ নাম ব্যবহার হয়। যথা চামেলী তৈল, বেলা তৈল ইত্যাদি।

উপকরণ ও পরিমাণ।

ফুলের কুঁড়ি	দেড় পোয়া।
তৈল (পূর্ব্ব কথিত)	আধ সের।

তৈলের সঙ্গে কুঁড়িগুলি বাটিয়া একটী বোতলে পূরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। দুই তিন দিন পরে যদি তৈলে ভালরূপ গন্ধ বোধ না হয়, তবে পুনর্ব্বার ঐরূপ কুঁড়ি বাটিয়া রাখিবে। পরে উত্তম গন্ধ হইলেই তৈল ছাঁকিয়া লইবে।

যে কোন প্রকার তৈলের গন্ধ নষ্ট করিতে হইলে তাহাতে লঙ্কী দিতে হয়। জাফরাণ ও মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা পাক করিলে তৈলের হরিদ্রাবর্ণ হয়। অতএব প্রত্যেক গৃহস্থ স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে তৈলের গন্ধ নষ্ট করিয়া উহা ভিন্ন ভিন্ন রঙে রঞ্জিত করিয়া লইতে পারেন।

কেশ-হীনতা বা টাক।

নানা কারণে টাক হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সকল বয়সেই এই রোগ হইতে দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মাথায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে টাক হইয়া থাকে। এমনও দেখা যায়, একের

মাথায় যে কারণে এই রোগ হইয়া থাকে, অন্যের মস্তকে তাহার বিপরীত কারণেও উৎপন্ন হয়। মাথার চামড়া সঙ্কুচিত ও বিস্তারিত উভয় কারণেও টাক হইতে দেখা যায়। অপরিস্কার জন্যও টাক হইতে পারে। মাথায় সর্ব্বদা পাগড়ি ও টুপি প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে অর্থাৎ বাতাস না লাগিলে এই রোগ হইতে দেখা যায়। অত্যন্ত উষ্ণতা ও শীতলতাজনিতও এই রোগ হইতে পারে। জ্বর প্রভৃতি রোগে এবং দুর্ব্বলতা নিবন্ধন অনেক রোগীর এই রোগ হইতে দেখা যায়। রোগী অল্প পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত হইলে মস্তকের চর্ম্ম বিস্তারিত হয় এবং তাহার বিপরীত কারণে উহা সঙ্কুচিত হইয়া প্রথমে সামান্যরূপ চুল উঠিতে থাকে, পরিশেষে উহা স্থায়ী টাকরূপে পরিণত হয়। বাল্য ও যৌবনাবস্থায় টাক পড়িলে যদিও তাহা সারিয়া থাকে কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় টাক পড়িলে তাহার আরোগ্যের আশা অতি অল্পই। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, বৃদ্ধ বয়সেই অধিকাংশ লোকের টাক হইয়া থাকে। কারণ এই অবস্থায় চুলের গোড়া শিথিল হইয়া আইসে, গাছ পালার মূল শিথিল হইলে তাহা যেমন পড়িয়া যায়, সেইরূপ বার্দ্ধক্যাবস্থায় অনেকেরই চুল পড়িতে দেখা যায়। অল্প বয়সে এবং জ্বরে কেশহীনতা হইলে তাহা পুনর্ব্বার সঞ্চার হইয়া থাকে।

অল্প স্থান ব্যাপিয়াই হউক অথবা অধিক স্থান ব্যাপিয়াই হউক এবং অল্প দিনের জন্যই হউক কিম্বা স্থায়ীরূপেই হউক মাথার চুল উঠিয়া গেলেই তাহাকে টাক কহে। টাক সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে কয়েকটী কারণ উল্লেখ করা হইল, তদ্ভিন্ন মানসিক চিন্তা, প্রবল রোগ, অত্যন্ত অধ্যয়ন এবং পুরুষানুক্রমিক কারণেও এই রোগ হইতে দেখা যায়।

কেশ-হীনতা নিবারণ করিতে যদিও নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু সকল প্রকার ঔষধে সকল প্রকার টাক ভাল হয় না। অনেক সময়ে এরূপ দেখা গিয়াছে, যে ঔষধে একজনের উপকার হইয়াছে, সেই ঔষধে আবার অন্যের কিছুমাত্র উপকার হয় নাই।

কেশ-হীনতা নিবারণ করিবার জন্য যদিও নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহৃত

হইয়া থাকে এবং ঐ সকল ঔষধে সকল প্রকার টাক আরাম হইবার আশ্বাসও দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস করা উচিত নহে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা হইয়াছে, কোন কোন প্রকার টাক আদৌ ভাল হয় না। কেশ-হীনতা সম্বন্ধে যত প্রকার কারণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সম্প্রতি আর একটী নূতন কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহাদিগের শ্মশ্রু অর্থাৎ দাড়ী বড় হইয়া থাকে, তাহাদিগের প্রায় কেশ-হীনতা দেখা যায়।

টাকের যদিও নানাপ্রকার ঔষধ আছে, তন্মধ্যে কয়েকটী পরীক্ষিত ঔষধ নিম্নে লিখিত হইতেছে। টাক সম্বন্ধে একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ যে জাতীয় টাকের উপর হাত ঘষিলে যদি ঐ স্থান লাল হইয়া উঠে, তবে তাহা সারিবার সম্ভব কিন্তু লাল না হইলে আরোগ্যের অতি অল্পই আশা জানিতে হইবে।

চারি মুঠা বক্স উডের* গুঁড়া কিম্বা কুচি দেড় সের জলের সহিত একটী মৃত্তিকা পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া পোনর মিনিট সিদ্ধ করিতে হইবে। পোনের মিনিট পরে উহা একটী শীতল স্থানে ঢাকার অবস্থায় দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে। অনন্তর উহা ছাঁকিয়া সেই জলে উত্তম ল্যাবেণ্ডার ওয়াটার এক ছটাক মিশাইয়া তাহা বোতলে পূরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। প্রতিদিন দুইবার করিয়া সেই জলে টাক ধুইলে উহা নিশ্চয় আরাম হইবে।

অন্য প্রকার ঔষধ।

উপকরণ ও পরিমাণ।

রেড়ীর তৈল (উত্তম)	আধ পোয়া।
জ্যামেকা রম্	এক পোয়া।
ল্যাবেণ্ডার তৈল	ত্রিশ ফোঁটা।

লিখিত দ্রব্য কয়েকটী এক সঙ্গে মিশাইয়া একটী বোতলে পূরিয়া

* এক প্রকার কাষ্ঠ, ইহাতে ছবি খোদাই হয়

তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। ব্যবহার করিবার সময় বোতলটী বেশ করিয়া ঝাঁকাইয়া লইতে হইবে। সপ্তাহে তিন দিন ব্যবহার করিলেই আরোগ্য হইবে। টাকের প্রথম অবস্থায় ইহা মহোপকারী।

নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা শতকরা নব্বুই জনের টাক ভাল হইয়াছে।

উপকরণ ও পরিমাণ।

স্প্রিট্	আধ ছটাক।
ক্যাম্থারাইডিসের গুঁড়া*	আধ তোলা।

স্প্রিটে এই গুঁড়া চৌদ্দদিন পর্য্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। অনন্তর এই প্রস্তুত আরকের দশ ভাগ, চর্ব্বি† অথবা মোম, নারিকেল তৈল কিম্বা রেড়ী তৈলের সমভাগ গরম করিয়া তাহাতে আতর অথবা যে কোন গন্ধ দ্রব্য এক সঙ্গে মিশাইলে যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে, প্রতি দিন তাহা সকালে ও বৈকালে টাকের উপর রগড়াইলে নিশ্চয় আরাম হইবে।

অন্য প্রকার।

উপকরণ ও প্ররিমাণ।

মধু	আধ পোয়া।
বালি (পরিস্কৃত)	এক পোয়া।

প্রথমে বালিগুলি উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। এখন মধুর সহিত এই পরিস্কৃত বালি মাখিয়া লইয়া বকযন্ত্রে চুলাই করিয়া লইবে। চুলাই করিবার সময় এরূপ সাবধানতার সহিত জ্বাল দিতে হইবে, উহা যেন চুঁইয়া না যায়। চুলাই করিলে যে আরক বাহির হইবে, প্রতিদিন একবার করিয়া তাহা টাকে লাগাইলে নিশ্চয়ই টাকে চুল উঠিবে। এই ঔষধের নাম চুলের মধুজল। (Honey-water.)

---

* যে মাছিতে ব্লিষ্টার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

† শূকরের চর্ব্বি হইলেই ভাল হয়। অভাবে অন্য চর্ব্বি।

উপকরণ ও পরিমাণ

আলকাতরা	...	... ...	এক ভাগ।
চর্ব্বি	...	... ...	দশ ভাগ।

চর্ব্বি ও আলকাতরায় এক সঙ্গে মিশাইয়া তাহাতে পরিমাণ মত গন্ধ দ্রব্য দিয়া লইলেই ঔষধ প্রস্তুত হইল। টাকের উপর উহা ঘষিয়া দিতে হইবে।

উপকরণ ও পরিমাণ।

টিঞ্চার অফ ক্যান্থরাইডিস্	...	...	আধ ছটাক।
রম্	...	...	আধ সের।
জল	...	...	এক পোয়া।

উপরিলিখিত দ্রব্য কয়েকটী এক সঙ্গে মিশাইলে যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে, উহা সপ্তাহে দুইবার টাকের উপর মাখিলে আরাম হইবে।

এক দিন অন্তর টাকের উপর টিঞ্চার আইডিন্ দিলে উহা ভাল হয়। টাক যদি অধিক দিনের হয়; তবে চারি দিন অন্তর এক ছোপ করিয়া য়্যাসিটম্ ক্যান্থারইডিস্ মাখাইলে আরাম হইবে।

টাকের তৈল।

উপকরণ ও পরিমাণ।

ওলিভ বা সুইট অয়েল	...	...	আধ সের।
জলপাই কিম্বা বাদাম তৈল	...	...	আধ সের।
ওরিগেনম্	...	...	আধ কাঁচ্চা।
রোজম্যারি অয়েল	...	...	ষাইট ফোঁটা।
ইংলিস্ ল্যাবেণ্ডার তৈল	...	...	চল্লিশ ফোঁটা।

উপরের লিখিত দ্রব্য সমূহ এক সঙ্গে মিশাইলে টাকের চমৎকার ঔষধ প্রস্তুত হইবে। এই তৈল টাকের উপর মাখিলে উহা ভাল হয়।

লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিলে চুলের গোড়া শক্ত হয় সুতরাং

চুল আর উঠিয়া যায় না এবং উহা অত্যন্ত ঘন হয়। এই তৈলের ন্যায় ম্যাকাসার অয়েল দ্বারাও বিস্তর উপকার হইতে দেখা গিয়াছে।

জ্বরাদি রোগে কেশ-হীনতা হইলে শীতল জলে সাবান দ্বারা মস্তক ধৌত করিলে অল্প দিনের মধ্যে চুল উঠিয়া থাকে।

প্রতিদিন স্নানের পর একখানি টুয়ালে (খস্‌খসে গোছের) টাকের উপর ঘষিতে হইবে। এই সহজ উপায়েও অনেকের টাক ভাল হইতে দেখা গিয়াছে।

টাকের যে সকল ঔষধ লিখিত হইল, তৎসমুদায় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায় এবং মূল্যও অধিক নহে। অতএব প্রত্যেক কেশ-হীন ব্যক্তি এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া কেশ হীনতার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

কেশ মস্তকের প্রধান শোভা সুতরাং উহার অভাবে দেখিতে অত্যন্ত কদর্য্য দেখায়। বিশেষতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে উহা বাস্তবিকই অশোভাকর। এদেশে রমণীগণের মধ্যে অনেকেরই সিঁতির চুল উঠিয়া যাইতে দেখা যায়। সিন্দূর ব্যবহার যে উহার একটী কারণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। চুল অত্যন্ত আঁটিয়া অর্থাৎ টান্ টান্ করিয়া খোপা বাঁধিলেও ক্রমে ক্রমে চুলের গোড়া আল্‌গা হইয়া পরিশেষে টাকরূপে পরিণত হয়। পাঁরদ দোষেও অনেকের চুল উঠিয়া যায়।

যে সকল দ্রব্য দ্বারা চামড়া টাটাইয়া উঠে। তৎসমুদায় প্রায়ই টাকের ঔষধ। এই জন্য এদেশে টাকের উপর বিছুটীর ফল এবং পিয়াজের রস ঘষিতে দেখা যায়। যে সকল ঔষধের কথা লিখিত হইল তদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার ঔষধ আছে, কিন্তু লিখিত ঔষধগুলি ব্যবহার করিলে, তৎসমুদায়ের প্রায় ব্যবহার প্রয়োজন হয় না।

কণ্টকারী অর্থাৎ কাঁটানোটে গাছের মূল শিকড়ের রস অথবা তাহা বাটিয়া গায়ে মাখিলে এবং প্রতিদিন অল্প পরিমাণে সেবন করিলেও পারার দোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

পুরাতন দেশী কুমড়ার জল গায়ে মাখিলে এবং প্রতিদিন এক ছটাক পরিমাণে সেবন করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

উকুন মারিবার উপায়—পানের রস মাথায় মাখিলে উহা নষ্ট হইয়া থাকে।

মাথায় কর্পূর মাখিলেও মরিয়া যায়।

মাথায় সাবান ফেনাইয়া দিয়া খুব সোরু চিরুনী দ্বারা তিন চারি দিন আঁচড়াইতে আরম্ভ করিলেও উহা বাহির হইয়া থাকে।

স্তন্য দুগ্ধ—ভুঁইকুমড়ার মূল বাটিয়া গব্য দুগ্ধের সহিত পান করিলে স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মহাসুন্দরী নামক গাছের মূল সেবন করিলেও উহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ছুঁচার বিষ—আমরুল নামক শাকের প্রলেপ গায়ে মাখিলে এবং উহা আহার করিলেও এই বিষ নষ্ট হয়।

বিছার বিষ—দুর্ব্বা ঘাসের মূল বাটিয়া আহার করিলে জ্বালা ঘুচিয়া যায়।

কাটা ঘা—খয়ের গুঁড়াইয়া ঘায়ের উপর দেও শুকাইয়া আসিবে।

হরিদ্রা বাটা দিলেও ঐরূপ উপকার হইয়া থাকে।

কেশরাজ নামক গাছ বাটিয়া প্রলেপ দিলেও কাটা ঘা আরাম হয়।

মৌমাছির দংশন—সৈন্ধব নামক লবণ প্রলেপ দিলে জ্বালা ভাল হয়।

ফোড়া—ফোড়া বসাইতে হইলে যতটা স্থান চাপ লইয়া উঠিবার উপক্রম হয়, সেই স্থান ব্যাপিয়া গোলমরিচ জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যাইবে।

বিবিধ তত্ত্ব।

একটী সূঁচ দাঁতে কামড়াইয়া রাখিয়া পিয়াজ কুটিলে তাহার ঝাঁজে চোক দিয়া জল পড়ে না এবং চোকে জ্বালা হয় না।

আরসলা।—বাক্স ও আলমারি প্রভৃতিতে আরসুলার উৎপাত হইলে, এক চাপ কর্পূর রাখিলে উহারা তথায় গমন করে না।

অয়েল পেইণ্টের ছবি পরিষ্কার।

ঘোড়া কিম্বা গোরুর অধিক দিনের মূত্রে একটু পাঙ্গা লবণ মিশাইয়া তদ্দারা একখানি পশমী নেকড়া ভিজাও। এখন সেই নেকড়াখানি লইয়া ছবি পুঁছিতে থাক, যখন দেখা যাইবে, উহা বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। তখন এক খণ্ড স্পঞ্জ পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া উহা বেশ করিয়া ধৌত কর। ছবিখানি শুষ্ক হইলে পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ঘষিয়া লইলেই ছবির নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইবে।

অশ্বের উচ্চতা।—নবপ্রসূত অশ্বশাবকের খুর হইতে জানু পর্য্যন্ত মাপিলে যত হয়, পরিণত বয়সে অশ্ব প্রায় তাহার তিন গুণ উচ্চ হইয়া থাকে।*

কলার আবাদ।—এক হাত অন্তর আধ হাত খাই।

কলা পোঁতগে চাষা ভাই॥
কলা পুঁতে না কেট পাত।
তাইতে কাপড় তাইতে ভাত॥

কলাগাছ রোপণ সম্বন্ধে খোনার এই বচনটী অনেক দিন হইতে চলিত আছে। গৃহস্থদিগের উহার অর্থ জানিয়া রাখা আবশ্যক। এক হাত অন্তর অন্তর এবং আধ হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া কলাগাছ পুতিতে হয়। এইরূপ নিয়মে গাছ রোপণ করিয়া যদি তাহার পাতা কাটা না যায় তবে তদ্দারা গৃহস্থগণের বিলক্ষণ লাভের সম্ভব। কলার পাতা কাটিলে গাছের বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে এবং শীঘ্র ফলন হয় না।

* অশ্বতত্ত্ব দেখ।

দেওয়ালের প্রস্থ নির্ণয় ।

গৃহাদি নির্ম্মাণকালে, দেওয়াল পাছে অপ্রশস্থ হইয়া গৃহ ... হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা যেরূপ আবশ্যক, উহা অনাবশ্যক ... চৌড়া করিয়া, যাহাতে অনর্থ ব্যয় বৃদ্ধি না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি ... সেইরূপ প্রয়োজনীয়। গৃহের সকল দেওয়াল সমান চৌড়া ... আবশ্যক হয় না। কোন্ দেওয়ালে কিরূপ ভার পড়িবে, ইত্যাদি ... বিবেচনা করিয়া উহার প্রস্থ ... দিতে হয়। স্থপতি বিদ্যায় বিশে... পারদর্শিতা না থাকিলে, সূক্ষ্ম গণনা ... প্রত্যেক দেওয়ালের প্রস্থ নি... করা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ গৃহস্থই, এঞ্জিনিয়রের সাহায্য না লই... আপনারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্য আম... নিম্নে, দেওয়ালের প্রস্থ নির্ণয়ের কয়েকটী সহজ উপায় লিখিতেছি।

অপ্রশস্থ দেওয়াল দুই প্রকারে নষ্ট হইতে পারে। ১ম—সম্যক ... না থাকায়, উল্টাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে এবং ২য়—উপরিস্থ ... বহনে অসমর্থ হওয়ায়, ইহার ইষ্টকাদি গুঁড়া হইয়া যাইতে পারে। সাধারণ গৃহাদিতে দ্বিতীয় কারণটী ঘটিবার প্রায় সম্ভব থাকে না। বড় বড় গুম্বজ বা অন্য কোনরূপ গুরুতর ভার উপরে না থাকিলে ইট্ গুঁড়া হইয়া দেওয়াল পড়িবার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। বা... গৃহাদির অপ্রশস্থ দেওয়াল, প্রথম কারণে-ই প্রায় পড়িয়া যায়।

সাধারণ বাসগৃহাদির দেওয়াল যখন দ্বিতীয় কারণে ভাঙ্গিবার স... নাই, তখন কেবল এইমাত্র, দেখিলেই যথেষ্ট হইল যে, ... কত চৌড়া করিলে প্রথম কারণে (অর্থাৎ উল্টাইয়া) পড়িয়া না যায়।

যে "বল" (Force) দেওয়ালটীকে উল্টাইয়া ফেলিবার চেষ্টা ক... উহা দেওয়ালের উচ্চতা এবং ইহার উপরিস্থ ভারের ন্যূনাধিক্য অনু... সারে, কম বা অধিক হইয়া থাকে *। দেওয়ালের উপরিস্থ ভার...

* সাধারণ গৃহের কথায় বলিতেছি। নতুবা অন্যান্য অনেক কার... আছে যদ্দারা এই বলের বৃদ্ধি [illegible] থাকে।

হের উচ্চতা ও প্রস্থের উপর নির্ভর করে; কারণ দেওয়াল যত উচ্চ
বে, উহার গাঁথনি তত বৃদ্ধি হওয়ায়, উহার গুরুত্বও সেই পরিমাণ
দ্ধি পাইবে, যেহেতু প্রত্যেক দেওয়ালকে (যাহার উপর ছাদের কড়ি
কে) ইহার উভয় পার্শ্বের ছাদের অর্দ্ধেক ভার বহন করিতে হয়;
ত যত অধিক প্রশস্ত হইবে, দেওয়ালকে তত অধিক ভার বহন করিতে
ইবে। এক্ষণে যখন স্থির হইল যে, দেওয়ালের উপরিস্থ ভার, গৃহের
চ্চতা এবং প্রস্থের উপর নির্ভর করে, এবং উপরোক্ত "বল" টী যখন
ওয়ালের উচ্চতা—এবং ইহার উপরিস্থ ভার সাপেক্ষ, তখন উক্ত বলের
স বৃদ্ধি, গৃহের উচ্চতা এবং প্রস্থের ন্যূনাধিক্য অনুসারে হইয়া থাকে;
তরাং গৃহ যত অধিক উচ্চ এবং প্রশস্থ হইবে, উপরোক্ত বলের বেগ
তিহত করিবার জন্য, দেওয়ালের প্রস্থও সেই পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে
ইবে। ঝটিকাদি দ্বারাও দেওয়াল পড়িয়া যাইতে পারে; এই জন্য
ওয়ালের প্রস্থ স্থির করিবার সময় এই সকল কারণে, কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া
ওয়া উচিত।

গৃহের দেওয়ালগুলি ছাদ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে
পর দেওয়ালের ঠেসে থাকায়, পরস্পরের সাহায্যে, ইহাদের বল
ধিকতর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইজন্য সমান উচ্চ গৃহের দেওয়াল এবং
াদা (Plain) প্রাচীর এই উভয়ের মধ্যে, প্রাচীরের প্রস্থ কিঞ্চিৎ
ধিক হওয়া উচিত। যদি ইট, চুণ, সুরকি ও গাঁথনি ভাল হয, তাহা
ইলে সাধারণতঃ যেরূপ দীর্ঘ হইয়া থাকে সেইরূপ প্রাচীরের প্রস্থ
হার উচ্চতার $\frac{1}{9}$ অংশ করিলেই চলিতে পারে। অর্থাৎ নয় ফুট উচ্চ
ইলে উহার প্রস্থ এক ফুট করিতে হয়। কিন্তু যদি মাঝে মাঝে
স গাঁথা থাকে তাহা হইলে, ঐ প্রস্থ আরও কমাইতে পারা যায়।
মাইবার নিয়ম এইরূপ প্রাচীরের উচ্চতার এবং দুইটী নিকটবর্ত্তী
ঠসের মধ্যস্থিত দৈর্ঘ্যের বর্গফল স্থির কর। ঐ দুই বর্গফলের সমষ্টির
বর্গমূল নির্ণয় কর। একটী ঠেসের গোড়া এবং অপর ঠেসের অগ্রভাগ,
এই উভয় বিন্দুর সংযোজক সরল রেখাকে আমরা কর্ণ বলিব। উপরোক্ত

বর্গমূল দ্বারা এই কর্ণের দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইল। এক্ষণে উচিত অংশ লইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাচীরের প্রস্থ স্থির কর। ঐ প্রস্থকে ঠেসের মধ্যস্থিত দৈর্ঘ্য দ্বারা গুণ করিয়া, উক্ত কর্ণ দ্বারা ভাগ করি প্রাচীরের প্রস্থ নিরূপিত হইল। যথা মনে কর একটী প্রাচীরের উ ৯ ফুট এবং উহাতে প্রতি ১২ ফুট অন্তর এক একটী দৃঢ় ঠেস অ উহার প্রস্থ কত হইবে?

$$কর্ণ = \sqrt{৯^২ + ১২^২}$$
$$= \sqrt{৮১ + ১৪৪}$$
$$= \sqrt{২২৫} = ১৫ \text{ ফুট}$$

সুতরাং দেওয়ালের প্রস্থ $= \frac{৯}{৯} \times \frac{১২}{১৫} = \frac{৪}{৫}$ ফুট $=$ ১০ ইঞ্চ (প্রায়)

যদি ঠেস না থাকিত তাহা হইলে উক্ত প্রাচীরের প্রস্থ পূ নিয়মানুসারে $\frac{৯}{৯} = ১$ ফুট করিতে হইত।

প্রাচীর যদি একটানা না গাঁথিয়া, বহুভুজ ক্ষেত্রাকারে গাঁথা তাহা হইলে ইহার প্রত্যেক বাহুর উভয় পার্শ্বের বাহুদ্বয়, ঠেসের কার্য্য করে; সুতরাং একটানা প্রাচীরের প্রস্থ অপেক্ষা এইরূপ প্রাচ প্রস্থ, ঠেসযুক্ত প্রাচীরের নিয়মানুসারে কম করিতে পারা যায়। একটী অসংখ্য ভুজবিশিষ্ট ক্ষেত্র। সুতরাং বৃত্তাকার বা গোল প্রাচী প্রত্যেক বিন্দুর উভয় পার্শ্বের বিন্দুদ্বয় ঠেসের ন্যায় কার্য্য করে। এই নিতান্ত কাছাকাছি ঠেস দিয়া একটানা প্রাচীর গাঁথিলে, উহার অতি সামান্য প্রস্থের আবশ্যক হয়, গোল প্রাচীর, সাদা (Pl গাঁথিলেও, উহার প্রস্থ সেইরূপ কম করিলে চলিতে পারে। গোল প্রাচীরের প্রস্থ, অপরাপর সকল আকারের প্রাচীরের প্রস্থ অ অনেক কম করিতে পারা যায়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, গৃহাদির দেওয়াল সকল, পরস্পর পরস্প সাহায্য করায়, উহাদের প্রস্থ, প্রাচীরাদি খোলা দেওয়ালের প্রস্থ অ অপেক্ষাকৃত কম করিলে চলিতে পারে। বাস গৃহাদি, প্রায় বিভিন্ন বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রতিতলের দেওয়ালের প্রস্থ, উহার উপরের ত

ালের প্রস্থ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হওয়া আবশ্যক। উক্ত প্রস্থ নির্ণয় বার নিয়ম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

প্রথম তলের দেওয়ালের প্রস্থ নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত তলের হইতে, সকলের উপর তলের ছাদ পর্য্যন্ত উচ্চতা স্থির করিয়া র অংশ গ্রহণ কর। অনন্তর ঐ অংশকে ঘরের প্রস্থ দিয়া গুণ কর। উক্ত উচ্চতার বর্গফল এবং ঘরের প্রস্থের বর্গফল, এই উভয়ের র বর্গমূল দ্বারা উক্ত গুণ-ফলকে ভাগ করিলে, সেই ভাগফলই প্রথম র দেওয়ালের প্রস্থ হইবে।

দ্বিতীয় তলের দেওয়ালের প্রস্থ নিরূপণ করিতে হইলে, ঐ তলের মেঝে, ং প্রথম তলের ছাদ হইতে সকলের উপর তলের ছাদ পর্য্যন্ত উচ্চতা করিয়া, উপরোক্ত নিয়মানুসারে দেওয়ালের প্রস্থ গণনা কর। তৃতীয় াহার উপরের তল সকলের দেওয়ালের প্রস্থ গণনা করিবার নিয়মও ণ। ক্রমশঃ উক্ত উচ্চতা কম হওয়ায়, দেওয়ালের প্রস্থও ক্রমে য়া আইসে।

উদাহরণ। একটী তৃতল বাটীর দেওয়ালের প্রস্থ নিরূপণ করিতে ব। মনে কর উহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলের উচ্চতা, যথাক্রমে ফুট, ১৫ ফুট ও ১৪ ফুট এবং উহার ঘরের প্রস্থ ১৪ ফুট।

প্রথম তলের মেঝে হইতে তৃতীয় তলের ছাদ পর্য্যন্ত সমস্ত উচ্চতা ৬+১৫+১৪=৪৫ ফুট।

সুতরাং প্রথম তলের দেওয়ালের প্রস্থ, উপরোক্ত নিয়মানুসারে

$$=\frac{৪৫}{৭}\times\frac{১৪}{\sqrt{৪৫^{২}\times১৪^{২}}}$$

$$=\frac{৪৫}{৭}\times\frac{১৪}{৪৭.১}=\frac{৯০}{৪৭.১}$$

$$=১.৯১ \text{ ফুট}=১ \text{ ফুট } ১১ \text{ ইঞ্চ}$$

দ্বিতীয় তলের মেঝে, অর্থাৎ প্রথম তলের ছাদ হইতে, তৃতীয় তলের পর্য্যন্ত, দেওয়ালের উচ্চতা = ১৫+১৪=২৯ ফুট

সুতরাং উল্লিখিত নিয়মানুসারে, দ্বিতীয় তলের দেওয়ালের

$$= \frac{২৯}{৭} \times \frac{১৪}{\sqrt{২৯^২ + ১৪^২}}$$

$$= \frac{২৯}{৭} \times \frac{১৪}{৩২.^২} = \frac{৫৮}{৩২.^১}$$

$$= ১.৭ \text{ ফুট} = ১ \text{ ফুট } ৮ \text{ ইঞ্চ}$$

তৃতীয় তলের মেঝে হইতে উহার ছাদ = ১৪ ফুট

সুতরাং তৃতীয় তলের দেওয়ালের প্রস্থ

$$= \frac{১৪}{৭} \times \frac{১৪}{\sqrt{১৪^২ + ১৪^২}}$$

$$= \frac{২৮}{১৯.৮} = ১.৪ \text{ ফুট}$$

$$= ১ \text{ ফুট } ৪ \text{ ইঞ্চ}$$

দেওয়ালের প্রস্থ, ইটের মাপ অনুসারে করা উচিত; অর্থাৎ উহা (করা আবশ্যক যেন উহা আধ, এক, দেড়, দুই, আড়াই, ইত্যাদি প্র ইট্ দ্বারা ঠিক্ ঠিক্ মিলিয়া যায়। ইহার অন্যথা করিলে, দেওয়ালের ভি ডেরি বা টুকুরা ইট্ দিতে হয় এবং তাহাতে দেওয়ালের দৃঢ়তা কমিয়া য যে দেওয়ালের প্রস্থ এরূপ যে, উহাতে দুই ইট্ খাইয়াও ভিতরে টু ইট্ দিতে হইয়াছে, উহা যদিও দুই ইটের দেওয়াল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অ চৌড়া, কিন্তু টুকরা ইট্ দ্বারা, গাঁথিতে বাঁধনের দোষ ঘটায়, শে দেওয়ালটী প্রথমোক্ত অপেক্ষা অধিক দৃঢ়।

উল্লিখিত কারণে, উপরোক্ত নিয়ম দ্বারা, দেওয়ালের প্রস্থ নির্ণয় ক ইটের পরিমাণ অনুসারে, উহার কিঞ্চিৎ কম বেশী করিয়া লওয়া উচিত। কর ১০ × ৫ × ৩ পরিমাণের ইট্ দ্বারা গাঁথিতে হইবে। উপরোক্ত উদাহ প্রথম তলের দেওয়ালের প্রস্থ ১ ফুট ১১ ইঞ্চ স্থির হইয়াছে। কিন্তু ইটের মাপে, ১ ফুট ১১ ইঞ্চ প্রস্থ হয় না। ১ ফুট ৮ ইঞ্চ অর্থাৎ দুইখানি পরিমিত, অথবা ২ ফুট ১ ইঞ্চ অর্থাৎ আড়াইখানি ইটের মাপ হইতে পা ১ ফুট ১১ ইঞ্চ স্থলে ১ ফুট ৮ ইঞ্চ দেওয়া উচিত নহে, ২ ফুট ৮ ইঞ্চ

হয়। এই জন্য উপরোক্ত উদাহরণের প্রথম তলের দেওয়ালের প্রস্থ
ইট্ পরিমিত করা উচিত। ঐ উদাহরণে দ্বিতীয় তলের দেওয়াল ১ ফুট
চৌড়া নির্ণীত হইয়াছে। উহা ঠিক্ দুই ইট্ পরিমিত। অতএব দ্বিতীয়
র দেওয়াল দুই ইট্ পরিমিত প্রস্থ করা উচিত। তৃতীয় তলের দেওয়াল
১ ফুট ৪ ইঞ্চ চৌড়া স্থির হইয়াছে। ১ ফুট ৩ ইঞ্চ ঠিক্ দেড় ইট্
মিত। অতএব ঐ দেওয়াল দেড় ইট্ চৌড়া করা উচিত।

দেওয়ালের প্রস্থ নির্ণয় করিবার যে নিয়ম উপরে লিখিত হইল, উহা
রণ পাকা গাঁথনির পক্ষে। পগ্‌মিলের ভাল ইট্ এবং উৎকৃষ্ট
মসলা হইলে, দেওয়ালের প্রস্থ আরও কম করিতে পারা যায়। এইরূপ
য়ালের প্রস্থ নিরূপণ করিতে হইলে উল্লিখিত নিয়মানুসারে সমুদায়
তে হইবে, কেবল উচ্চতায় ১/২৪ অংশ না লইয়া, ১/৩০ বা ১/৩৬ অংশ লইতে
য়।

গৃহের দেওয়াল ১ ফুট ৩ ইঞ্চ অর্থাৎ দেড় ইট্ অপেক্ষা কম চৌড়া করা
ত নহে। দেওয়ালের প্রস্থ নিরূপণকালে এইটী স্মরণ রাখা উচিত
সকলের উপর তলের দেওয়াল, দেড় ইট্ অপেক্ষা কম চৌড়া না হয়।
গাঁথনি হইলে এক ইটে্‌র ভিতেও চলিতে পারে, কিন্তু দেড় ইটে্‌র
ল ভাল হয়।

ঘরের যে সকল দেওয়ালের উপর কড়িকাষ্ঠ না থাকে, তাহাদের প্রস্থ
ক্ষাকৃত কম করিলে চলিতে পারে। উহারা আপনাদিগের ভার
চ্চতায় পড়িয়া না যায়, এরূপ চৌড়া করিলেই যথেষ্ট হইল। এই সকল
য়ালের প্রস্থ নিরূপণ করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে প্রস্থ স্থির
য়া উহার ১/৬ বা ১/৪ অংশ কমাইয়া লইলেই চলিতে পারে। কিন্তু
টা ঠিক ইটের মাপে হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে, প্রথম
ার দেওয়ালের প্রস্থ ১ ফুট ১১ ইঞ্চ নির্ণীত হইয়াছে। অতএব ঐ
ার এড়ো দেওয়ালের প্রস্থ, ১ ১১"—১ ১১"—১ ফুট ৭ ইঞ্চ অর্থাৎ দুই
পরিমিত হইবে।

অনেকে "কাঁচা পাকা" গাথুনি, অর্থাৎ পাকা ইট্, কাদা দ্বারা গাঁথিয়া

থাকেন। এরূপ দেওয়ালের প্রস্থ, পাকা দেওয়ালের প্রস্থ অপেক্ষা ½ ব
অংশ অধিক করা উচিত। অর্থাৎ যেখানে পাকা দেওয়াল আং
ইট পরিমিত করা আবশ্যক, সেখানে (কাঁচা পাকা) দেওয়াল তিন
চৌড়া করিতে হইবে।

জল রাখিবার জন্য অনেকে চৌবাচ্ছা গাঁথাইয়া থাকেন। চৌ
চ্চার দেওয়ালের প্রস্থ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে স্থির করিলে ঠিক্ হয় ন
তরল পদার্থ আপনা আপনিই ছড়াইয়া পড়ে। উহার ঐ গতি
রোধ করিবার জন্য, চৌবাচ্চায় দেওয়ালের অধিক বলের, অর্থাৎ অ
প্রস্থের আবশ্যক। বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় বা বড় বড় খালাদির স্থির
পাকা দেওয়াল দ্বারা আটকাইয়া রাখিতে হইলে, ঐ দেওয়ালের প্র
জলের গভীরতা অর্থাৎ দেওয়ালের উচ্চতার ⅓ অংশ করিলেই যথেষ্ট হ
যদি ঐ দেওয়ালে মাঝে মাঝে ঠেস গাঁথা যায়, তাহা হইলে ঐ
দেওয়ালের বলের খর্ব্বতা না করিয়া, আরও কমাইতে পারা যায়। স্নান
করিবার জন্য, সাধারণতঃ যেরূপ চৌবাচ্চা প্রস্তুত করা যায়, উ
প্রান্তের এড়ো দেওয়ালের ঠেসে থাকায়, উহার প্রত্যেক দেওয়ালের (ব
অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং তজ্জন্য উপরোক্ত নিয়মানুসারে উ
চৌড়া করিবার আবশ্যক নাই। যে সকল চৌবাচ্চা দশ, বার ফু
অধিক লম্বা নহে, উহাদের দেওয়ালের প্রস্থ, উচ্চতার ¼ অংশ করিলে
যথেষ্ঠ হইল। যে সমুদয় চৌবাচ্চা অধিকতর দীর্ঘায়তন, তাহা
দেওয়ালের প্রস্থ, চৌবাচ্চার গভীরতা অর্থাৎ দেওয়ালের উচ্চতার ½ অ
করিতে হয়।

চৌবাচ্চার জল পুরিয়া রাখিলে, ঐ জলের বাহির হইবার ব
বেগ, চৌবাচ্চার নিম্ন ভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে এবং
উপরে উঠা যায়, ততই ঐ বেগ কমিতে থাকে; সুতরাং চৌবাচ্চ
দেওয়ালের "বল" ঐ বেগ অবরোধ করিবার জন্য, নিম্ন ভাগেই অ
থাকা আবশ্যক এবং যত উপরে উঠা যায় ততই কমাইতে পারা যা
অর্থাৎ দেওয়ালের প্রস্থ গোড়ায় অধিক করিয়া উপরে যৎসাম

ং অৰ্দ্ধ ইট্ পরিমিত করিলেই চলিতে পারে। ঢালটী দেওয়ালের
ৰ্ভাগে দেওয়া উচিত। হিসাব মত, ঢালটী সরল রৈখিক না
য়া, প্যারাবোলা (Parabola) আকার কোর করিয়া দিলেই ভাল
কিন্তু এরূপ গাঁথিতে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় ও অভিজ্ঞতার
বশ্যক। এইজন্য উহা প্রায় সরল রৈখিক আকারে গাঁথা হইয়া থাকে।

পুরাতন দেওয়াল বা মৃত্তিকাদির ঠেস রাখিবার জন্য পোস্ত গাঁথিবার
বশ্যক হয়। "পোস্তর" প্রস্থ সাধারণ দেওয়ালের নিয়মে করিলে চলে
উহা অধিকতর চৌড়া করা আবশ্যক। উদ্যানাদির প্রাচীর নির্ম্মাণ
রতে হইলে, অনেক স্থানে প্রাচীরের বহির্ভাগে গভীর খানা বা পয়নালা
অপর দিকে বাগানের উচ্চ জমি থাকে। এরূপ প্রাচীরের
অংশ পয়নালার নিম্নভাগ এবং বাগানের মাটির উপরি ভাগের মধ্যে
:ক, তাহার প্রস্থ সাধারণ দেওয়ালের মত না করিয়া, পোস্ত দেওয়ালের
য়মানুসারে করিতে হয়। উহার উপরিভাগের প্রস্থ সাধারণ প্রাচীরের
য়মানুসারে করিতে হইবে। পোস্তর উদাহরণ স্বরূপ বাগানের প্রাচীরের
া যেরূপ লিখিত হইল, সেইরূপ অনেক স্থলে মাটির বা অন্য কোন
ব্যর ঠেস রাখিবার জন্য, অনেক গৃহস্থকে পোস্ত গাঁথিতে হয়। এইজন্য
াস্তর প্রস্থ নিরূপণ করিবার নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

মৃত্তিকাদি কোন স্থানে উঁচা করিয়া জড় করিয়া রাখিলে উহাদের
র্শ্বগুলি আপনা আপনি যেরূপ ঢালুভাবে থাকে, তাহাকে ঐ সকল দ্রব্যের
হৃতি" কোণ কহে। সকল দ্রব্যের "স্থিতি কোণ" সমান নহে। বালুকার
তি কোণ ৩৫½ ডিগ্রি সাধারণ মাটির স্থিতি কোণ ৪৬½ ডিগ্রি ইত্যাদি।
াস্তর প্রস্থ, উহা যে দ্রব্যের ঠেস রাখিবার জন্য নির্ম্মিত হয়, তাহার স্থিতি
াণও গুরুত্বের উপর নির্ভর করে—স্থিতি কোণ যত অধিক হইবে,
াস্তর প্রস্থ তত কম করিতে হইবে এবং উক্ত প্রস্থ যত ভারী হইবে ঐ
স্থ তত অধিক করিতে হইবে।

গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বালুকায় ঠেস রাখিতে হইলে,
াস্তর প্রস্থ, উহার উচ্চতা ⅓ অংশ করিতে হয় এবং সাধারণ মাটির

ঠেস রাখিতে হইলে, ঐ প্রস্থ উচ্চতায় ½ অংশ করিলেই চলে, অর্থাৎ চূণ, সুরকি ও ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত পোস্ত, বার ফুট উচ্চ হইলে, বালুকার বেলায় উহার প্রস্থ চারি ফুট এবং সাধারণ মাটির সময় তিন ফুট করিতে হইবে। যে দ্রব্যের ঠেস রাখিতে হইবে উহার উচ্চতা যদি পোস্তের উচ্চতা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রস্থ, ঐ অতিরিক্ত উচ্চতানুসারে, অপেক্ষাকৃত অধিক চৌড়া করা আবশ্যক। যে কারণে চৌবাচ্চাদির দেওয়াল ঢালুভাবে গাঁথা উচিত, সেই কারণে পোস্তের ভিতর দিক সোজা এবং বহির্ভাগ ঢালু করিয়া গাঁথিলে ভাল হয়।

কীট পতঙ্গাদির দংশন।

কীট, পতঙ্গ, সর্প এবং শৃগাল কুক্কুরাদির দংশন সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ কীটাদি চর্ম্মের উপর হুল ফুটাইয়া দেয়। ইহা দ্বারা জীবনের কোন অনিষ্ট আশঙ্কা থাকে না। তবে কতক পরিমাণে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। শরীরের মধ্যে সকল স্থানে হুল ফুটাইলে সমানরূপ কষ্টকর বোধ হয় না। শরীরের যে যে অংশ অত্যন্ত কোমল অর্থাৎ চোকের কোণ প্রভৃতি স্থান সমূহে হুল ফুটাইলে ঐ সকল স্থান ফুলিয়া উঠে এবং লাল হইয়া থাকে। কোন স্থানে হুল দৃ[illegible]লে একটী সোক স্থঁচের অগ্রভাগ অতি সাবধানতার সহিত তাহা তুলিয়া ফেলা উচিত। হুল তুলিয়া চা-খড়ি ও ওলিব অয়েল অথবা নারিকেল তৈল এক সঙ্গে গুলিয়া কাথের মত করিয়া সেই স্থানে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে।

হুল ফুটান স্থানে গরম তার্পিণ তৈল কিম্বা ভিনিগার দ্বারা ধৌত করিলেও তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার শান্তি হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার দংশনে চর্ম্মভেদ হয় না, কেবলমাত্র দষ্টস্থান লাল হইয়া উঠে, ইহাও তত ভয়ের বিষয় নহে; তৃতীয় প্রকার দংশনে চর্ম্ম ভেদ হইয়া রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। সুতরাং বিষাক্ত প্রাণীর দংশন হইলে বিশেষ

অমঙ্গলের আশঙ্কা। কোন্ কোন্ দংশনে কিরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভব এক্ষণে তাহার বিবরণ লিখিত হইতেছে। যে দংশনে শোণিত নিঃসৃত হয়, সেই দংশনে দষ্ট প্রাণীর বিষ রক্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শোণিত বিষাক্ত হইলেই জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে। এইজন্য ঐরূপ দংশন অত্যন্ত বিপদ-জনক মনে করা উচিত।

বিছা, মৌমাছি এবং বোল্‌তা প্রভৃতির দংশনে কোন কোন ব্যক্তি এবং শিশুগণ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে থাকে। দংশিত ব্যক্তির ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে তাহাকে স্থিরভাবে চীৎ-করাইয়া শয়ন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং জলের সহিত অল্প পরিমাণে ব্রাণ্ডি কিম্বা এমোনিয়া সেবন করাইলে দুর্ব্বলতা ঘুচিয়া যায়, রোগী সুস্থতা অনুভব করিতে থাকে।

মুখের ভিতর কোন প্রকারে কীটাদি দংশন করিলে সেস্থান অত্যন্ত ফুলিবার সম্ভব এবং তদ্দ্বারা দংশিত ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে থাকে, তজ্জন্য দষ্ট স্থানের বাহিরে জোঁক ধরাইলে সহজেই কষ্ট নিবারণ হইবার সম্ভব। জোঁক ছাড়িয়া পড়িলে সেই স্থানটী গরম জল দ্বারা ধৌত করিতে হয় এবং লবণ মিশ্রিত জল ভিতরে লাগাইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে বরফের টুকরা খাওয়াও ভাল।

শয়নের সময় অল্প পরিমাণে তৈল মাখিয়া শয়ন করিলে মশাদির দংশন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। উগ্রগন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের গন্ধে মশকাদি লাগে না।

অন্যান্য কীটাদির দংশনে ওডিকলন লাগাইলে আরাম হইয়া থাকে। যে সকল কীট পতঙ্গাদির দংশনে দষ্ট স্থান ফুলিয়া লাল হয়, রাত্রে সেই স্থানে মসিনার পুল্টিস এবং দিবসে শীতল জলের পটি দিলে কোন প্রকার কষ্ট থাকে না।

অপরিষ্কৃত স্থান সমূহেই কীটাদির অত্যন্ত আশঙ্কা। এজন্য বাসস্থান পরিষ্কার রাখিতে চেষ্টা করা উচিত।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেই কীট পতঙ্গ এবং সর্পাদির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে এজন্য ঐ সময়ে সতত সাবধানে থাকা আবশ্যক।

শৃগাল ও কুক্কুরাদির দংশন।

কীট পতঙ্গাদির দংশনে প্রাণের আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু কুক্কুর ও শৃগালাদির দংশন সেরূপ নহে, অনেক সময় ঐ সকল পশুর দংশনে মনুষ্যদিগকে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হয়। এজন্য যাহাতে ঐ সকল পশুর আক্রমণ হইতে কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তিগণ যদিও সাবধান হইতে পারেন, কিন্তু অবোধ বালক বালিকাদিগকে সাবধান করা কঠিন। এজন্য পল্লী মধ্যে দুষ্ট কুক্কুর থাকিলে মারিয়া ফেলা উচিত।

শৃগাল ও কুক্কুরাদিতে দংশন করিলেই যে বিপদজনক হইয়া থাকে এরূপ মনে করা উচিত নহে। যে সকল পশু ক্ষিপ্ত অর্থাৎ হন্নে হইয়া থাকে, তাহাদিগের দংশনই গুরুতর আশঙ্কার কারণ। ক্ষিপ্ত ভিন্ন সহজ দংশনে প্রায়ই কোন অপকার ঘটেনা। যে দংশনে চর্ম্মভেদ করিয়া দন্ত প্রবিষ্ট হয়, তদ্দ্বারা বিপদ ঘটিবার সম্ভব।

সামান্য দংশনে অর্থাৎ চর্ম্ম ভেদ না হইলে শীতল জল দ্বারা সেই স্থান ধৌত করা উচিত। কুক্কুরাদির দংশন-জনিত ক্ষত শীঘ্র শুকাইতে দেওয়া ভাল নহে। বরং সেই স্থানে ঘা করিয়া রাখিলে ভাল হয়। মটর ও শিমাদি বাটিয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিলে শীঘ্র ঘা শুকায় না। কিছুদিন পরে মলম দিলে উহা শুকাইয়া যায়। দষ্ট স্থানে পশুর দাঁত বসিলে কিম্বা রক্ত স্রাব হইলে অথবা কেবলমাত্র ছাল উঠিলে শীতল জলের পটি দেওয়া আবশ্যক।

যে সকল পশু ক্ষিপ্ত বলিয়া আশঙ্কা থাকে, তাহাদিগের দংশন বিশেষ অনিষ্ট-জনক মনে করা উচিত। এজন্য দংশনমাত্রেই নাইট্রিক য়্যাসিড্ একটী কাটি কিম্বা কাঁচের ডাঁটি করিয়া ঐ স্থানে

ঘষিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। লৌহ অত্যন্ত গরম করিয়া তদ্দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়াও ভাল। গরম গরম পুল্টিস দিলেও উপকার হইয়া থাকে। আশঙ্কা বশতঃ রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে অল্প পরিমাণে ব্রাণ্ডি গরম জলে মিশাইয়া সেবন করিলে সবল হইয়া উঠে। ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদিতে দংশন করিলে দষ্ট ব্যক্তির অধিক চলাফেরা করা ভাল নহে।

সর্প দংশনের ন্যায় ক্ষিপ্ত কুক্কুর ও শৃগালাদির দংশন অত্যন্ত ভয়ানক। কারণ তদ্দ্বারা প্রায়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদির দংশনে এক প্রকার রোগ জন্মে, সেই রোগের নাম জলাতঙ্ক। অর্থাৎ রোগী জল দেখিলেই ক্ষেপিয়া উঠে। কখন কখন উন্মত্তবৎ জোর করিতে থাকে, কখন কখন চীৎকার করিয়া উঠে, কোন প্রকার চক্‌চকে জিনিষ দেখিলে ভয় পায়। কখন কখন নিকটবর্ত্তী মনুষ্যদিগকে হাঁচড়াইতে ও কামড়াইতে উদ্যত হয়, কখন কখন একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়ে, কখন কখন নানা প্রকার প্রলাপ বকিতে থাকে, চোক মুখের একপ্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এই সকল লক্ষণের পর রোগী মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে।

জলাতঙ্ক রোগের উপযুক্ত ঔষধ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। ক্ষিপ্ত পশুর বিষ রক্তে সঞ্চারিত হইলে যদিও রোগী বাঁচে না, তবে যত প্রকার উপায় আছে, সেই সকল উপায় অনুসারে চিকিৎসা করা উচিত।

ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদিতে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ দষ্ট স্থানের উপর খুব কসিয়া বাঁধা আবশ্যক, বন্ধনের উদ্দেশ্য এই যে, বিষ শরীরের অন্যান্য ভাগে সঞ্চারিত হইতে পারে না। বন্ধন করিয়াই দষ্ট স্থান হয় কাটিয়া কিম্বা পুড়াইয়া দেওয়া ভাল। যতক্ষণ কাটা অথবা পোড়ান না হয়, ততক্ষণ বন্ধন খুলিয়া দেওয়া উচিত নহে।

কোন কোন বহুদর্শী চিকিৎসকের মতে কাটা ও পোড়া অপেক্ষা দষ্টস্থানে কাষ্টিক উত্তমরূপে ঘষিয়া দেওয়ায় অধিক উপকার হইবার সম্ভব। কারণ ভালরূপে কাষ্টিক ঘষিলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্থান সমূহও

পুড়িয়া যাইতে পারে। ফলকথা দংশনমাত্রেই যাহাতে বিষ বাহির করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করাই প্রধান চিকিৎসা।

কখন কখন এরূপও ঘটিয়া থাকে যে, ক্ষিপ্ত ব্যক্তির নখ ও দন্তাঘাতে অন্যেরও জলাতঙ্ক রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদির ন্যায় ক্ষিপ্ত বিড়ালের দংশনেও মৃত্যু ঘটিবার সম্ভব।

গ্রাম কিম্বা পল্লী মধ্যে ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদি দেখিলে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদি দেখিলেই তাহাদিগের উন্মত্ততা বুঝিতে পারা যায়। ক্ষেপার অবস্থায় তাহারা প্রায়ই এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায়, গতির স্থিরতা থাকে না, মুখ ব্যাদন করিয়া থাকে। মুখ হইতে লালা নির্গত হয়, চোকের দৃষ্টি বিকৃত হয়, লেজ ভাঙিয়া পড়ে। এই সকল লক্ষণাক্রান্ত কুক্কুরাদি দেখিলেই সাবধান হওয়া উচিত। এই সময় প্রত্যেক গৃহস্থকেই বালক বালিকাদিগকে যথেচ্ছভাবে গৃহের বাহিরে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

সর্পাঘাত।

যত প্রকার প্রাণির দংশন হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্প দংশন যার পর-নাই বিপদের বিষয়। সর্প বিষের এরূপ শক্তি যে, অল্প সময়ের মধ্যে হতজ্ঞান করিয়া জীবন নষ্ট করিয়া থাকে। এজন্য সর্পকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিবেচনা করিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে সাবধান থাকা উচিত।

সকল জাতীয় সর্প দংশনে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। যে সকল সর্প বিষ ধারণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের দংশনই ভয়ানক এস্থানে ইহাও জানা আবশ্যক, বিষধর সর্প দংশন করিলেই যে অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে এরূপও নহে। যে দংশনে শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হয়, সেই দংশনই বিপদ জনক

সর্পের মুখ-মধ্যে দুই কষে বিষদন্ত থাকে, সর্প রাগান্বিত হইয়া দংশন করিলে দষ্ট স্থানে বিষ পতিত হয়, সেই বিষ রক্তে মিশিত হইয়া মহা অনিষ্ট করিয়া তুলে। ফলতঃ যে দংশনে শরীরে বিষ সঞ্চার না হয় সে দংশনে কোন প্রকার আশঙ্কা থাকে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সর্পাঘাত যার-পর-নাই বিপদের বিষয়। এজন্য দংশনমাত্রই বিশেষরূপ সতর্ক হইয়া চিকিৎসাতে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। সর্পাঘাতে যত প্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে একটী বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা গুরুতর কর্ত্তব্য; অর্থাৎ যাহাতে বিষ রক্তের সহিত সংযোগ হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এজন্য দংশন স্থান যত শীঘ্র কাটিয়া ফেলা যায়, তাহার ব্যবস্থা করাই প্রধান চিকিৎসা।

দষ্ট স্থান কাটিবার পূর্ব্বে আর একটী কথা মনে রাখিলে ভাল হয়, অর্থাৎ যে স্থানে দংশন করিবে, তাহার কিছু উপরে অত্যন্ত কসিয়া বাঁধিতে হইবে। যদি সেই সময় হটাৎ বাঁধিবার উপকরণ সংগ্রহ হইয়া না উঠে, তবে হয় রুমাল কিম্বা কাপড়ের পাইড় বা ফালি ছিঁড়িয়া অথবা দড়ি প্রভৃতি যাহা সর্ব্বাগ্রে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা বাঁধা প্রশস্ত। দংশন সময় হইতে এক মুহুর্ত্তও বৃথা নষ্ট করা উচিত নহে। এ দেশে সর্প চিকিৎসকগণ যে নিয়মে দংষ্ট স্থান বাঁধিয়া থাকেন, তাহা অত্যন্ত উপকার-জনক। তাঁহারা দুইটী বন্ধন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রথমটী দষ্ট স্থানের কিছু উপরে দ্বিতীয় বন্ধন আবার তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে। দুইটী বন্ধনের কারণ এই যে প্রথম বন্ধনে যদি বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া উপরে উঠিতে থাকে, এই আশঙ্কায় তাহার উপরে আবার আর একটী বন্ধন দিয়া থাকেন। বাস্তবিক সর্পবিষ যেরূপ প্রাণ-নাশক, তাহাতে ঐরূপ বন্ধন যার-পর-নাই দূরদর্শীতার কার্য্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বন্ধন যত কসিয়া বাঁধা হয়, তাহাই উত্তম। এজন্য বন্ধন রজ্জু প্রভৃতির মধ্যে একটী কাটি কিম্বা কোন রকম লম্বা গাছের একটী দণ্ড পরাইয়া পাক দিয়া লইলে ঐ বন্ধন অত্যন্ত আটিয়া বসিবে, কোন স্থানে একটুও শিথিল অর্থাৎ ঢিলা হইবে না। বন্ধন ঢিলা হইলে তাহার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

দষ্ট স্থান উল্লিখিতরূপে বন্ধন করিয়া হয় কাটিয়া কিম্বা চুষিয়া বিষ বাহির করা ভাল। চুষা সম্বন্ধে একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক. অর্থাৎ যাহাদের মুখের ভিতরও দন্ত-মূল প্রভৃতি যদি কোন স্থানে ক্ষত থাকে কিম্বা যাহাদিগের পান্‌সে দাঁত একটু জোর লাগিলেই দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়িয়া থাকে, এরূপ ব্যক্তির দ্বারা চুষাইতে দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। কারণ তদ্দ্বারা একটী বিপদ নিবারণ করিতে গিয়া আবার আর একটী নূতন বিপদ ডাকিয়া আনা হয়; অর্থাৎ দষ্টস্থানের বিষ চোষণ-কারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার জীবন নষ্ট করিয়া তুলে।

চূষণ সময়ে তৈল মুখে করিয়া চুষিলে কোন অনিষ্ট আশঙ্কা থাকে না অথবা একটু ব্রাণ্ডি জল মুখে কুলি করিয়া চোষণ করা ভাল এবং চোষণের পরই মুখের মধ্যস্থ রসাদি ফেলিয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ ব্রাণ্ডিজলে মুখ ধৌত করা কর্ত্তব্য। ব্রাণ্ডি অভাবে কেবলমাত্র জল দ্বারা ধৌত কার্য্য চলিতে পারে। এইরূপভাবে চুষিতে চুষিতে যখন দেখা যাইবে যে, বিষ নির্গত হইয়াছে তখন আর চুষিবার প্রয়োজন হয় না।

চোষণ সম্বন্ধে আর একটী সহজ উপায় আছে, এস্থলে তাহাও জানিয়া রাখা প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই প্রয়োজন, দষ্ট স্থানে কোন পাত্রে একটী বাতি অথবা সলিতা জ্বালিয়া তাহার উপর একটী খালি গ্লাস উপুড় করিয়া রাখিলে ঐ গ্লাস অত্যন্ত আঁটিয়া বসিবে এবং রক্তস্থ বিষাক্ত অংশ টানিয়া বাহির করিতে থাকিবে। গ্লাসটী কাচের হইলেই ভাল হয়; কারণ কাচ অত্যন্ত স্বচ্ছ, সুতরাং বাহির হইতেই বেশ দেখা যায় কি পরিমাণে রক্তাদি নির্গত হইয়া আসিতেছে।

বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাহাতে সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতে না পারে, তাহার প্রতিবিধান করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এজন্য অগ্রে বন্ধন করাই যুক্তি সিদ্ধ। বন্ধনের পর দংশন স্থান চোষণ কিম্বা কর্ত্তন করাই পরামর্শ। কাটিতে কোন প্রকার আশঙ্কা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ জীবন নষ্ট হওয়া অপেক্ষা দষ্ট স্থান কাটিয়া দেওয়া তত হানি-জনক নহে। ধারাল ছুরি, ক্ষুর প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা দষ্ট স্থান চিরিয়া

দিতে হয়। চিরিয়া দিলে সেই স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে বিষ বাহিরে আইসে। চিবার উপরের দিক হইতে চুঁচিয়া আনিলে রক্ত নির্গত হইবার সহায়তা হইয়া থাকে। কর্ত্তিত স্থানের উপর গরম জলের ধারাণী করিলেও রক্ত নির্গত হয়।

কেবলমাত্র চিরিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। দষ্ট স্থান উত্তমরূপে পুড়াইয়া দেওয়াও একটী প্রধান চিকিৎসা। এক ড্রাম কাষ্টিক জলে গুলিয়া ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ধুইয়া দেওয়া আবশ্যক।

দষ্ট স্থানের উপর যে বন্ধন করা হয়, তাহা সহসা খুলিয়া দেওয়া উচিত নহে। যখন দেখা যাইবে দষ্ট স্থান এবং তাহার চারি পার্শ্বস্থ চিরাস্থান সমূহ হইতে পরিষ্কার রক্ত নির্গত হইতেছে এবং বিষের যন্ত্রণা রোগী আর অনুভব করিতে পারিতেছে না, তখন ঐ বন্ধন মোচন করা আবশ্যক।

বিষাক্ত হইলে রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়। উহার স্বাভাবিক বর্ণ থাকে না। অতএব যে পর্য্যন্ত এরূপ দূষিত রক্ত দেখা যাইবে, সে পর্য্যন্ত চিকিৎসায় ত্রুটি করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। অর্থাৎ দষ্ট স্থান হইতে রক্ত নির্গত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেহ কেহ কর্ত্তিত স্থানের উপর হইতে লবণ দিয়াও চুঁচিয়া থাকেন।

আভ্যন্তরিক চিকিৎসা।—দষ্ট ব্যক্তি যদি বিষের জ্বালায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে অবিলম্বে তাহাকে বল-কারক ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। গরম জলে অল্প পরিমাণ ব্রাণ্ডি দিয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দেওয়া ভাল। অথবা কুড়ি ফোঁটা লাইকর এমোনিয়া গরম জলের সঙ্গে সেবন করাইতে হইবে। এই সকল সেবন করাইলে রোগী অপেক্ষাকৃত সবল হইবে। রোগীর যদি বমন না হয়, তবে গরম জলের সঙ্গে রাইসরিষার গুঁড় (মষ্টার্ড) সেবন ব্যবস্থা। ইহা সেবন করিলে বমন উদ্রেক হইবে। আর যদি আপনা হইতে অধিক বমি হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে একখানি বড় রাইসরিষার পটি পেটে বসাইতে হইবে এবং বমন বন্ধ হইলে তাহা তুলিয়া ফেলা আবশ্যক।

ঐ পটিতে যদি বমন বন্ধ না হয়, তবে আধ রতি আফিং খাওয়াইবে, উহা থামিয়া যাইবে। আফিং এক বারের অধিক সেবন করা অবিধি। এই সকল উপায়ে যদি উপকার না হয়। তবে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া সুপরামর্শ।

সর্পে দংশন করিলেই বুঝিতে পারা যায় তাহা বিষাক্ত সর্প কি না। বিষাক্ত সর্পে দংশন করিলে দংশিত স্থানে অত্যন্ত বেদনা হয়, শীঘ্র সেই স্থান ফুলিয়া উঠে, চক্‌চক্‌ করিতে থাকে; রোগী যদি অধিকক্ষণ জীবিত থাকে, তবে সে স্থানে রস জমে এবং পচিয়া উঠে, অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য হয়, নাড়ী দ্রুত হয়, বাক্‌ বাধিত হইয়া আইসে, কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে, বিষের যন্ত্রণায় অস্থির হয়, শরীর বিবর্ণ হয়, মুখে ফেণা ভাঙিতে থাকে, অজ্ঞান হইয়া পড়ে, হাত পা এবং ঘাড় নেতাইয়া পড়ে, অবশেষে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া রোগীর সকল যন্ত্রণা অবসান করে।

বিষাক্ত সর্পের বিষ দ্রুতবেগে সর্ব্ব শরীরে সঞ্চার হয়, এজন্ত দংশনমাত্রেই চিকিৎসা করা উচিত।

পূর্ব্বে চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক। সর্প চিকিৎসা বিষয়ে এ দেশের-মাল বৈদ্যগণ অনেক প্রকার উত্তমোত্তম ঔষধ অবগত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাহারা প্রায় কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করে না। অনেক প্রকার গাছ গাছড়া আছে, সেই সকল দ্বারা বিষ নাশ হইয়া থাকে। দষ্ট ব্যক্তিকে লঙ্কাপাতা খাওয়াইলে উপকার হইয়া থাকে। রোগীকে ঘুমাইতে দেওয়া উচিত নহে।

সর্প যেরূপ ভয়ানক শত্রু, তাহার আক্রমণ হইতে সাবধানে থাকাই প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে গুরুতর কর্ত্তব্য।

অশ্ব-পালক বা সহিসের কর্ত্তব্য

অশ্ব-পালকের অভিজ্ঞতার উপর অশ্বের জীবন ও উন্নতি এবং অবনতি নির্ভর করে। কি নিয়মে অশ্ব-পালক অশ্বের প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকে এবং অশ্ব-পালক নিয়মিত কার্য্য সম্পন্ন করে কি না, গৃহস্থদিগকে তাহাতে সতত দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অশ্ব আমাদের যেরূপ উপকারী পশু এবং উহার যেরূপ মূল্য তাহা সকলেই অবগত আছেন, অতএব এরূপ মূল্যবান উপকারী পশুর প্রতিপালন বিষয়ে দৃষ্টি রাখা যে গৃহস্থগণের পক্ষে একটী গুরুতর কার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং কেবলমাত্র অশ্ব-পালকের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। অশ্ব-পালকের কার্য্য কি কি তাহা অবগত না হইলে তাহার কার্য্যের দোষ গুণ বুঝিতে পারা যায় না। এজন্য এই প্রস্তাবে অশ্ব-পালকের কার্য্য সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিবরণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

অশ্ব-পালক বা সহিসের প্রধান কার্য্য অশ্বকে ভাল অবস্থায় রাখা; ভাল অবস্থায় রাখা বলিলে কেবলমাত্র সুস্থ থাকিলেই হইল, এরূপ মনে করা উচিত নহে। কারণ অশ্ব সুস্থ থাকা যেমন বাঞ্ছনীয়, সেইরূপ তাহার যে সকল গুণ জন্য জনসমাজে আদর, সেই সকল গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রতিদিন প্রত্যূষে পাঁচ ছয়টার সময় অশ্ব-শালা বা আস্তাবলের দ্বার খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রত্যূষে দ্বার খুলিলে বাহিরের পরিষ্কৃত শীতল বায়ু গৃহে সঞ্চারিত হইয়া রাত্রিকালের গৃহস্থিত দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দিতে পারে। গৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া সঞ্চিত মল-মূত্র স্থানান্তরিত করিতে হইবে। ঝাঁইট দেওয়ার সময় ঘরের প্রত্যেক কোণগুলি উত্তমরূপ পরিষ্কার করা উচিত। প্রতিদিন ঘরের মেজে ধুইয়া দিলে ভাল হয়। প্রত্যহ প্রাতে এইরূপ নিয়মে পরিষ্কার করিলে কোন প্রকার দুর্গন্ধই হইতে পায় না।

গৃহ পরিষ্কারে যেরূপ মনোযোগ দিতে হয়, অশ্বের ব্যবহার্য্য পাত্রগুলিও (অর্থাৎ দানা ও জল পানের পাত্র) নিত্য পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন করাও সেইরূপ আবশ্যক।

সকালে অশ্বকে একবার খাবার দেওয়া প্রয়োজন, ঘাস দিবার সময় তাহা চাপিয়া না দিয়া আল্‌গাভাবে দিলে ঘোড়ায় শীঘ্র উহা খাইতে পারে এবং আহারে কষ্ট হয় না। এই সময় একবার দানা দেওয়াও প্রয়োজন।

আহারাদি প্রদান ব্যতীত সহিসের আরও অনেক কর্ত্তব্য কাজ আছে, প্রত্যূষে অশ্বকে একবার ভ্রমণ করান অর্থাৎ টওলান আবশ্যক। যে স্থলে টওলান অসুবিধা, তথায় অশ্বের মাথা একটু উচুঁভাবে বাঁধিয়া গা মলিয়া দিলেও চলিতে পারে।

অশ্বের গাত্রসংলগ্ন ধূলা এবং লোমাদি পরিষ্কার করিবার জন্য প্রতিদিন খট্‌রা ব্রস্ করা একটী প্রধান কাজ। খট্‌রা করিতে হইলে প্রথমে গলা হইতে আরম্ভ করাই ভাল। গলার নিম্নে বাঁ-হাত দ্বারা ধরিয়া ডাইন হাতে খট্‌রা টানিয়া আনিলে বেশ সুবিধা হইয়া থাকে। এইরূপভাবে গলদেশে খট্‌রা করা শেষ হইলে, হাত বদলাইয়া বক্ষস্থলে খট্‌রা করিতে হইবে। পরে ডাইন হাত অশ্বের পৃষ্ঠের উপর রাখিয়া তাহার দেহের বামভাগে সহিসের ডাইন অঙ্গ ঠেকাইয়া পেটের দিকে খট্‌রা টানিয়া আনিতে হইবে। পেটে খট্‌রা টানা হইলে, হাঁটু ও পা এবং অবশেষে সর্ব্বাঙ্গে খট্‌রা টানিয়া আনা আবশ্যক। সর্ব্বাঙ্গে খট্‌রা টানা হইলে, তাহার পর ব্রস্ দ্বারা সমস্ত শরীর পুঁছিয়া দেওয়া উচিত। ব্রস্ টানিবার সময় মধ্যে মধ্যে এক একবার ব্রসখানি খট্‌রার অর্থাৎ দাঁত মুখে টানিয়া লওয়া আবশ্যক, এইরূপ টানিবার উদ্দেশ্য এই তদ্দ্বারা ব্রস্‌স্থিত ধূলা ও লোমাদি সমুদায় পরিষ্কার হইয়া আইসে।

ব্রস্ কিম্বা খট্‌রা অত্যন্ত জোর করিয়া টানা ভাল নহে। কারণ তদ্দ্বারা অশ্বের শরীরে বেদনা লাগিতে পারে। বিশেষতঃ যাহাদিগের চর্ম্ম কোমল তাহাদিগের কষ্টের আধিক্য হইয়া থাকে।

ব্রস্ করা শেষ হইলে অশ্বের অঙ্গে কুচি মারা আবশ্যক। কুচি মারিবার নিয়ম এই—বিচালি জলে ভিজাইয়া, সেই বিচালি দ্বারা অশ্বের সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিতে হয়। পরে একখানি মোটা ঝাড়ন দ্বারা সমুদায় শরীর পুঁছিয়া দিয়া অশ্বের কাণ ধরিয়া টানিয়া দিতে হয়। কাণ টানিলে অশ্বগণ অত্যন্ত আরাম বোধ করিয়া থাকে।

অশ্বের অঙ্গাদি মার্জ্জনা ও মর্দ্দন করা হইলে, কিছুক্ষণের জন্য ব্যায়াম অর্থাৎ অঙ্গ চালনা করাইতে হয়। গাড়ীর ঘোড়া হইলে একটী চক্র দেওয়া আবশ্যক। একেবারে পরিশ্রম বর্জ্জন অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম উভয়েই অশ্বের পক্ষে অনিষ্টজনক। এজন্য অশ্বের শক্তি অনুসারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

আরোহণের অশ্ব হইলে প্রতিদিন প্রত্যূষে তাহাকে চালনা করা আবশ্যক। অশ্বের "চাল" ঠিক করা সহিসের একটী প্রধান কাজ। আরোহণের অশ্বের গতি অনুসারে তাহার মূল্য ও গৌরব হইয়া থাকে, এজন্য ঐ গতি কি প্রকার, তাহা বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। আমাদের দেশের প্রাচীন অশ্ব-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা অশ্বের পাঁচ প্রকার গতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ আস্কন্দিত, ধৌরিতক, রেচিত, বল্গিত এবং প্লুত। অশ্ব যখন ক্রোধান্বিতভাবে ঊর্দ্ধে উল্লম্ফন করিয়া গমন করে, তাহাকে আস্কন্দিত কহে। নকুলের ন্যায় গতিতে ধৌরিতক (১); উত্তেজিত ভাবে অশ্ব যখন মধ্যবেগে গমন করে, তাহাকে রেচিত কহে; যে অশ্ব শরীরের অগ্রভাগ উন্নত, মস্তক কুঞ্চিত আর পৃষ্ঠবংশ নমিত করিয়া গমন করে, তাহাকে বল্গিত কহে। অশ্ব ধাবিতকালে যদি হরিণ ও কোন কোন পক্ষীর ন্যায় উল্লম্ফনভাবে গমন করে, তাহাকে প্লুত কহে।

উর্দ্দু অর্থাৎ যাবনিক ভাষাতেও অশ্বের পাচ প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট আছে; অর্থাৎ রপট, ছারতক, দুল্কি, কদম এবং কুদ্না। অশ্ব যদি

(১) ধৌরিতক আবার চারিভাগে বিভক্ত; ধৌর্য্য, ধৌরিতক্, ধারণ এবং ধোরিত। পাণিকৌড়ীর ন্যায় গতিকে ধৌর্য্য, ময়ূরের গতির ন্যায় গতিকে ধোরণ এবং শূকরের গতির ন্যায় গতিকে ধোরিত কহে।

লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অত্যন্ত বেগে ধাবিত হয়, তবে সেই গতিকে রপট, মধ্যবেগে লম্ফ প্রদান করিয়া গমনের নাম ছারিতক, গমন-কালে অশ্বের সর্ব্বশরীর আন্দোলন করিলে সেই গতির নাম ডুল্‌কি। কেহ কেহ কদমকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন অর্থাৎ সাগাম, ইয়োরগা, আবিয়া এবং রাহোয়াল। বিস্তৃত মুখবিশিষ্ট কোন একটী জল-পূর্ণ পাত্র হস্তে করিয়া যদি অশ্ব চালিত করা যায় এবং তাহার অঙ্গ-কম্পনে যদি আরোহীর হস্ত হইতে জল পতিত না হয়, তবে সেই গতিকে সাগাম কহে। অশ্ব যদি গমন-কালে, শরীরের অগ্রভাগ উন্নত এবং সম্মুখ-স্থিত পদ বিঘূর্ণিত করিয়া গমন করে, তবে তাহাকে ইয়োরগ কহে। আর যে অশ্ব গমনকালে মস্তক এরূপ উন্নত করিয়া গমন করে যে, তদ্দারা আরোহীর মস্তকস্থিত পাগড়ি পর্য্যন্ত অদৃশ্য হয়, তবে তাহাকে আবিয়া কহে এবং যে অশ্বের গমনকালে পদচতুষ্টয় এক নিয়মে ক্ষেপিত হয়, তাহাকে রাহোয়াল গতি কহে।

যে অশ্ব ধাবনকালে সম্মুখবর্ত্তী পদ উত্তোলন করিয়া গমন করে, সেই গতির নাম খুদ্‌না। এই সকল গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অশ্বকে শিক্ষা দেওয়া সহিসের প্রধান গুণপণা।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, নিয়মিত পরিশ্রম পরিবর্জ্জন কিম্বা অতিরিক্ত পরিশ্রম উভই অশ্বের পক্ষে অমঙ্গলজনক তাহা প্রত্যেকের মনে রাখা আবশ্যক। অশ্বকে পরিশ্রম করিতে না দিয়া—অশ্বশালায় আবদ্ধ রাখিলে মেদ বৃদ্ধি এবং পায়ের পীড়া হইবার গুরুতর সম্ভাবনা। দীর্ঘকাল অশ্বকে আবদ্ধ রাখিয়া হঠাৎ তাহাকে পরিচালন করিলে প্রায়ই তাহার পায় আঘাত লাগিতে পারে। সহিসের উচিত প্রতিদিন অন্ততঃ দুই ঘণ্টা ধরিয়া অশ্বকে পরিশ্রম করিতে দেওয়া। যে গুণের জন্য জনসমাজে অশ্বের প্রভূত আদর, নিয়মিত পরিশ্রম ত্যাগ করাইলে সে গুণের হ্রাস হইয়া আইসে, অবশেষে অশ্ব একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। প্রত্যেক অশ্বপালকের মনে রাখা উচিত, একমাত্র পরিশ্রম দ্বারাই অশ্বের শক্তিও দৃঢ়তায় সাধিত হইয়া থাকে।

মনুষ্যাদি প্রাণির ন্যায় অশ্বেরও তিনটী অবস্থা; অর্থাৎ বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য; তন্মধ্যে যৌবন কালেই অধিক পরিশ্রম করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। ফলকথা যে কোন অবস্থায় হউক না কেন, অশ্বের সামর্থ বুঝিয়া ব্যায়ামে প্রবৃত্ত করা উচিত। ব্যায়াম করাইবার সময় আর একটী কথার প্রতি মনোযোগ দিতে হয়, অর্থাৎ ব্যায়ামের প্রথমাবস্থায় অধিক বেগে ধাবিত না করাইয়া ক্রমে ক্রমে বেগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আবার বেগ থামাইবার সময় সহসা বন্ধ না করিয়া ক্রমে ক্রমে সংযত করা পরামর্শ-সিদ্ধ। পীড়িতাবস্থায় অথবা আহারান্তে পরিশ্রম করিতে দেওয়া ভাল নহে। বৃষ্টির সময়ে অধিক বেগে অশ্ব পরিচালন করিলে, কিম্বা পরিশ্রান্ত পশুকে হঠাৎ জলে ভিজাইলে, কিম্বা জল পান করিতে দিলে নানা প্রকার কঠিন পীড়া হইবার গুরুতর আশঙ্কা। কি নিয়মে অশ্বকে পরিশ্রম করাইতে হয়, তাহা অবগত হওয়া অশ্ব-পালকের পক্ষে যেমন কর্ত্তব্য। আবার গুরু-তর পরিশ্রমের পর কিরূপ নিয়মে তাহাকে সুস্থ করিতে হয়, তাহাও জ্ঞাত হওয়া সেইরূপ প্রয়োজন। শ্রান্ত অশ্বকে সহসা এক স্থানে বাঁধিয়া রাখা উচিত নহে। গুরুতর পরিশ্রমের পর অশ্বকে এক স্থানে স্থির করাইয়া রাখিলে হটাৎ লোমকূপ সমূহ রুদ্ধ হইয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতে পারে না। সহসা ঘর্ম্ম বন্ধ হইলে নানা প্রকার কঠিন পীড়া হইবার কথা, এজন্য প্রথমে শীতল জল দ্বারা (কোন কোন মতে লবণজল) তাহার মুখের ফেণ রাশি ধুইয়া দেওয়া আবশ্যক। গাড়ীর ঘোড়া হইলে, তাহার সাজ এবং আরোহণের অশ্ব হইলে, তাহার পর্য্যাণ খুলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে চালনা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ভ্রমণের পর যখন দেখা যাইবে বেশ সুস্থ বোধ করিয়াছে অর্থাৎ শ্রম-জনিত কোন প্রকার ক্লেশ নাই, তখন তাহাকে অশ্ব-শালায় বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক। অনন্তর তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একবার বিচালি দ্বারা মর্দ্দন করিয়া দিয়া পদচতুষ্টয় উত্তমরূপে ধৌত করা বিধেয়। পরে শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা জল পুঁছিয়া দিয়া অশ্বকে বিশ্রাম করিতে দিতে হইবে।

লিখিতরূপ নিয়মে প্রতিপালন করিলে অশ্ব অধিক দিন পর্য্যন্ত সুস্থ

থাকিয়া আমাদের ব্যবহারে লাগিতে পারে। অশ্ব-পালকের হস্তে অশ্বের এই সকল গুরুতর কাজ নির্ভর। অতএব অশ্ব-পালক প্রতিদিন এই সকল কার্য্য করে কি না, প্রত্যেক অশ্ব-স্বামীকে তাহা স্বচক্ষে দেখা উচিত।

সহিসের আর একটী কাজের উপর সতত দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ সহিস ঘোড়ার দানা চুরী করিয়া নিয়মিত খাদ্য হইতে পশুকে বঞ্চিত করিয়া থাকে। এজন্য অশ্ব-স্বামীর এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

অশ্বের প্রতি সৎব্যবহার করা অশ্ব-পালকের যেমন গুরুতর কর্ত্তব্য, সেইরূপ অশ্বের ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলিও পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন রাখিতে দৃষ্টি রাখা আর একটী কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করা উচিত।

শীতকালে কম্বল প্রভৃতি গরম কাপড় দ্বারা অশ্বের গাত্র আচ্ছাদন করিয়া দিলে, শীত-জনিত কষ্ট অনুভব করিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে অশ্বের শীত বস্ত্র রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া রাখা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন অশ্বের সাজ সমূহ প্রতিদিন ব্যবহারের পর নিয়মিত স্থানে তুলিয়া রাখা প্রয়োজন।

রাত্রিকালে শয়নের নিমিত্ত তৃণাদি দ্বারা অশ্বের শয্যা রচনা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শয্যায় ব্যবহৃত তৃণাদির মধ্যে যে সকলে মল-মূত্র লাগিয়া থাকে, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। শয্যা একটু পুরু গোছের হইলে ভাল হয়।

এখন পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিলেন যত্ন ও উপযুক্ত প্রতি-পালনের উপর অশ্বের জীবন ও স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে সুতরাং কেবল-মাত্র অশ্বপালকের উপর নির্ভর না করিয়া অশ্ব-স্বামীকেও ঐ সকল বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান লইতে হয়।

গো-জাতির বসন্ত রোগ।

বসন্তের ন্যায় সাংঘাতিক এবং সংক্রামক রোগ অতি অল্পই দেখা যায়। এই রোগের একটী বিশেষ বিপদ এই যে, পালের মধ্যে

একটী গোরুর বসন্ত হইলে ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত পাল রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

বসন্ত প্রায় শীতকালের শেষ ভাগ হইতে গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পশুদিগের শরীরে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া এই রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—প্রথমে শরীরে তাপের আধিক্য হইয়া থাকে, তাপমান নামক যন্ত্রে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বসন্ত রোগে যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, তৎসমুদায় সাধারণতঃ তিন অবস্থায় বিভক্ত।

১ম অবস্থা।—প্রথমে জ্বরের ভাব হইয়া থাকে, কম্প, মুখ গরম, ক্ষুধা মান্দ্য, চঞ্চলতা অথবা আলস্যের লক্ষণ দেখা যায়; শুষ্ক কাশি, পেট আঁটিয়া ধরা, পিপাসার আধিক্য, লোম শিহরিয়া উঠা, চক্ষে আবল্য ভাব, দাঁত কড়মড়, হাইতোলা, পীঠের দাঁড়ায় হাত দিলে অসহ্য বোধ, নাড়ীর গতি চঞ্চল, শ্লেষ্মাযুক্ত মল, কাণ লুটিয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ প্রকাশ হইতে থাকে। দুগ্ধবতী গাভী হইলে তাহার দুগ্ধ শুকাইয়া যায়। এই অবস্থায় ভালরূপ জাওর কাটে না এবং চারি পা প্রায় জড় করিয়া থাকে।

২য় অবস্থা।—এই অবস্থায় প্রায়ই শরীরে উষ্ণতার কোন বিশেষ নিয়ম থাকে না, অর্থাৎ কথন কথন অধিক শীত বোধ এবং কথন কথন সর্ব্বশরীর অত্যন্ত উষ্ণ হয়। ঘন ঘন শ্বাস বহিতে থাকে, জাওর কাটা এককালে বন্ধ হয়, ক্ষুধা আদৌ থাকে না, চক্ষে অল্প অল্প পেঁচুটী পড়ে, পীঠের দাঁড়ায় বেদনা বৃদ্ধি হইয়া উঠে, মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে, জ্বর প্রবল, পিপাসা আধিক্য, ঢোক গিলিতে কষ্ট বোধ, নড়া চড়াতে অধিক কষ্ট বোধ, মাংসপেশী সমূহের খেচুনী অধিক, জিহ্বায় কাঁটা কাঁটা হয়, পেট আঁটিয়া যায়, মল, রক্ত ও শ্লেষ্মা মাথা থাকে, মল-মূত্র দ্বার কথন কথন ঝুলিয়া পড়ে, নাদিবার সময় অত্যন্ত বেগ বৃদ্ধি হয়, অধিক পরিমাণে দৌর্ব্বল্য দেখা যায়, কথন কথন পেটের-দিকে মাথা গুঁজিয়া থাকে।

৩য় অবস্থা।—চোক, মুখ এবং নাসিকা-পথ হইতে ক্রমাগত আঠাযুক্ত শ্লেষ্মা পড়িতে থাকে, নিশ্বাস দুর্গন্ধ হয় এবং মাড়ি ও গলার ভিতরের ফুস্কুড়ি ও টাক্‌রা, মুখের নিম্নভাগ, জিহ্বা এবং নাকের ছিদ্র ও চক্ষুর পাতার ছাল উঠিয়া থাকে; ফুস্কুড়ি সমূহ প্রায় হরিদ্রা বর্ণের হয়, আর সম্মুখস্থ দাঁত নড়িতে থাকে। পেট ভাঙে অর্থাৎ অত্যন্ত পাতলা জলবৎ দুর্গন্ধ-যুক্ত ভেদ হইয়া থাকে, কখন কখন ঐ তরল মলের সহিত রক্ত ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত কঠিন গুটলীও নির্গত হয়, কখন কখন এরূপও দেখা যায়, চামড়ার নীচে ফুলিয়া উঠে এবং তাহা টিপিলে বসিয়া যায়। পশুর দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি হয়, পিপাসা থাকে, ঢোক গিলিতে আরও কষ্ট হয়, গিলিবার সময় কাশি উপস্থিত হয়; এই সময় পশুর শিং, চর্ম্ম, কাণ, পা এবং মুখ শীতল হয়; গর্ভবতী গাভী হইলে তাহার গর্ভ-স্রাব হয়, এতদূর দুর্ব্বল হয় যে, কোনমতেই দাঁড়াইতে পারে না, সর্ব্বদা গোঁ গোঁ করিতে থাকে, কষ্টে শ্বাস ফেলে, কোঁতায়, কখন কখন রক্তময় ভেদ হয়, নাড়ী প্রায় টের পাওয়া যায় না; এইরূপ অবস্থা ঘটিলে অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, পশু দুই দিন হইতে ছয় দিনের মধ্যেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কোন কোন স্থলে গল-কম্বলে, পালানে, কুচ্‌কি, কাঁদে এবং পাঁজরের চামড়ায় ফুস্কুড়ি দেখা যায়; কিন্তু এই সকল রোগের নিত্য লক্ষণ বলিতে পারা যায় না, কারণ গ্রীষ্মকালে এই রোগ উপস্থিত হইলে প্রায়ই ঐ সকল লক্ষণ দেখা যায়, অন্য সময় রোগ হইলে দেখা যায় না। এই সকল লক্ষণ অশুভ-জনক নহে, কারণ ঐরূপ ফুস্কুড়ি অধিক পরিমাণে হইলে রক্তামাশয় তাদৃশ হয় না, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলে অনেক সময় পশু সহজেই আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। চর্ম্মে ফুস্কুড়ি না হইলে এবং আমাশয়ের প্রবল লক্ষণ হইলে পশু প্রাণ মারয়া যায়।

ব্যবস্থা।—বসন্ত রোগে সর্ব্বাঙ্গে ফুস্কুড়ি বাহির হইলে সুলক্ষণ মনে করিতে হইবে। যত অধিক পরিমাণে ফুস্কুড়ি নির্গত হয়, তত শীঘ্র আরোগ্য লাভের সম্ভব। গায়ে ফুস্কুড়ি বাহির না হইয়া রক্তামাশয়ের মত বারম্বার মল নির্গত হইলে অত্যন্ত অশুভ-জনক লক্ষণ মনে করিতে হইবে।

বসন্তরোগে শরীর হইতে গরলময় পদার্থ যাহাতে স্বাভাবিক উপায়ে বাহির হইতে পারে, তাহার সাহায্য করা, উপযুক্তরূপ সুপথ্য প্রদান, এবং নিয়মিতরূপ যত্ন ও শুশ্রূষা দ্বারা পশুকে সবল রাখা চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য।

বসন্ত রোগের প্রথমাবস্থায় মল বদ্ধ হইবার যে লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে, পেট নরম না হওয়া পর্য্যন্ত দিনে এক কিম্বা দুইবার করিয়া তিন কাঁচ্চা অবধি ছয় কাঁচ্চা পর্য্যন্ত লবণ কি এপসম্ সল্ট প্রভৃতি লবণাক্ত বিরেচক ঔষধ দ্বারা নিবারণ করা আবশ্যক।

দিনে দুই তিনবার তপ্তজল ও তৈল দিয়া পিচকারী দেওয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় পশুকে তীব্র জোলাপ দিলে অত্যন্ত দুর্ব্বল অর্থাৎ নেতাইয়া পড়িবার বিশেষ সম্ভব। পেট নরম হইলে শরীরস্থ বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয় বটে কিন্তু জলবৎ কিম্বা রক্তবৎ মল নির্গত হইতে দেখা-গেলে, নিশ্চয়ই নেতাইয়া পড়িবে, এজন্য ধেড়ানি নিবারণ করা বিধেয়।

ধেড়ানি, রক্ত এবং শ্লেষ্মা চব্বিশ ঘণ্টার অধিক নির্গত হইতে দেখিলে পেট ধরাইয়া দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করান আবশ্যক।

উপকরণ ও পরিমাণ।

চাখড়ির গুঁড়	পৌনে চারি তোলা।
পলাশ গঁদ	পৌনে এক তোলা।
আফিং	ছয় আনা।
চিরতার গুঁড়	সওয়া তোলা।

লিখিত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া তাহাতে এক ছটাক মদ দিয়া ভাতের এক সের মাড় মিশাইয়া সেবন করাইতে হইবে। গবাদির পক্ষে এই ঔষধ ধারক ও অম্ল-নাশক।

উপকরণ ও পরিমাণ।

কর্পূর	পৌনে এক তোলা।
সোরা	পৌনে এক তোলা।

ধুতুরার বীচি	...	...	...	সিকি কাচ্চা।
চিরতা	...	...	...	পৌনে এক তোলা।
মদ	...	...	...	দুই ছটাক।

অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে রোগের প্রথম অবস্থায় তালিকার লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। থ্যাকার সাহেবের মতে রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ধেড়ানি থাকিলে, উপরের লিখিত ঔষধে পৌনে এক তোলা মাজুফলের খিচ-শূন্য গুঁড়া মিশাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ধেড়ানি বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত বারো ঘণ্টা অন্তর এই ধারক ঔষধ ব্যবহার করিতে পারা যায়।

লিখিত ঔষধে ধেড়ানি বন্ধ হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবনীয়।

উপকরণ ও পরিমাণ।

সিদ্ধি	...	...	...	আধ পোয়া।
কর্পূর	...	...	...	আধ ছটাক।
খয়ের	...	...	...	আধ তোলা।

তালিকায় লিখিত ঔষধ এক সের গঁদের জলে মিশাইয়া চারি ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেবনের ব্যবস্থা।

উপকরণ ও পরিমাণ।

সিদ্ধি (পেষিত)	...	...	...	দুই তোলা।
জীরা	...	...	...	এক ছটাক।
হিং	...	...	...	আধ তোলা।
লঙ্কামরিচ	...	...	...	সিকি তোলা।

জল কিম্বা ভাতের মাড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া চারি ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেবনীয়।

উপকরণ ও পরিমাণ।

আফিং	...	...	...	পোনের রতি।
খড়িমাটী (চূর্ণ)	...	...	...	এক তোলা।
শুঁঠচূর্ণ	...	...	...	দুই তোলা।

লিখিত দ্রব্য কয়টী উত্তমরূপে ভাতের মাড়ের সহিত মিশাইয়া পাঁচ ঘণ্টা অন্তর সেবনের ব্যবস্থা।

উপকরণ ও পরিমাণ।

আফিং	আধ তোলা।
খয়ের	আধ তোলা।

ভাতের মাড়ের সহিত মিশাইয়া পাঁচ ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেবন করাইতে হইবে।

উপকরণ ও পরিমাণ।

চিরতা চূর্ণ	আধ তোলা।
শুঁঠ চূর্ণ	দুই তোলা।

ভাতের মাড় অথবা গঁদের জলের সহিত একত্রিত করিয়া চারি ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেব্য।

কেহ কেহ এই অবস্থায় বেল অথবা ইন্দ্রযব সিদ্ধ সেবন করাইয়া পীড়া আরাম করিয়াছেন।

বসন্ত রোগাক্রান্ত গোরুর গাত্র ধৌত করিতে হইলে, এক ছটাক সির্কা গরম করিয়া এক সের পরিমিত জলে মিশাইয়া ক্ষত ধৌত করিয়া দেওয়া ভাল।

যদি এরূপ ঘটে যে, পীড়িত পশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্রমাগত ধেড়ানি হইতেছে, কোনক্রমে ঔষধ গিলিতে পারিতেছে না, সেইরূপ স্থলে ধারক পিচকারী ব্যবহার করা যুক্তি সিদ্ধ। অর্থাৎ আফিং পৌনে এক তোলা এবং এক সের ভাতের মাড় উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মল দ্বারে পিচকারী দিতে হইবে। একবার ঔষধ দেওয়ার পর যদি পুনর্ব্বার পেট নামাইতে থাকে, তবে আর একবার পিচকারী ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই আরাম হইয়া আসিবে।

বসন্ত রোগ উপস্থিত হইলে কোন কোন পশুর প্রথমে এককালে মল বদ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং মল নিষ্কাশিত না হওয়ায় কষ্টের বৃদ্ধি

হইয়া উঠে। এজন্য কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা উচিত। অল্প গরম গরম ভাতের মাড়ের সহিত আধ সের লবণ মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে। যদি এই ঔষধে মল পরিষ্কার না হয় তবে আধ সের এপসম্ সল্ট এবং এক সের গরম ভাতের মাড় একসঙ্গে মিশাইয়া সেবন করাইতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা।

উপকরণ ও পরিমাণ।

গন্ধক চূর্ণ	আধ পোয়া।
শুঁঠ চূর্ণ	আধ ছটাক।
এপসম্ সল্ট	এক পোয়া।

এক সের পরিমাণ গরম ভাতের মাড়ের সহিত মিশাইয়া সেবন করাইতে হইবে।

লিখিত ঔষধ সমূহে উপকার না হইলে পাঁচ ছটাক ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াইলে মল নির্গত হইবে। ঔষধ সেবনে অসুবিধা হইলে ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত মিশাইয়া পিচকারী দিলেও চলিতে পারে।

দুই সের গরম জলে সাবান ফেণাইয়া এবং তাহাতে দেড় ছটাক সরিষা তৈল মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দিলেও কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

কোন কোন পীড়িত পশুর রোগের প্রথমাবস্থায় আপনা হইতেই পেট নামাইতে থাকে অতএব রোগের প্রথমে এইরূপ হইলে কোন প্রকার বিরেচক ঔষধ দেওয়া উচিত নহে। কোষ্ঠ বদ্ধকালে সহসা তীব্র বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করিলে পরিশেষে অত্যন্ত উদরাময় উপস্থিত হইবার সম্ভব।

অনেক সময় এরূপও দেখা যায়, কোন কোন পশুর গলা ফুলিয়া থাকে; বসন্ত রোগে গলা ফুলিলে একখানি তপ্ত লৌহ দ্বারা কাণের নীচে হইতে অপর কাণের নীচে পর্য্যন্ত কণ্ঠদেশ বেঁড়িয়া একটী দাগ দেওয়া ভাল।

দগ্ধস্থানের ক্ষত আরাম করিবার নিমিত্ত তৈল প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক। এক পোয়া তার্পিণ তৈলে জয়পালের বীজ আধ ছটাক মিশাইয়া

চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে, পরে তাহার স্বচ্ছ অংশ লইয়া এবং তাহার সমান পরিমাণ নারিকেল তৈল মিশাইয়া ঘায়ে দিলে উহা আরাম হইয়া থাকে। জয়পালের তৈল আধ সের এবং এক পোয়া তার্পিণ তৈল এক সঙ্গে মিশাইয়া ব্যবহার করিলেও উপকার হয়।

রোগের যাতনায় যদি পশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে যাহাতে অগ্নি ও তেজ বৃদ্ধি হয়, এরূপ ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিৎ। নিম্নলিখিত ঔষধ সমূহ ব্যবহার করাইলে পীড়িত পশুর অগ্নি বৃদ্ধি এবং পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে।

উপকরণ ও পরিমাণ।

মদ	এক ছটাক।
হীরাকস	এক তোলা।

উপরের লিখিত দ্রব্য একসঙ্গে মিশাইয়া প্রতিদিন দুই বার সেবন করাইতে হইবে।

উপকরণ ও পরিমাণ।

জীরা চূর্ণ	আধ তোলা।
চিরতা চূর্ণ	আধ তোলা।
শুঁঠ চূর্ণ	সিকি তোলা।

তালিকার লিখিত চূর্ণ কয়টী মদের সহিত মিশাইয়া প্রতিদিন একবার করিয়া সেবনের ব্যবস্থা।

উপকরণ ও পরিমাণ।

হীরাকস	ছয় আনা।
চিরতা চূর্ণ	সওয়া তোলা।

আদ সের ভাতের মাড়ের সহিত মিশাইয়া দিনে দুইবার সেব্য।

উপকরণ ও পরিমাণ।

ইক্ষু-গুড়	আধ পোয়া।
ঘৃত (গব্য)	আধ পোয়া।
গমের ময়দা	আধ পোয়া।

এক সঙ্গে মিশাইয়া দিনে একবার সেবনের ব্যবস্থা।

পীড়িত পশুর পথ্যের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাহা সহজে জীর্ণ করিতে পারে এবং যদ্দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধিত হয়, এরূপ বল-কারক লঘু-পথ্য ব্যবস্থা করা বিধেয়। কারণ অনেক সময় এরূপ দেখা যায়, পশু রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পথ্যের দোষে পুনর্ব্বার পীড়িত হইয়া থাকে। পথ্যও যে ঔষধের কার্য্য করে, তাহা যেন প্রত্যেক গৃহস্থের মনে থাকা উচিত।

অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মতে এই সময় ভাতের মাড়, তিসির (মসিনা) মাড়, যবের ছাতু এবং কচি কচি লতা পাতা পথ্য দেওয়া উচিত।

যে পর্য্যন্ত পীড়িত পশুর ভেদ না হয়, সে অবধি পরিষ্কার শীতল জল পান করিতে দেওয়া সুপরামর্শ। কিন্তু বাহ্যে পাতলা হইলে জলের পরিবর্ত্তে ভাতের পাতলা মাড় পান করিতে দেওয়া ভাল।

বসন্ত রোগ যেরূপ ভয়ানক তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং পালের মধ্যে একটী গোরুর এই রোগ উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। পীড়িত পশু আরোগ্য লাভ করিলে সহসা পালে মিশিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। রোগ আরোগ্য হইলে সাবান দিয়া উত্তমরূপে তাহার গাত্র ধৌত করিয়া তবে পালে মিশিতে দেওয়া সৎপরামর্শ।

বসন্তাক্রান্ত পশু যে গৃহে অবস্থিতি করিয়া থাকে, সেই গৃহ সতত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ পীড়িত পশুর অবস্থিতি নিবন্ধন গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া থাকে, সেই দূষিত স্থানে বাস করিলে অন্যান্য পশু পীড়িত হইবার সম্ভব।

প্রতিদিন পীড়িত প্রাণির মল-মূত্র দূরে মৃত্তিকার মধ্যে পুতিয়া রাখা সৎপরামর্শ। গৃহে গন্ধকের ধূঁয়া দেওয়া উচিত। কেহ কেহ আবার এরূপও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন যে পীড়িত গোরুর নাসিকার সম্মুখে গন্ধকের ধুম রাখা ভাল। যখন দেখা যাইবে, ঐ ধূমে পশু কাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন উহা স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। প্রত্যহ অঙ্গার চূর্ণ, পাথুরিয়া

চূণ কিম্বা কার্বলিক য়্যাসিড গো-শালায় ছড়াইয়া দিলে গৃহস্থিত দূষিত বায়ু পরিষ্কৃত হইতে পারে। ফলতঃ গৃহাদি পরিষ্কার রাখাও যে, একটী চিকিৎসার অঙ্গ তাহা যেন প্রত্যেক গৃহস্থের মনে থাকে। গবাদি পশু আমাদের যেরূপ উপকারী, তাহা কাহাকেও যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয় না। এরূপ উপকারী পশুর পীড়ার সময় তাহাদিগের প্রতি সৎব্যবহার করা যে, ধর্ম্ম বুদ্ধির অনুমোদনীয় তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

গোলাপী আতর।

লেভেণ্ডার, ওডিকলম প্রভৃতি বৈদেশিক সুগন্ধির দৌরাত্ম্যে স্বদেশজাত গোলাপী আতর প্রভৃতি অনেক প্রকার অতি উপাদেয় সুগন্ধ দ্রব্য মাটী হইবার উপক্রম হইতেছে। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের আর সর্ব্বত্রই দেশীয় সুগন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের প্রতি আদর আজিও সমানভাবে প্রচুর পরিলক্ষিত হয়।

অনেক পাশ্চাত্য গন্ধ দ্রব্য অপেক্ষা শৈত্য বা অপর দৈহিক উপকারিতা-গুণে হীন হইলেও ইহা যে, গন্ধের প্রচুরতা শক্তিতে সকল প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য অপেক্ষা প্রবল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, এক ফোঁটা আতরে যতদূর স্থায়ী সৌরভ বাহির হয়, দশ ফোঁটা ইয়ুরোপীয় গন্ধ দ্রব্যে কখনই তদ্রূপ হয় না। বোধ হয় এ পরিচয় বঙ্গদেশের অনেকেই অবগত আছেন। তবে যে, সৌরভের খাতিরে দেশীয় সুগন্ধ দ্রব্য সমূহের প্রতি উপেক্ষা করিয়া বৈদেশিক সুগন্ধিতে আশক্তি, তাহা কেবল আমাদের জাতীয় দুর্দ্দশার একটী অন্যতম চিহ্ন মাত্র।

ভারতের মধ্যে গাজিপুর গোলাপী আতরের আকর স্থান; বাস্তবিক গাজিপুরের গোলাপী আতরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ কথা ইয়ুরোপীয়েরাও স্বীকার করেন। গোলাপী আতর গোলাপ পুষ্পজাত এক প্রকার অতি কোমল বর্ণ-হীন তৈল ব্যতীত আর কিছুই নহে। আতর প্রস্তুত করিবার প্রণালী অতি সহজ। ইচ্ছা করিলে গৃহস্থমাত্রেই নিজ নিজ গৃহে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন।

গোলাপ পুষ্প সমূহ সম্পূর্ণ বিকাশ হইবার পূর্ব্বেই তাহা তুলিতে হয় এবং পাপড়িগুলি বাছিয়া লইয়া তাহাদিগের গাত্র হইতে ধূলা প্রভৃতি অপরিষ্কার পদার্থ অতি সতর্কতার সহিত পুঁছিয়া ফেলিতে হইবে। এ বিষয়ে বিলক্ষণ সাবধানতার আবশ্যক। নতুবা পাপড়িতে কোনরূপ অপরিষ্কার পদার্থ সংযুক্ত থাকিলে আতর নির্গমের পক্ষে বিলক্ষণ বাধা জন্মে।

গোলাপের পরিষ্কৃত পাপড়িগুলি একটী পরিষ্কৃত কাচ, প্রস্তর কিম্বা মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া তাহা নির্ম্মল জল দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। এখন এই পাত্রটী কোন অনাবৃত অর্থাৎ খোলা স্থানে ছয় সাতদিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত রৌদ্রের উত্তাপে রাখিতে হইবে। তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ দিবস হইতেই জলের উপরিভাগে একপ্রকার তৈলবৎ পদার্থ ভাসিতে থাকিবে। উহা আবার দুই একদিবস পরেই ফেণার আকার ধারণ করিবে। এই পদার্থ গোলাপী আতর নামে খ্যাত। যতবার জলের উপরে ঐরূপ পদার্থ ভাসিতে থাকিবে, ততবারই তাহা পরিষ্কৃত তুলায় ভিজাইয়া তুলিয়া লইতে হইবে। আতর তুলিয়া লইলে যে জল অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই উৎকৃষ্ট গোলাপ জল।

আড়াই তোলা পরিমিত অতি উৎকৃষ্ট গোলাপী আতর প্রস্তুত করিতে হইলে প্রায় দুই লক্ষ গোলাপের আবশ্যক হয়। কিন্তু সাধারণতঃ প্রায় সেরূপ আতর দৃষ্ট হয় না। ব্যবসায়ীগণ সারচন্দন দ্বারা অনেক সময় গোলাপী আতর বিকৃত করিয়া থাকে। উহা পরীক্ষা করিতে হইলে একটী স্বচ্ছ কাচ পাত্রে আতর পূরিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিতে হয়; এইরূপ অবস্থায় রাখিলে উপরিভাগে তৈলাক্ত আতর এবং নিম্নভাগে চন্দনের জলীয় অংশ পরিষ্কাররূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আতর যে কেবলমাত্র বিলাসের পদার্থ তাহা নহে। উহা অনেক সময় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাণ পাকিলে আতর যে কি প্রকার মহৌষধের কার্য্য করে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন।

ঔষধ ব্যতীত অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্যে গোলাপী আতর ব্যবহার

হইয়া থাকে। খাদ্য দ্রব্যে অল্পমাত্র আতর মিশ্রিত করিলে সুগন্ধে ভোক্তাদিগের যার-পর-নাই তৃপ্তি সাধিত হয়।

গোলাপ পুষ্পের ন্যায় অন্যান্য পুষ্প প্রভৃতি সুগন্ধ পদার্থ সমূহ হইতেও আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট জাতীয় আতরের এরূপ প্রবল গন্ধ যে, রজকালয়ে বস্ত্র ধৌত করাইলেও তাহার সদ্‌গন্ধ নষ্ট হয় না। গন্ধের উৎকৃষ্টতানুসারে আতরের মূল্য হইয়া থাকে।

মুসলমানদিগের রাজত্ব কাল হইতে এদেশে আতর ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আতরের সুগন্ধে প্রাণ মাতোয়ারা হয় না এরূপ মনুষ্য প্রায় দেখা যায় না।

সকল শ্রেণীর লোক অপেক্ষা মুসলমানদিগের মধ্যেই আতরের অধিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আতরে দুর্গন্ধ নষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং কেবলমাত্র বিলাসিতার জন্য না হউক ঔষধাদির নিমিত্তও গৃহস্থের গৃহে উহা স্থান পাইবার উপযুক্ত।

খিলান।

গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে, খিলান গঠন একটী গুরুতর কর্ম্ম। খিলানের উদ্দেশ্য বা কার্য্য কি; ইহা ইহার উপরিস্থ ভার কিরূপে কোথায় চালিত করিয়া দেয়; কোন্ স্থানে কিরূপে খিলান নির্ম্মাণ করা উচিত; কোন্ খিলান অধিক শক্ত, কোন্ খিলানই বা অপেক্ষাকৃত অল্প ভারসহ; কোন্ খিলানের কোন্ স্থানে অধিক পরিমাণে ভার দিলে, খিলান ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভব, কোন্ স্থানেই বা ইচ্ছামত ভার দেওয়া যাইতে পারে; খিলানের আয়তন অনুসারে উহার স্থূলতা কিরূপে নির্ণয় করিতে হয়; খিলান নির্ম্মাণ কালে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখা আবশ্যক, ইত্যাদি বিষয় অনেকেই সবিশেষ অবগত নহেন। এইজন্য আমরা খিলানের স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নিম্নে বর্ণন করিতেছি।

উদ্দেশ্য বা কার্য্য অনুসারে বিভাগ করিতে হইলে খিলান দুই প্রকার,

"সোজা" ও "উল্টা"। এই উভয় প্রকার খিলানের কার্য্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সোজা খিলান, ইহার উপরিস্থ ভারের নিম্নগামী বেগ প্রতিরোধ করিয়া, ঐ ভার, খিলানের উভয় প্রান্তস্থ গাঁথনির (যাহার উপর খিলান নির্ম্মিত হইয়াছে) উপর চালাইয়া দেয়; খিলানের নিম্নে যদি কোন গাঁথনি থাকে, ঐ গাঁথনিতে অণুমাত্র ভার পড়িতে দেয় না। কিন্তু উল্টা খিলানের কার্য্য সম্পূর্ণ বিপরীত; ইহা, ইহার প্রান্তস্থ গাঁথনির ভার টানিয়া আনিয়া, ইহার নিম্নস্থ গাঁথনির উপর চালাইয়া দেয়। এই জন্যই দরজা এবং পিল্লা বা থামের মধ্যস্থ ফাঁকের উপরে সোজা খিলান এবং নীচে উল্টা খিলান দেওয়া উচিত। উপরে সোজা খিলান থাকায়, খিলানের উপরিস্থ ভার উক্ত দরজার পার্শ্বের গাঁথনি, পিল্লা বা থাম চালিত হইয়া যায় এবং নীচে উল্টা খিলান থাকায়, ঐ সমুদায় ভার, কেবলমাত্র, ঐ সকল পিল্লাদির নিম্নের গাঁথনির উপর না পড়িয়া, ফোঁকরের নীচের গাঁথনিতেও ছড়াইয়া পড়ে; সুতরাং বনিয়াদের উপর সমস্ত ভারটী সম ভাবে চালিত হইয়া যায়। কিন্তু এই উভয় প্রকার খিলানের উভয়বিধ কার্য্য অনেকেই অবগত নহেন। যাঁহারা শুনিয়াছেন বনিয়াদে খিলান করিলে ভাল হয়; কিন্তু কেন ভাল হয় তাহা জানেন না, এবং সেইজন্য যেখানে সেখানে সোজা খিলান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে বিপরিত ফল হয়। উল্লিখিত কারণে ইহাতে অপকার ভিন্ন কিছুমাত্র উপকার নাই। বনিয়াদের কোন্ স্থানে সোজা খিলান আবশ্যক হয় তাহা ষষ্ঠ সংখ্যা গৃহস্থালিতে, ভিত্তি বা বনিয়াদ শির্ষক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে।

আকার ভেদে খিলান, আপাততঃ বহুবিধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সকল প্রকার খিলানই একটী বৃত্তাংশ, কিম্বা দুই বা ততোধিক বৃত্তাংশের সংযোগ ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। সচরাচর যে সকল খিলান ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আকার ভেদে উহারা সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে:—

১। গোল খিলান (Semi-circle arch)

২। ভাঙ্গা চামচিকা খিলান (Segmental arch)

৩। বাদামে খিলান (Semi-elliptical arch)

৪। সমতল বা চাপা খিলান (Flat arch)

এই সকলের মধ্যে গোল খিলান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্ত ; ভাঙ্গা বা চামচিকা খিলান উচ্চতায় কম হওয়ায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় ; এবং বাদামে খিলান দেখিতে অতি সুন্দর। সমতল বা চাপা খিলান, খিলান নামে অভিহিত হইতে পারে না। ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত কড়ি বলিলেও চলে। ইহার ভার বহনের ক্ষমতা অতি অল্প ; উপরে একটী গোল বা ভাঙ্গা খিলান না থাকিলে, ইহা উপরের ভারে সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। দরজা প্রভৃতির উপরিভাগ সমতল দেখাইবার জন্যই এইরূপ খিলান ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত আকারের খিলান ব্যতীত, (Pointed) খিলান প্রভৃতি আর কয়েক প্রকার খিলান মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উহারা দুই বা ততোধিক বৃত্তাংশের সংযোগ ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। গির্জা প্রভৃতির দরজা ও জানালায় ঐ সকল খিলান সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

মধ্যস্থল কিঞ্চিৎ উচা করিয়া, থাদরি করিয়া ইট সাজাইলেই যে খিলান হইল এরূপ নহে। খিলানের জ্যা (Sdan) ও উচ্চতা (Rise) স্থির করিয়া, সাবধানতার সহিত উহার আকারের ঠিক অনুরূপ ইষ্টক বা কাষ্ঠ দ্বারা কালবুদ করা উচিত। খিলানের আকার ঠিক না হইলে, উহার ভারবহ শক্তি অনেকাংশে কম হয়, সুতরাং খিলানটী সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভব। রাজমিস্ত্রিগণ গোল খিলানগুলি ঠিক্ করিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারে, কিন্তু ভাঙ্গা ও বাদামে খিলানগুলির জ্যা ও উচ্চতা জানিলে উহাদের আকার ঠিক করিয়া, কালবুদ প্রস্তুত করিতে পারে না। এইরূপ খিলান তাহারা প্রায়ই আন্দাজে প্রস্তুত করিয়া থাকে। এইজন্য খিলানের জ্যা ও উচ্চতা জানিলে, উহার অন্তর্পরিধি (Intrados) কিরূপে অঙ্কিত করিতে হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

গোল খিলানের কথা লিখিবার আবশ্যক নাই, কারণ ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। ভাঙ্গা খিলানের জ্যা ও উচ্চতা জানা থাকিলে,

প্রথমতঃ উহা যে বৃত্তের অংশ, তাহার ব্যাসার্দ্ধ স্থির করিতে হইবে। উহা স্থির করিবার নিয়ম এইরূপঃ—খিলানের জ্যার বর্গফল এবং উহার উচ্চতার বর্গফলের চারিগুণ; এই উভয়ের যোগফলকে, ঐ উচ্চতার আটগুণ দিয়া ভাগ কর। এই ভাগফল, উক্ত বৃত্ত বা খিলানের ব্যাসার্দ্ধ হইবে যথা, মনে কর একটী চাপা খিলানের জ্যা ৮ ফুট এবং উচ্চতা ২ ফুট। উহার ব্যাসার্দ্ধ বাহির করিতে হইবে।

$৮^২ = ৬৪$; $৪ \times ২^২ = ১৬$; $৬৪ \times ১৬ = ৮০$

$৮ \times ২ = ১৬$; সুতরাং ব্যাসার্দ্ধ $= \frac{৮০}{১৬} = ৫$ ফুট

এইরূপে ব্যাসার্দ্ধ স্থির করিয়া, একটি লম্বা সুতা বা দড়ির মধ্যভাগে একটি গাঁইট দিতে হয়। অনন্তর ঐ গাঁইটের প্রত্যেক পার্শ্বে ঐ ব্যাসার্দ্ধ পরিমিত সুতা বা দড়ি রাখিয়া, উহার অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়। পরে ঐ সুতার উভয় প্রান্ত উক্ত খিলানের জ্যার উভয় প্রান্তে ধরিয়া, গাঁইট ধরিয়া সুতাটী টান্ টান্ করিয়া খিলানের নীচে এবং উহার সহিত এক সমতল ক্ষেত্রে বিস্তারিত করিতে হয়। এক্ষণে গাঁইটটি যে বিন্দুতে থাকিবে, ঐ বিন্দুতে উহা দৃঢ়রূপে ধরিয়া, সুতাটির উভয় প্রান্তের মধ্যে এক প্রান্ত ছাড়িয়া দিয়া, অপর প্রান্তটি ধরিয়া ঘুরাইলেই, খিলানের বৃত্তাংশটি অঙ্কিত হইবে। এইরূপে সুতা ধরিয়া খিলান করিলে, উহাতে দোষ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

উপরে ভাঙ্গা বা চামচিকা খিলানের কথা লিখিত হইল। বাদামে খিলান অঙ্কিত করিবার প্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার। এই খিলানের জ্যা সম দ্বিখণ্ডিত করিয়া তথা হইতে, খিলানের উচ্চতার সমান করিয়া, একটি সরল রেখা লম্বভাবে টান। অনন্তর ঐ লম্বের অগ্রভাগে একটি পেরেক বা কোন প্রকার শক্ত শলাকা পুত। পরে ঐ শলাকায় একটি সুতা বান্ধিয়া উহা খিলানের জ্যার অর্দ্ধভাগের সমান করিয়া কাটিয়া ফেল। উক্ত পেরেক বা শলাকা কেন্দ্র এবং সুতাটি ব্যাসার্দ্ধ করিয়া, একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিলে, উহার পরিধি খিলানের জ্যাকে দুই বিন্দুতে কর্ত্তন করিবে। এই দুই বিন্দু উক্ত লম্বের উভয় পার্শ্বে থাকিবে। পরে এই দুই বিন্দুতে পূর্ব্বের

ন্যায় দুইটি পেরেক বা শলাকা পুতিয়া, ঐ দুইটি এবং উক্ত লম্বের অগ্রভাগস্থ একটি; এই তিনটি পেরেক বা শলাকা বেড়িয়া একটি সূতা টান্ টান্ করিয়া ত্রিভূজাকারে দৃঢ়রূপে বাঁধ। এক্ষণে লম্বের অগ্রভাগস্থ পেরেকটি উঠাইয়া, এবং উহা দ্বারা সুতাটি টান্ টান্ রাখিয়া, রেখা টানিলে, উহা বাদামে খিলানের আকারে অঙ্কিত হইবে। মাটী বা অন্য কোন সমতল ক্ষেত্রে এইরূপে অঙ্কিত করিয়া, তদনুসারে কাষ্ঠের কালবুদ প্রস্তুত করতঃ তদুপরি খিলান নির্ম্মাণ করিলেই ভাল হয়।

খিলানের ব্যাসার্দ্ধ স্থির করিতে হইলে, উহার জ্যা ও উচ্চতা জানা আবশ্যক। যে ফাঁকের উপর খিলান হইবে, খিলানের জ্যা সেই পরিমিত হইবে, সুতরাং উহা সর্ব্বদাই জানা থাকে। উচ্চতাটি জ্যার পরিমাণ অনুসারে স্থির করিয়া লইতে হয়। যদি খিলানটি বিশেষ শক্ত করিবার আবশ্যক হয় এবং স্থানাভাব না থাকে, তাহা হইলে গোল খিলান করাই ভাল। গোল খিলানের উচ্চতা যে জ্যার অর্দ্ধ পরিমিত হইবে ইহা সকলেই বিদিত আছেন, সুতরাং বলা নিষ্প্রয়োজন। স্থানাভাব হইলে কিম্বা রকম বা সৌন্দর্য্যের জন্য ভাঙ্গা ও বাদামে প্রভৃতি খিলানের আবশ্যক হয়। ভাঙ্গা ও বাদামে খিলান সকলের উচ্চতা, উহাদের জ্যা, উপরিস্থ ভার ও যেরূপ মাল মসলায় খিলানগুলি নির্ম্মিত, তাহার বলের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ঐ উচ্চতা নির্ণয় করিবার বিশেষ কোন নিয়ম নাই। সাধারণ গৃহাদিতে উক্ত উচ্চতা খিলানের জ্যার ১/৮ অংশ হইতে ১/৬ অংশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পুল বা বড় বড় খিলানে ঐ উচ্চতা জ্যার ১/৮ অংশ হইতে ১/২ অংশ পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। ভাঙ্গা খিলানের উচ্চতা নির্ণয় করিবার কালে ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, খিলানের উচ্চতা যত অধিক হইবে, উভয় পার্শ্বের দেওয়ালে ইহার চাপ তত অল্প পড়িবে; এবং উচ্চতা যত কম হইবে উক্ত চাপ ততই বৃদ্ধি পাইবে।

খিলানের উচ্চতা স্থিরীকৃত হইলে, উহার স্থূলতা নির্ণয় করা আবশ্যক। খিলানের স্থূলতা, উহার উচ্চতা, উপরিস্থ ভার এবং মাল মসলার উৎকর্ষ ও অপকর্ষের উপর নির্ভর করে। সাধারণ গৃহাদির খিলান ১ ফুট

৩ ইঞ্চ মোটা করিলেই যথেষ্ট হয় এবং সাধারণতঃ প্রায় সমুদয় গৃহের খিলানই এইরূপ মোটা করা হইয়া থাকে। সর্ব্ব উপর তলের খিলান ১০ ইঞ্চ মাত্র মোটা করিলে চলে। চাপা বা সমতল খিলানের উপর আর একটি গোল বা ভাঙ্গা খিলান করা উচিত। এই খিলানকে দোহারা (Revieling arch) খিলান কহে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, চাপা খিলান ইষ্টক নির্ম্মিত কড়ি ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহার ভারবহ শক্তি নাই বলিলেই হয়। এইরূপ খিলানের সমতল অংশ ১০ ইঞ্চ এবং উপরের দোহারা খিলান ১ ফুট ৩ ইঞ্চ মোটা করিতে হয়। অনেকে এই দোহারা খিলানটির উদ্দেশ্য বুঝে না; এবং সেই জন্য নীচের সমতল খিলানটি অধিক মোটা এবং উপরের দোহারা খিলানটি নামমাত্র করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা সমতল খিলানের উপর আদৌ দোহারা খিলান নির্ম্মাণ করেন না। কিন্তু এরূপ করায় খিলানটি যে নিতান্ত হীন-বল হয় তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র। সমতল খিলানের উপর দোহারা খিলান নির্ম্মাণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অনেক গৃহস্থকে পল্লিগ্রামের পথে পাকা পুল বা সেতু নির্ম্মাণ করাইতে হয়। তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমরা এরূপ সেতুর খিলানের স্থূলতা নিরূপণ করিবার নিয়ম নিম্নে লিখিতেছি।

মনে কর খিলানের স্থূলতা = খ—

খিলানে জ্যা অর্থাৎ পুলের ফোকরের প্রস্থ = জ

তাহা হইলে, $খ = \frac{}{৩০} + ১.১$

উদাহরণ। যদি পুলের ফোঁকর ১০০ ফুট হয়, তাহা হইলে উহার খিলানের স্থূলতা $\frac{১০}{৩০} \times ১.১ = ১.৪ =$ ১ ফুট ৫ ইঞ্চ হইবে। কিন্তু ১' ফুট ৫ ইঞ্চ ইটের মাপ মিলে না, এইজন্য উক্ত স্থূলতা ১ ফুট ৩ ইঞ্চ করিলেই চলিতে পারে।

এঞ্জিনিয়ার র‍্যাঙ্কিন্ সাহেবের মতে উপরোক্ত নিয়মে খিলানের স্থূলতা বাহির না করিয়া, নিম্নোক্ত নিয়মে করা ভাল। তিনি বলেন যে, যদি

এক ফুকারের পুল হয়, তাহা হইলে উহার খিলানের স্থূলতা $=\sqrt{০.১২ব}$; ব = খিলানের ব্যাসার্দ্ধ। আর যদি দুই বা ততোধিক খিলানের পুল হয় তাহা হইলে উক্ত স্থূলতা $=\sqrt{০.১৭ব}$;

খিলানের জ্যা ও উচ্চতা জানা থাকিলে উহার ব্যাসার্দ্ধ বাহির করিবার নিয়ম পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে ব্যাসার্দ্ধ যদি জানা না থাকে, তাহা হইলে, সেই নিয়মানুসারে উহা স্থির করিয়া, পরে খিলানের স্থূলতা বাহির করিতে হইবে।

খিলানের ব্যাসার্দ্ধ, উচ্চতা ও স্থূলতা নিরূপিত হইলে, উহা গাঁথিতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। কিন্তু গাঁথিবার সময় বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক। গাঁথিবার পূর্ব্বে, কালবুদ—অর্থাৎ যাহার উপরে খিলানটী নির্ম্মিত হইবে, ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। কাষ্ঠ নির্ম্মিত কালবুদ হইলেই ভাল হয়; কিন্তু সচারাচর প্রায় বাঁশ, ইট, মাটী ও সুরকি প্রভৃতি দ্বারা কাঁচা কালবুদ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এইরূপ কালবুদ প্রস্তুত করিতে রাজমিস্ত্রিগণ, বাঁশগুলি প্রায়ই খিলানের গোড়ায় কিয়ৎ পরিমাণে ঢুকাইয়া দেয় এবং তাহাতে খিলানের গোড়া অপেক্ষাকৃত সরু হওয়ায়, খিলানটীর বলের হ্রাস হইয়া যায়। এরূপে কালবুদ করা কোন মতে বিধেয় নহে। বাঁশগুলি ঠিক ফুকরের সমান করিয়া কাটিয়া, ঐগুলি, বাঁশ বা কাষ্ঠের খুঁটি দ্বারা যথাস্থানে সন্নিবেসিত করা উচিত। গাঁথনির ভিতর অণুমাত্রও ঢুকাইয়া দেওয়া উচিত নহে। পরে খিলান হইয়া যাইলে, কালবুদটী খুলিবার কালে, উক্ত খুঁটিগুলি খুলিয়া ফেলিলেই কালবুদটী পড়িয়া যাইবে, দেওয়াল বা খিলানে কিছুমাত্র চোট লাগিবে না। কালবুদ প্রস্তুত করিবার সময় এই বিষয়টীতে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। কালবুদ নির্ম্মাণকালে প্রথমতঃ খিলানের কেন্দ্র বা কেন্দ্রগুলি স্থির করিয়া তথায় শলাকা বিদ্ধ করা উচিত। অনন্তর ঐ শলাকায় সূতা বান্ধিয়া, খিলানের ব্যাসার্দ্ধের মাপে, চালকা ফিরাইয়া কালবুদের উপরিভাগটী ঠিক খিলানের বাঁকমত প্রস্তুত করা উচিত। রাজমিস্ত্রিগণ কালবুদ নির্ম্মাণকালে সচরাচর আর একটী দোষ করিয়া থাকে। তাহারা অসাব-

ধানতা প্রযুক্ত, কালবুদের বাঁশগুলি প্রায়ই সরু সরু দিয়া থাকে এবং কালবুদের উপরিভাগ অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা দিয়া পুরাইয়া দেয়। খিলান নির্ম্মিত হইলে, উহার ভারে বাঁশগুলি প্রায়ই মধ্যভাগে নত হইয়া পড়ে এবং মাটিগুলি উপরের চাপে বসিয়া যায়, সুতরাং খিলানটী বিকৃত হইয়া যায়। যাহাতে এই দোষ না ঘটে, কালবুদ নির্ম্মাণকালে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

খিলান গাঁথিবার কালে প্রত্যেক ইট্‌খানি কড়ান ধরিয়া গাঁথা উচিত; অর্থাৎ কেন্দ্রে বদ্ধ সূতাটী টান্ টান্ করিয়া খিলানের ইটের গায় ধরিলে, উহা যেন সর্ব্বতোভাবে খড়ায় লাগিয়া থাকে। রাজমিস্ত্রিগণ সচরাচর এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখে না এবং তজ্জন্য প্রায়ই খিলানের কোন স্থানে অধিক এবং কোন স্থানে অল্প মসলা লাগে। ইট্‌গুলি যথানিয়মে না বসিলে, খিলানের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, সুতরাং খিলানটী অপেক্ষাকৃত হীন-বল হইয়া পড়ে। ইট্‌গুলির উভয় প্রান্ত সমান মোটা হওয়ায়, কড়ান ধরিয়া গাঁথিলে খিলানের নিম্নমুখ অপেক্ষা, উপরের মুখে অধিক মসলা লাগিয়া থাকে। এই দোষ নিরাকরণ করিবার জন্য খিলানটী সমগ্র স্থূলতায় একেবারে না গাঁথিয়া, অর্দ্ধইটী পরিমিত পৃথক পৃথক লহরে (ring) গাঁথা ভাল। কারণ পাঁচ ইঞ্চের ভিতর, নিম্ন ও উপর প্রান্তের বিভিন্নতা প্রায় অনুভব করা যায় না। খিলানের চাবি (Key) ইট বা মধ্যস্থলের ইট্‌খানি খুব জোর করিয়া বসান উচিত। ঐ ইট্‌খানি আল্‌গা থাকিলে, খিলানটী নিতান্ত হীন-বল হয়। রাজমিস্ত্রিগণ এই বিষয়ে প্রায়ই ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। তাহারা মধ্যস্থলের ইট্‌খানি বসাইয়া, প্রায়ই উহার উভয় পার্শ্বে সুরকি দিয়া পুরাইয়া দেয়। গৃহস্থের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। সাধারণ রাজমিস্ত্রিগণ ভাঙ্গা খিলান গাঁথিবারকালে প্রায়ই একটী ভয়ানক দোষ করিয়া থাকে। কড়ান ধরিয়া গাঁথিতে হইলেই, গোল ও বাদাম খিলানের প্রত্যেক প্রান্তরে প্রথম ইট্‌খানি সমতল-ভাবে বসিয়া থাকে এবং ভাঙ্গা খিলানের, উক্ত ইট্‌দ্বয় কড়ান অনুসারে কাত হইয়া বসে; সুতরাং দেওয়ালের যে অংশে খিলানটী নির্ম্মিত হইবে

উহা কড়ান ধরিয়া চালুভাবে গাঁথা উচিত। সাধারণ রাজমিস্ত্রিগণ ভাঙ্গা খিলান গাঁথিবারকালে প্রায় এরূপ করে না। তাহারা গোল ও বাদামে খিলানের ন্যায়, ভাঙ্গা খিলানেরও প্রত্যেক প্রান্তের প্রথম ইট্‌খানি সমতলভাবে বসাইয়া ইটের এক প্রান্তে অল্প এবং অপর প্রান্তে অধিক মসলা দিয়া, উপরের ইট্‌গুলি ক্রমশঃ কড়ানসই করিয়া আনে। ইহাতে খিলানের গোড়া নিতান্ত হীন-বল হয়। ভাঙ্গা খিলান গাঁথিবার কালে যাহাতে রাজমিস্ত্রিগণ এই দোষ না করে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

খিলান গাঁথা হইলে কতদিন পরে কালবুদ খুলা উচিত, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ কহেন, গাঁথার পর কয়েক দিন রাখিয়া কালবুদ নামান ভাল। কিন্তু সাধারণ গৃহাদিতে সচরাচর যেরূপ আয়াতনের খিলান নির্ম্মিত হয়, তাহার কালবুদ, খিলান নির্ম্মাণের অব্যবহিত পরে খুলিলেও হানি নাই এবং দশ, পোনর দিন বা মাসাবধি রাখিয়া নামাইলেও কোন দোষ ঘটে না। বড় খিলানের কালবুদ খুলিবার সময়ই বিশেষ বিচক্ষণতার আবশ্যক। এইজন্য আমরা এখানে কালবুদ খুলিবার সময়ের বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম না।

গোল ও বাদামে খিলান, দেওয়ালকে ঠেলিয়া ফেলিতে অণুমাত্র চেষ্টা করে না; কিন্তু ভাঙ্গা খিলান দেওয়ালকে বহির্দ্দিকে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে এবং খিলানের উচ্চতা যত কম হয় এই বল তত অধিক হইয়া থাকে, এইজন্য ভাঙ্গা খিলান যে দেওয়ালের উপর নির্ম্মিত হয়, উহার প্রস্থ বিশেষ বিবেচনার সহিত স্থির করা উচিত। আজকাল লৌহের কড়ির উপর ভাঙ্গা খিলানের ছাদ অনেক নির্ম্মিত হইতেছে। ঐ সকল ছাদের প্রত্যেক প্রান্তের খিলান যে, দেওয়ালের উপর নির্ম্মিত হয়, ঐ দেওয়াল যে লৌহ শলাকা দ্বারা নিকটস্থ কড়ির সহিত টানা থাকে, ভাঙ্গা খিলানের উল্লিখিত বলের প্রতিরোধ করাই তাহার উদ্দেশ্য; অর্থাৎ খিলানটী দেওয়ালকে বহির্দ্দিকে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে এবং ঐ শলাকাগুলি ঐ দেওয়ালকে টানিয়া রাখে।

যে সমুদায় খিলানের উচ্চতা, উহাদের জ্যার অর্দ্ধেকের অধিক নহে,

গরম জলেও গণ্ডূষ করিয়া থাকেন। উষ্ণজলে গণ্ডূষ করিলে যদিও কফ, অরুচি, মল ও দন্তের জড়তা নাশ এবং মুখ লঘু হয় বটে কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে উষ্ণোদক গণ্ডূষ করা বিধেয় নহে। কারণ ক্ষীণ ও রুক্ষ ব্যক্তি অথবা যাহার চক্ষু ও মল কুপিত, তাহার পক্ষে উষ্ণোদক গণ্ডূষ প্রশস্ত নহে। শীতল জলে গণ্ডূষ করিলে রক্তপিত্ত এবং মুখের পিড়কা, শোষ, নীলিকা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। ঈষদুষ্ণ জলে গণ্ডূষ করিলে কফ, বাত ও মুখ-শোধ নিবারিত হয় এবং শরীর স্নিগ্ধ থাকে। (৪)

প্রতিদিন দাঁতুন করিলে দন্ত-মূল দৃঢ় হয়। আজকাল অনেকে দাঁতুনের পরিবর্ত্তে ব্রস্, ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দন্ত ধাবনের পক্ষে শক্ত ব্রস্ অতীব অপকারী। কঠিন ব্রস্ দন্ত ও মাড়ি উভয়ের পক্ষেই অপকারক। যাঁহারা কঠিন ব্রস্ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের দাঁতের গোড়া ক্ষয় প্রাপ্ত দৃষ্ট হয়; এরূপ অভ্যাসের ফল এই যে, এতদ্দ্বারা দন্তের মূলে আবশ্যক ও উপযুক্ত পরিমাণ রক্তের পরিচালনা হইতে পারে না এবং তাহাতে দন্তের মূল-দেশ শীঘ্রই শিথিল হইয়া পড়ে। শূকরের কুঁচি অথবা তদ্রূপ কোনরূপ কঠিন লোম দ্বারাই সচরাচর টুথ্ ব্রস্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেরূপ ব্রস্ দন্তের পক্ষে বিশেষ অপকারী। ঐ সকলের ব্যবহার পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তৎপরিবর্ত্তে কোমল ব্রস্ ও তাহার সহিত কিঞ্চিৎ দন্ত মার্জ্জনীর গুঁড়া প্রত্যহ মুখ ধুইবার সময় ব্যবহার করিলেই দাঁত বেশ পরিষ্কার ও সুদৃঢ় থাকিতে পারে।

---

(৪) গণ্ডূষমপি কুর্ব্বীত শীতেন পয়সা মুহুঃ।
কফতৃষ্ণামলহরং মুখান্তঃশুদ্ধিকারকম্॥
মুখোষ্ণোদক গণ্ডূষঃ কফারুচি মলাপহঃ।
দন্তজাড্য হরশ্চাপি মুখলাঘবকারকঃ॥
বিষমূর্চ্ছামদার্ত্তানাং শোষিণাং রক্তপিত্তিনাম্।
কুপিতাক্ষিমলক্ষীণ রূক্ষাণাং স ন শস্যতে॥
সঃ মুখোষ্ণোদক গণ্ডূষঃ।

যাঁহাদের দাঁত পান্‌পা বা অল্পেই অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাঁহাদের পক্ষে স্পঞ্জ রোলার (Sponge roller) ব্যবহার করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাঁহারা দন্ত-শূল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে বাসনা করেন বা যাঁহারা নিজ নিজ দন্ত সুদৃঢ়রূপে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অতিশয় গরম পানীয় দ্রব্য ব্যবহার করা অনুচিত। প্রস্তুত খড়ি* (Prepared chalk) কিম্বা ম্যাগ্‌নেসিয়া মুখ প্রক্ষালনের পক্ষে অতি উপকারী। প্রত্যহ রীতিমত ইহাদের মধ্যে যে কোনটী ব্যবহার করিলে মুখের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়, দন্ত পরিষ্কার থাকে এবং তৎসঙ্গে দাঁতের মাড়িও শক্ত হয়।

দাঁতের গোড়ায় পীড়া জন্মিলে, অথবা ময়লা ধরিলে তাহাতে এক জাতীয় কীট উৎপন্ন হয়; এবং কোন কোন সময়ে পীড়ার পূর্ব্বেই কীট উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল পোকা দন্ত ও মাড়ির পক্ষে অতিশয় অহিত-কর; দন্তের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত তাহাদের শীঘ্রই ধ্বংস করা বিধেয়। নতুবা অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা হাড়ের মধ্যে এরূপে প্রবলভাবে ও এরূপ স্থান অধিকার করিয়া বসে যে, পরিশেষে আর তাহাদিগকে কিছু-তেই দূরীকৃত করা যায় না। দন্তের মূলে ঐরূপ পোকা জন্মিয়াছে কি না তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঐরূপ পোকা জন্মিলে দন্তের গোড়ায় এবং পার্শ্বের মাংসের রং ঈষৎ বা অল্প পরিমাণে ময়লা হয় ও ক্ষয় হইয়া দাঁত অনেক ফাঁক্ ফাঁক্ করিয়া ফেলে। অনেক বালকের পোকা দাঁত এইরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত পোকা ধরিলে দাঁতের গোড়া সময়ে সময়ে শুলায় বা চুলকাইয়া থাকে। তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত অর্থাৎ দন্ত-মূল দৃঢ় ও পোকা বিনষ্ট করিতে হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করা বিধেয়।

আধ ছটাক মার এবং তিন পোয়া পোর্ট মদিরিকা ও সেই পরিমিত বাদামের তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন প্রাতে তদ্দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিতে হইবে।

* চা-খড়ি জলে গুলিয়া কাপড়ে ছাঁকিলে তাহা থিতাইয়া নীচে যে খড়ি জমে, তাহাকে প্রস্তুত চক্ কহে।

নানা কারণে দন্তে রোগ জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে অজীর্ণ দোষ একটী প্রধান কারণ মধ্যে পরিগণিত। অনেকক্ষণ উপবাসী থাকিলে, জ্বরাদি জনিত অনাহারে এবং অন্যান্য কারণেও দন্তরোগ হইয়া থাকে। নিত্য সুন্দররূপে দন্ত ধাবন এবং মুখ প্রক্ষালনে অবহেলা করিলে দন্তমূল বেদনা-যুক্ত এবং দাঁতের উপর এক প্রকার ময়লা জন্মে। এই ময়লাকে পাথরী কহিয়া থাকে। দাঁতে পাথরী জন্মিলে দন্তের উপর এক একখানি চটি পড়ে। দাঁতে ঐরূপ চটি পড়িলে তাহা তুলিয়া ফেলা উচিত। কারণ উহা দ্বারা দাঁত জখম হয়, মাড়িতে বেদনা উৎপাদন করে, এবং শীঘ্রই কিম্বা বিলম্বেই হউক উহা কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। প্রতিদিন দন্ত ধাবন করিলে ঐরূপ চটি জন্মিতে পারে না।

দাঁত উঠিবার সময় হইতে দন্ত সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। শিশুদিগের দুধে দাঁত পড়িয়া যখন স্থায়ী দন্ত উঠিতে থাকে, তখন সর্ব্বদা উহা পরীক্ষা করা উচিত। কাহারও কাহারও এরূপও দেখা যায়, বক্রভাবে দাঁত উঠিতে থাকে, কাহারও আবার একটী দন্তের মূলে আবার আর একটী দন্ত উঠিয়া দন্ত পঁক্তির সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং সেই সময় দন্তচিকিৎসকের সাহায্য লইলে অনায়াসেই তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে। অসমান অতিরিক্ত দন্ত উৎপাটন করিয়া দন্ত-পঁক্তি সমশ্রেণী করা যাইতে পারে।

বাল্যকাল হইতে শিশুদিগকে মুখ প্রক্ষালন করিতে অভ্যাস করান আবশ্যক। নিয়মিতরূপে মুখ প্রক্ষালন না করিলে মুখে এক প্রকার অনিষ্ট-জনক রস সঞ্চার হয়। ঐ রসে নানা প্রকার দন্ত রোগ উৎপাদন করিয়া তুলে। কোন কারণে একটী দাঁত নষ্ট হইলে অন্যান্য দন্তের হানি করিয়া থাকে। এজন্য দাঁতের গোড়ায় একটু বেদনা হইলেই দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা তাহা পরীক্ষা করা অতীব আবশ্যক। সর্ব্বদা দন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন রাখাই প্রধান চিকিৎসা।

কঠিন প্রকার দাঁতন কিম্বা ব্রস্ দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করা উচিত নহে। তদ্বারা দাঁত ও মাড়িতে বেদনা হয়। কোন কারণে দাঁতের মূল অর্থাৎ মাড়ী

বিকৃত হইলে তথায় আবশ্যকীয় রক্ত সঞ্চার হইতে পারে না। সুতরাং সহজেই দন্তের অপকার সাধন করিয়া তুলে।

দন্তমূলে বেদনা হইলে নরম দন্ত মার্জনী কিম্বা ব্রস্ দ্বারা তাহা ধৌত করা ভাল। স্পঞ্জ কোন কঠিন পদার্থে বাঁধিয়া তদ্বারা দন্তধাবন করিলে কোন প্রকার অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে না। আর খড়ি কিম্বা অন্য কোন প্রকার চূর্ণ দ্বারা মার্জ্জনা করিলেও উপকার হইতে পারে। দন্ত-রোগে ম্যাগ্‌নেসিয়া চূর্ণ দ্বারা মুখ ধুইলে অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে। দন্তপংক্তির পশ্চাতে ময়লা (পাথরী) সঞ্চার হইলে দিনের মধ্যে দুইবার গন্ধক চূর্ণ দ্বারা মার্জনা করিলে তাহা উঠিয়া যায়।

ভাল রকম পরিপাক শক্তি ও স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকিলে এবং উদ্ভিজ্জ্যাদি আহার করিলে দন্ত-রোগ প্রায় হয় না। এজন্য দেখা যায়, কৃষক প্রভৃতি সুস্থ এবং উদ্ভিজ্জ্যাহারীদিগের প্রায় দন্তরোগ হয় না। বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত দন্ত দৃঢ় থাকে। সুস্থ ব্যক্তির দন্ত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দৃঢ় এবং স্বাভাবিক বর্ণ বিশিষ্ট দেখা যায়। আর অজীর্ণাদি রোগ হইলে মুখে যে এক প্রকার দূষিত রস সঞ্চার হয়, তদ্বারা দন্ত–মূলের পীড়া উপস্থিত করে। এই জন্য অনেক তরুণ বয়স্ক যুবার দন্তের দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে। অজীর্ণাদি রোগে মুখে, জিহ্বায় এবং দন্তে এক প্রকার বেদনা করিতে থাকে। সর্ব্বদা দাঁত কন্‌কন করে। পরিপাক-শক্তি ভাল রকম থাকিলে যদিও দাঁতের কন্‌কনানি উপস্থিত হয় কিন্তু তদ্বারা ঐ প্রকার বেদনা ভিন্ন অন্য কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। সুস্থ ব্যক্তির কোন কারণে দন্তরোগ হইলে তাহা অধিক দিন থাকে না, শীঘ্রই উহা ভাল হইয়া থাকে।

দন্তের প্রজনন, বৃদ্ধি এবং হ্রাস আছে। অতএব যাহাতে দন্তের জীবনী শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। সামান্যরূপ অযত্নে মহোপকারী দন্তের বিস্তর অনিষ্ট হইয়া থাকে। দন্ত নিরেট পদার্থ এবং পরিচালক, সুতরাং তাপ বা শৈত্য এক স্থানে লাগিলে অন্যান্য ভাগে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। সহসা গরম হইতে ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা ঠাণ্ডা হইতে গরম হইলে দাঁতের পীড়া হইয়া থাকে। কারণ হটাৎ এরূপ

পরিবর্ত্তন হইলে স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া দন্তের শিথিলতা হইয়া পীড়া উপস্থিত করিয়া তুলে। অত্যুষ্ণ দুগ্ধ, চা প্রভৃতি গরম জিনিষ আহার করা উচিত নহে। তদ্দ্বারা দন্ত-রোগ জন্মে, আর যদি গরম পদার্থ আহার করা যায়, তবে তৎক্ষণাৎ শীতল পানীয় প্রভৃতি ঠাণ্ডা জিনিস আহার করা অকর্ত্তব্য।

দন্তের কোন স্থানে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তথায় পুটিং করিয়া তাহা পূর্ণ করত সমতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য; নতুবা তথায় ময়লা সঞ্চিত হইয়া তাহা বৃদ্ধি করিতে পারে এবং পরিশেষে দন্ত পতিত হইবার সম্ভাবনা।

ভূমিষ্ঠ হইবার তিনমাস হইতে মাড়ির ভিতর দাঁতের সূত্রপাত হয়; এই সময় হইতে সমুদায় দন্তোদ্গম পর্য্যন্ত মাড়ি টাটায়, সর্ব্বদা লাল পড়িতে থাকে এবং পেটের পীড়া হয়। এই সময় যদি প্রসূতি আহারাদিতে নিয়ম করিয়া না চলেন, তবে শিশুর পেটের পীড়া, অল্প জ্বরভাব এবং গামর হামের ন্যায় বাহির হয়। দন্তোদ্গমই যে, ঐ সকল অসুখের কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দন্তোদ্গমের সময় স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া থাকে। ফলতঃ দন্তোদ্গমের সময় নানা প্রকার কষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং প্রসূতি ও ধাত্রীগণের এ সম্বন্ধে স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয় জানা আবশ্যক।

প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদিগের দাঁত বত্রিশটী। প্রত্যেক শ্রেণীতে ষোলটী করিয়া শ্রেণীবদ্ধ। বয়োবৃদ্ধির সহিত খাদ্যের প্রয়োজন মত দন্ত উঠিয়া থাকে। সমুদায় দন্তগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ প্রথম চারিটী কর্ত্তন করিবার উপযোগী, তাহার পর দুইটী শ্বদন্ত, তাহার পর ছয়টা চর্ব্বনের দন্ত, কিন্তু শিশুদিগের প্রথম শ্রেণীতে কুড়িটী দাঁত উঠিয়া থাকে। আবার ঐ কুড়িটী দাঁত একবারে উঠে না, খাদ্যের প্রয়োজনানুসারে ক্রমে ক্রমে উঠিতে থাকে।

কোন কোন সময় এরূপও দেখা যায়, কোন কোন শিশু দন্ত লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। শিশুদিগের মাড়িতে দাঁত উঠিবার নির্দ্দিষ্ট এক একটী স্থান থাকে, তৃতীয় মাসে ঐ স্থান একটু উঁচু হইয়া উঠে। পরে সেই স্থান হইতে অল্পে অল্পে দাঁত উঠিয়া

থাকে। দাঁতের অগ্রভাগ অর্থাৎ ধারাল দিক মাংস ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। সকল শিশুর দাঁত উঠিবার একরূপ নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, অর্থাৎ কাহার শীঘ্র উঠে, কাহার কিছু বিলম্বে দাঁত উঠিয়া থাকে। কাহারও কাহারও পৈত্রিক নিয়মানুসারে অর্থাৎ পিতার যে বয়সে দাঁত উঠিয়া থাকে, সন্তানেরও সেই বয়সে দন্তোদ্গম হয়। সচরাচর প্রায় ছয় মাস হইতে ষোল মাসের মধ্যে দাঁত উঠিয়া থাকে।

দাঁত উঠিবার সময় মাড়িতে বেদনা, একটু শক্ত, কিঞ্চিৎ স্ফীত, এবং চক্‌চকে হয়, এই সময় মাড়ি সুড় সুড় করে, আর অধিক লাল পড়িতে থাকে। পরে মাড়ির উপর সাদা দাগ পড়ে অনন্তর ঐ দাগে দাগে দাঁত উঠে। দাঁত উঠিবার সময় প্রায় শিশুদিগের পেটের পীড়া, বমন এবং সামান্য জ্বর বোধ হইয়া থাকে। কোন কোন শিশু অত্যন্ত খিটখিটে হইয়া উঠে। সর্ব্বদা মুখের ভিতর হস্ত প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করে; এই সময় মাড়ির উপর অাঙ্গুল কিম্বা নখ দিয়া খুঁটিলে আরাম বোধ করিতে থাকে। কোন কোন শিশুর এই সময় ওষ্ঠ ফাটিতেও দেখা যায়। রুগ্ন শিশুদিগের প্রথম হইতে জ্বর হয়, নিদ্রা ভাল হয় না, চমকিয়া উঠে, দৃষ্টি বিকৃত হয়, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে থাকে, কখন কখন অজ্ঞান হয় এবং অস্বাভাবিক নিদ্রা হইতে দেখা যায়। শিশুদিগের এইরূপ লক্ষণ দেখা গেলে শীঘ্র তাহাদিগের মস্তিষ্ক শীতল করিবার ব্যবস্থা না করিলে মৃত্যু হইবার সম্ভব। এই সময় মৃদু বিরেচক ঔষধ দেওয়া উচিত। হাতির দাঁতের কিম্বা কাঠের চুষি অর্থাৎ চোষনকাটি অথবা বাসী পাঁউরুটির ছিল্‌কা মাড়িতে অল্প ঘসিলে অথবা ফুসফুস ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইলে উপশম হইয়া থাকে। গরম জলে স্নান করাইয়া ঘর্ম্ম উৎপাদন করাইতে হইবে। এই সকল অনুষ্ঠান করিলে রক্তের চলাচল সহজ হইবে এবং বিপদ বা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকিবে না।

দাঁত উঠিবার সময় শিশু অত্যন্ত আক্রান্ত হইলে সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করান যে, আবশ্যক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। শিশুর দাঁত উঠিতে কষ্ট হইলে অবিলম্বে মাড়ি চিরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক

জনক জননী চিরিবার কথা শুনিয়াই মহাভীত হইয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ ভয়ে অপকার ভিন্ন উপকারের কোন-আশা নাই। রোদনপরায়ণ শিশুর সহসা হাস্য বদন দেখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই মাড়ি চিরিয়া দেওয়া উচিত। প্রকৃতির নিয়মানুসারে যদিও আপনা হইতে দাঁত উঠিয়া থাকে, কিন্তু উহা উঠিতে বিলম্ব হইলে নানা প্রকার বিপদ হইবার সম্ভব। বিশেষতঃ পেটের পীড়ায় শিশু অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। কখন কখন মাথায় জল উঠে, এবং অজ্ঞানতা ও খচুনি হইতেও দেখা যায়। যখন দেখা যাইবে দাঁত মাড়ির ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না, তখন আর বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ মাড়ি চিরিয়া দন্তোদ্গমের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। মাড়ি লম্বালম্বীভাবে চিরিয়া দিতে হয়। এবং তাহা যেন আধ ইঞ্চির অধিক লম্বা না হয়। পরে ঢেরা কাটার ন্যায় তাহা আবার চিরিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে চিরিয়া দিলে চারিদিকের মাংস সঙ্কুচিত হইয়া দাঁত উঠিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। একটীমাত্র চিরাতে দাঁত বাহির হইতে বিলম্ব হইতে পারে এবং শীঘ্র চিরা মুখ জোড়া লাগিবারও সম্ভব, সুতরাং পুনর্ব্বার চিরিবার প্রয়োজন হইয়া উঠে, কিন্তু ঢেরা কাটার ন্যায় চিরিয়া দিলে ঐ প্রকার আশঙ্কা থাকে না।

মাড়ি চিরিয়া দিলেই শিশুরা অত্যন্ত আরাম বোধ করিয়া থাকে। এজন্য প্রায় দেখা যায় চিরিয়া দেওয়ার পরই তাহারা নিদ্রিত হইয়া থাকে। এবং নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে অসুস্থের কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

দন্তোদ্গমের সময় যদিও শিশুদিগের নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভব, কিন্তু সুপথ্য, পরিষ্কৃত পরিচ্ছিন্ন শয্যা ও বস্ত্র এবং নির্ম্মল বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। লিখিত নিয়মে প্রতিপালন করিয়া যদি তাহাদিগকে প্রফুল্ল রাখা যায়, তবে যদিও দন্তোদ্গমজনিত সমুদায় অসুখের নিবারণ না হউক কিন্তু অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে।

যখন দেখা যাইবে, শিশুদিগের পেট ও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়াছে, মাড়ি ফুলিয়া উঠিয়াছে, অধিক পরিমাণে লালা নির্গত হইতেছে, মুখ

শাল হইয়াছে, সর্ব্বদা খিট্‌খিটে ভাব দেখা যাইতেছে এবং জ্বর প্রকাশ হইতেছে, তখন খাদ্যের পরিমাণ এবং তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জ্বর ও পেটের পীড়ায় ঔষধ দিতে এবং মাড়ি চিরিবার পক্ষে আদৌ বিলম্ব করা উচিত নহে।

দন্তোদ্গম ও তাহার রক্ষা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, প্রত্যেক গৃহস্থকেই তৎসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা যে, একটী গুরুতর কর্ত্তব্য, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

পরিচ্ছদ।

পরিচ্ছদ কেবলমাত্র যে, শরীরের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে, এরূপ নহে। পরিচ্ছদের উপর শারীরিক স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকে। এজন্য স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মের মধ্যে পরিচ্ছদের ব্যবহার সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক গৃহস্থগণের একটী গুরুতর কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত।

প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় দেশের প্রকৃতি ভেদে মনুষ্যদিগের পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পশু পক্ষী আদি প্রাণিবর্গের ন্যায় মনুষ্যগণ শরীর রক্ষোপযোগী পরিচ্ছদ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। যে দেশে যে সকল প্রাণির আদিম বাসস্থান তাহারা সেই দেশের প্রকৃতি অনুসারে শরীরে লোম কিম্বা পালক লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এজন্য দেখা যায়, গ্রীষ্ম দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশের প্রাণিদিগের দেহে লোমের ভাগ অধিক। জগদীশ্বর মনুষ্যদিগের জন্য সে প্রকার স্বভাবজাত পরিচ্ছদ প্রদান করেন নাই। মনুষ্যগণ জল, বায়ু এবং দেশের প্রকৃতি অনুসারে স্ব স্ব পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া লইয়া থাকে।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়; অর্থাৎ উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। শৈত্য ও উষ্ণতা হইতে দেহের স্বাস্থ্য যাহাতে অব্যাহত থাকে, তাহাতে মনোযোগ দিতে হয়। সুস্থ ব্যক্তির খাদ্য হইতে রোগীর খাদ্যাদি সম্বন্ধে যেমন প্রভেদ লক্ষিত হইয়া

থাকে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রভেদ বিদ্যমান আছে। আজি কালি আমাদের সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তনানুসারে পরিচ্ছদ বিষয়েও বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠিয়াছে, অতএব এ সময় এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করা উচিত নহে।

লোকে একটী চলিত কথায় বলিয়া থাকে "আপ রুচি খানা আর পর রুচি পেঁধা।" এই মোটা কথার ভিতরও অনেকটা সার কথা আছে। অর্থাৎ যে সমাজে থাকা যায়, সেই সমাজের সাধারণ মানব-মণ্ডলীর রুচির উপর অনেকটা পরিচ্ছ মনোনীত করিবার ভার ন্যস্ত দেখা যায়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, দেশের প্রকৃতি ভেদে পরিচ্ছদেরও ব্যবহার বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সাধারণ রুচি উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, তাহা হইলে স্বাস্থ্য রক্ষা ভিন্ন, গৃহকার্য্য সম্বন্ধেও নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। মনে কর আমাদের দেশ রমণীগণের উপর অনেক প্রকার গৃহ কার্য্য ন্যস্ত আছে এবং আমাদের সমাজে উপবেশন, গৃহ-কার্য্য সাধন প্রভৃতি যেরূপ নিয়মে সাধিত হইয়া থাকে, তাহাতে যদি এতদ্দেশীয় রমণীগণ ইয়ুরোপীয় মহিলাদিগের ন্যায় সর্ব্বদা গাউন পরিধান করিতে থাকেন, তবে ঐ সকল বিষয়েরও বিস্তর পরিবর্ত্তন করিতে হয়। যে দেশের অধিবাসীদিগের যেরূপ খাদ্য প্রকৃতি সিদ্ধ তাহা পরিবর্ত্তন করলে যেমন স্বাস্থ্যের মূলে আঘাত লাগিয়া থাকে, সেইরূপ পচ্ছিদ বিষয়েও পরিবর্ত্তন ঘটাইলে স্বাস্থ্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মনে কর আমরা যদি সর্ব্বদা ইংরাজদিগের ন্যায় গরম পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে শীতকালে এক প্রকার কষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হই, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ঐরূপ বস্ত্র ব্যবহার করিলে পরক্ষ সম্বন্ধে অনিষ্টের কথা ত্যাগ করিলেও প্রত্যক্ষ তাহার কষ্টের বিষয় কেনা স্বীকার করিবেন? দারুণ গ্রীষ্মের উত্তাপে সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত, এমন কি অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করিলেও কষ্ট বোধ হইয়া থাকে, প্রাণ আই ঢাই করিতে থাকে, সে সময় ফ্লানেল, বনাত

এবং কাশ্মীরি প্রভৃতি বস্ত্র পরিধান করিলে যে প্রকার যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা কাহার অবিদিত আছে। অতএব আধুনিক সভ্যতার খাতিরে যাঁহারা ঐরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কষ্টের কথা মনে হইলে আমাদেরও অন্তঃকরণে ক্লেশ হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের যেরূপ জল, বায়ু এবং উত্তাপ তাহাতে কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রই আমাদের স্বাস্থ্যের প্রধান উপযোগী। তবে শীতকালে এবং রুগ্ন অবস্থায় যে, ঐ প্রকার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এদেশে এক প্রকার প্রকৃতির পরিচ্ছদ কখনই ব্যবহার হইতে পারে না। ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত আমাদেরও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এদেশে সাধারণত গ্রীষ্ম ও শীতকালের উপযোগী বস্ত্র ব্যবহার করিলেই চলিতে পারে। শীতকালে গরম বস্ত্র ব্যবহার না করিলে শরীরের তাপ রক্ষা হয় না; পশমী কাপড় অপরিচালক অর্থাৎ উহা ব্যবহার করিলে দেহের স্বাভাবিক তাপ দেহেই রক্ষিত হইয়া থাকে এবং বাহিরের উত্তাপ সঞ্চিত হইয়া দেহ গরম রাখিয়া থাকে। শীত ঋতুর প্রারম্ভ হইতে গরম কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করা যেমন আবশ্যক, সেইরূপ শীতা-বসানে আবার উহা সহসা পরিত্যাগ করাও উচিত নহে। কারণ শীতের কয়েক মাস গরম বস্ত্র ব্যবহার করাতে চর্ম্ম এরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে, হটাৎ হিম লাগিলে সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি পীড়া হইয়া থাকে। এজন্য শীতাবসানে ক্রমে ক্রমে গরম কাপড় পরিত্যাগ করিতে হয়। হিমপ্রধান দেশের ন্যায় এদেশে তত গরম বস্ত্র ব্যবহার না করিলেও তত অনিষ্ট আশঙ্কা থাকে না। বিশেষতঃ শ্রমজীবী লোকদিগের পক্ষে গরম কাপড় ব্যবহার না করিলে কোন প্রকার অপকার হইতে দেখা যায় না। এজন্য বোধ হয় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন ভদ্র লোকদিগের ন্যায় এতদ্দেশীয় কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবীগণ কোন প্রকার গরম কাপড় ব্যবহার করে না অথচ তাহাদিগের সর্দ্দি প্রভৃতি কোন প্রকার অসুখ হয় না। তাহার কারণ তাহারা শৈশবকাল হইতেই অনাবৃত গাত্রে থাকিতে অভ্যাস

করিয়া থাকে, সেই জন্য তাহাদিগের গাত্রস্থ চর্ম্মে হিম ও উত্তাপ সহনীয় শক্তি বৃদ্ধি পায়, সুতরাং উলঙ্গ গাত্র-জনিত কোন প্রকার অপকার উপস্থিত হয় না।

শিশুদিগকে বাল্যকাল হইতে মোজা এবং গরম কাপড় ব্যবহার অভ্যাস করাইতে দেওয়া অত্যন্ত অনিষ্টকারী। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সর্ব্বদা ঐ সকল পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে চর্ম্ম এরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে, অল্পমাত্র শীতল বায়ু লাগিলেই পীড়া উপস্থিত করিয়া থাকে। শীত-কালে গরম মোজা ও বস্ত্রাদি ব্যবহার করাইলে শীত শেষ হইবার সময় খুলিয়া প্রত্যুষে এবং সন্ধ্যাকালে ব্যবহার করিতে দিতে হয়। এইরূপ নিয়মে দুই এক সপ্তাহ করিয়া পরিশেষে উলঙ্গ গাত্রে রাখিলে কোন অপকার ঘটিতে পারে না।

এদেশ যেরূপ উষ্ণ তাহাতে গ্রীষ্মকালে কোন প্রকার পশমী কাপড় ব্যবহার করা উচিত নহে। সর্ব্বদা পশমী কাপড় ব্যবহার করিলে চর্ম্মে শৈত্য এবং উত্তাপ সহনীয় শক্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে, তদ্ভিন্ন আর একটী মহা অপকার ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে অসহ্য গ্রীষ্মে একেই সর্ব্বদা ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া থাকে, তাহার উপর আবার গরম কাপড় ব্যবহার করিলে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া তুলে। অতিরিক্ত ভেদ ও বমি হইলে যেমন শরীর দুর্ব্বল হইয়া থাকে, প্রয়োজনের অধিক ঘর্ম্ম নির্গমও যে, সেইরূপ দুর্ব্বলতার একটী কারণ তাহা যেন প্রত্যেক ব্যক্তির মনে থাকে।

সুস্থ শরীরে ফ্লানেল কাপড় আদৌ ব্যবহার করা উচিত নহে। তবে যদি অত্যন্ত শীত কিম্বা বর্ষার সজল বায়ু নিবারণ জন্য উহা ব্যবহার করিতে হয়, তবে প্রথমে একটা সূতার কাপড় পরিয়া তাহার উপর ব্যবহার করা যুক্তিসিদ্ধ। অত্যন্ত সর্দ্দি, বাত এবং যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে ফ্লানেল অত্যন্ত উপকারী। রোগীর পক্ষে উপকারী বলিয়া সুস্থ ব্যক্তির তাহা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অন্যায়। মনে কর জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে কুইনাইন বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু সুস্থ ব্যক্তিকে যদি কুইনাইন সেবন করান যায়, তবে অপকার

ভিন্ন কখনই উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। আহার ও পরিচ্ছদ সুস্থ এবং রোগীর পক্ষে একরূপ নিয়মে চলিতে পারে না।

পশমী প্রভৃতি গরম কাপড় ব্যবহার করার মুখ্য উদ্দেশ্য শারীরিক তাপ রক্ষা করা। কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশের লোকের পক্ষে সমান নিয়মে উষ্ণতা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলে অশুভ ভিন্ন কখনই শুভ ফল ফলে না। সুরাপানে শোণিত উষ্ণ হইয়া থাকে, এজন্য হিমপ্রধান দেশের অধিবাসিদিগের উহা যেমন সহ্য হইয়া থাকে, উষ্ণ দেশবাসীগণ উহা পান করিলে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত: প্রভূত অপকার ঘটিয়া থাকে। সেইরূপ হিম প্রধান দেশের লোকে যে সকল পশমী প্রভৃতি গরম কাপড় দেহের উষ্ণতা সম্পাদন জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে, এতদ্দেশীয় লোকে সেইরূপ ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই নানা প্রকার অপকার সাধিত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা গরম কাপড় ব্যবহার আমাদের দেশের পক্ষে যে, মহানিষ্টকারী তাহা সকলেরই মনে রাখা উচিত। বস্ত্র ব্যবহারের মধ্যে যে, এত অনিষ্টের বীজ নিহিত আছে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য না করিয়া শরীরের শোভা বর্দ্ধন জন্য দেহপাত করিয়া থাকেন। ইহা যে যার-পর-নাই আক্ষেপের বিষয় তাহা কেনা স্বীকার করিবেন ?

পরিচ্ছদ ব্যবহারে কেবলমাত্র শোভার প্রতি দৃষ্টি রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। পরিচ্ছদ দ্বারা ত্রিবিধ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, ইহাই মনে রাখা আবশ্যক। লজ্জা নিবারণ, স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়তা এবং শোভাবর্দ্ধন। অতএব পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ব্যবহার করিলে পরিচ্ছদ ধারণের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া থাকে। আমাদের যেরূপ গরম দেশ তাহাতে শীতকাল ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে প্রায় সকলে অনাবৃত গাত্রে থাকিতে ভালবাসেন। তদ্বারা বাহিরের শীতল বাতাস লাগিয়া শরীরের তাপ হ্রাস করিয়া থাকে। নিদারুণ গ্রীষ্মে শরীরে তাপের পরিমাণ কিছু অল্প হইলে শরীর সুস্থ বোধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে লজ্জা নিবারণের পক্ষেও পরিচ্ছদ একটী প্রয়োজনীয় পদার্থ, অতএব তাহাতে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা কখনই সভ্যতার অনুমোদনীয় নহে।

এতদ্দেশীয় রমণীগণ যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা যার-পর-নাই লজ্জা-কর। বিশেষতঃ যে সকল মহিলারা সোরু সাটী ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের তো কথাই নাই। অতএব আমাদের স্ত্রীলোক-দিগের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তন যে, প্রয়োজনীয় তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

যে কোন প্রকার পরিচ্ছদই হউক না কেন, তাহার পরিষ্কার সম্বন্ধে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখা বিধেয়। অপরিস্কৃত পরিচ্ছদ যে রোগের আলয় তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। আমাদের শরীরে অর্থাৎ চর্ম্মের উপর অন্যূন সত্তর লক্ষ লোম-কূপ আছে। ঐ সকল লোম-কূপ দ্বারা শরীরস্থ দূষিত পদার্থ নির্গত এবং বাহিরের নির্ম্মল বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া রক্ত বিশোধিত প্রভৃতি শারীরিক কার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে। মলিন পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে সেই ময়লায় ঐ সকল লোম-কূপ রুদ্ধ হইয়া থাকে। লোম-কূপ রুদ্ধ হইলে উক্ত উভয়বিধ উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইয়া তুলে, সুতরাং তদ্দ্বারা নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। এজন্য পরিচ্ছদমাত্রেই পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। পরিস্কৃত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে মনের প্রফুল্লতা উপস্থিত হইয়া থাকে, সুস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা রোগীদিগের পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখিতে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিতে হয়। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন যখন সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে অপকারক তখন অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে যে, আরও অনিষ্টজনক তাহা কেনা বুঝিতে পারেন। হাম, বসন্ত, খোস প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি-দিগের পরিচ্ছদ দিনের মধ্যে অন্ততঃ তিন চারিবার উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঐ সকল পরিচ্ছদ রজকালয়ে প্রেরণ করিলে সেই সংশ্রবে অন্যান্য বক্তিদিগের বস্ত্রে ঐ সকল রোগের বীজ সঞ্চারিত হইয়া রোগ বিস্তার হইবার সম্ভব। এজন্য তিন চারি ঘণ্টা গরম জলে ঐ সকল পরিচ্ছদ সিদ্ধ করিয়া সাবান, সোডা কিম্বা অন্য কোন প্রকার ক্ষার দ্বারা ধৌত করিয়া লইলে কোন প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কা থাকে না। ওলাউঠা রোগীর মলমূত্রাদি ময়লাযুক্ত পরিচ্ছদ এবং শয্যা লিখিত নিয়মে সিদ্ধ না করিয়া যে পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের জল সাধারণে পান করিয়া থাকে,

তাহাতে ধৌত করিলে ওলাউঠার বীজ যে, সেই সকল জলাশয়ে সঞ্চিত হয়, তাহা যেন প্রত্যেক গৃহস্থের মনে থাকে। কখন কখন এরূপও ঘটিয়াছে, ঐরূপ মলমূত্রাদি ধৌত করার জন্য এক একটী পল্লীতে বিষম রোগ সঞ্চারিত হইয়া ভয়ানক অপকার সাধিত হইয়াছে। এজন্য উহাতে তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে।

আর্দ্র বস্ত্রাদি ব্যবহার করিলেও বিস্তর অপকার হইয়া থাকে। এজন্য অধিকক্ষণ আর্দ্র অর্থাৎ ভিজা কাপড় ব্যবহার করা অহিতকর। পরিচ্ছদ ও শয্যা মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া ভাল। বর্ষাকালে রৌদ্র না থাকিলে সুন্দররূপ বায়ু সঞ্চারিত স্থানে শয্যাদি বিছাইয়া দেওয়াও মন্দ নহে।

যাহাদিগের ছুঁয়াচে রোগ আছে, সেই সকল লোকের ব্যবহৃত পরিচ্ছদ কিম্বা শয্যা অন্য ব্যক্তির ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। অনেক স্থলে পরিচ্ছদ ব্যবহারের দোষেও অনেক প্রকার রোগ বিস্তারিত হইতে দেখা যায়। এজন্য এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

অনেকে কোটিদেশ অর্থাৎ কোমর সরু করিবার জন্য অত্যন্ত কসিয়া বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে কখন কখন কোটিদেশে ক্ষত এবং দদ্রু অর্থাৎ দাদ প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রাণিদিগের গাত্রজ লোম ও কেশ অনেক স্থলে পরিচ্ছদের কার্য্য করিয়া থাকে। এজন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পশু পক্ষ্যাদি অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশের প্রাণিগণের গাত্রে লোমাদি অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যদিগের কেশ দেহের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে একটী প্রধান পরিচ্ছদের কার্য্য করিয়া থাকে। আমাদের মস্তকে কেশ থাকাতে টুপি কিম্বা পাগ্‌ড়ি পরিবার তত প্রয়োজন হয় না। সূর্য্যের উত্তাপ হইতে মস্তিষ্ক রক্ষা সম্বন্ধে কেশ একটী প্রধান সহায়। আমাদের দেশ অপেক্ষা আফ্রিকায় সূর্য্যের উত্তাপ অধিক, এজন্য কাফ্রিদিগের মস্তকের চুল অত্যন্ত ঘন এবং কুঞ্চিত। সর্ব্বদা মস্তক আবৃত রাখিলে মাথা গরম হইয়া কেশ-হীনতা অর্থাৎ টাক পড়িয়া থাকে। কেশের ন্যায় শ্মশ্রু, গোঁপ প্রভৃতি দ্বারাও অনেকগুলি কার্য্য সাধিত হয়। শ্মশ্রু অর্থাৎ দাড়ী রাখিলে

গলদেশ ও বক্ষস্থলের তাপ রক্ষিত হইয়া থাকে। গোঁপ দ্বারা বায়ুর সহিত ধূলি প্রভৃতি কোন দূষিত পদার্থ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে পারে না। চক্ষুর উপরে অর্থাৎ পাতায় যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম থাকে তদ্বারা চক্ষুর বিস্তর উপকার হয়। পুরুষের ন্যায় রমণীগণের যদিও গোঁপ দাড়ী থাকে না সত্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কেমন আশ্চর্য্য কৌশল পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের বক্ষের উপর মেদের ভাগ অধিক, তদ্বারা দাড়ীর কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। রমণীগণের যেরূপ শারীরিক গঠন তদ্বারা পুরুষের ন্যায় শ্রমজনক কার্য্য করিতে সর্ব্বদা বাহিরে বেড়াইতে হয় না, সর্ব্বদা প্রায় গৃহ মধ্যে অবস্থিত করিতে হয়, সুতরাং গোঁপ না থাকায় কোন হানি ঘটে না।

জুতা ও খড়ম পরিচ্ছদ মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। যাহারা ঐ সকল ব্যবহার না করে; তাহাদিগের পদতলের চর্ম্ম কঠিন; এজন্য হিম কিম্বা স্যাঁতা স্থানে ভ্রমণ করিলে ততটা অপকার ঘটে না, কিন্তু যাহারা সর্ব্বদা জুতা ও খড়ম ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা খালি পায়ে বেড়াইলে সর্দ্দি প্রভৃতি পীড়া হইতে দেখা যায়। এস্থলে ইহা যেন সকলের মনে থাকে, আর্দ্র বস্ত্রের ন্যায় ভিজা জুতার ব্যবহারও পীড়াজনক। কটিদেশ আঁটিয়া বস্ত্র ব্যবহার করায় যেমন পীড়াদায়ক, সেইরূপ কসা জুতা ব্যবহার করিলে অসুখ হইয়া থাকে। যে জুতায় অঙ্গুলিগুলি উত্তমরূপে বিস্তারিত থাকিতে পারে, তাহা ববহার করাই সুপরামর্শ।

দুগ্ধ।

শরীর বৃদ্ধি ও শরীর রক্ষার নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক, বিশুদ্ধ দুগ্ধেতে সমস্তই আছে। বিশেষতঃ শিশুর পক্ষে দুগ্ধ আপনাপনিই পরিপাক হইয়া যায়; কোন শক্তিরই প্রয়োজন করে না। জ্বর রোগীর পক্ষে অন্যান্য আহার অপেক্ষা বিশুদ্ধ দুগ্ধ বিশেষ উপযোগী। পুরাতন অজীর্ণ রোগেও দুগ্ধ বিশেষ উপকার করে। পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ কিছু উপ-

যোগী খাদ্য নহে। যাহাদিগের দেহ এখনও সম্পূর্ণ রূপে বৃদ্ধি পায় নাই, দুগ্ধ তাহাদিগের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। দুগ্ধে যে সকল পদার্থ আছে, জন্তু-ভেদে তাহাদিগের পরিমাণ ও গুণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। অবস্থা বিশে-ষেও এক জন্তুর দুগ্ধই ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয়।

নারীর দুগ্ধ লইয়াই অন্যান্য দুগ্ধের গুণাগুণ বিবেচনা করিতে হইবে। অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা গাভীর দুগ্ধই নারীর দুগ্ধের প্রায় সমান। এই জন্যই ইহা সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন গাভীদুগ্ধ নারী দুগ্ধের পরিবর্তে ব্যবহার করিতে হয়, তখন ইহাতে অধিক পরিমাণে জল ও কিঞ্চিৎ শর্করা মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। ছাগীর দুগ্ধ গাভী দুগ্ধ অপেক্ষা গুরুপাক। মেষির দুধে তদপেক্ষাও অধিক গুরুত্ব থাকে। গর্দ্দভী বা অশ্বিনীর দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা লঘু-পাক, কিন্তু সকলের অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট। অশ্বিনীর দুগ্ধ মাতাইয়া এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। উহা ক্ষয়রোগ, পুরাতন কাশ ও আমাশয় রোগে বিশেষ উপকারক। গাভীর দুগ্ধের গুণ অবস্থাদিভেদে বিলক্ষণ বিভিন্ন হইয়া থাকে। প্রসবের পর তিন চারি সপ্তাহ গাভীর দুগ্ধ অব্যবহার্য্য। ইহা বিরেচক ঔষধের ন্যায় কার্য্য করে।

বৃদ্ধ গাভী অপেক্ষা অল্পবয়স্কা গাভীর দুগ্ধ উৎকৃষ্ট। শিশুর পক্ষে, শিশুর বয়স অপেক্ষা গাভীর বৎসের বয়স অল্প হইলেই ভাল হয়। অর্থাৎ যে গাভী দুই মাস প্রসব হইয়াছে, তাহার দুগ্ধ চারি মাসের শিশুর পক্ষে বিশেষ উপকারী। প্রথম দোহন করা দুগ্ধ অপেক্ষা শেষের দোহন করা দুগ্ধের মাটা অধিক। প্রাতঃকালের দুগ্ধ অপেক্ষা অপরাহ্নের দুগ্ধে অধিক নবনীত পাওয়া যায়। আহার ভেদেও গাভী দুগ্ধের বিলক্ষণ তারতম্য হইয়া থাকে। অখাদ্য আহারে দুগ্ধের গুণ একবারে হ্রাস করিয়া ফেলে, পলাণ্ডু, লশুন প্রভৃতি উগ্র উদ্ভিদে দুগ্ধে দুর্গন্ধ করে; বিষাক্ত উদ্ভিদ আহারে দুগ্ধ হানিজনক হয়; উৎকৃষ্ট দুগ্ধ পাইতে হইলে গাভীকে সতেজ ঘাসপূর্ণ গোষ্ঠে চারণ করাই কর্ত্তব্য।

ননি বা মাটার পরিমাণ দেখিয়াই দুগ্ধের গুণাগুণ জানিতে পারা যায়।

দুগ্ধ উত্তম হইবে, তাহাতে অধিক সর, আর নিকৃষ্ট হইলে অল্পমাত্র সর পড়িয়া থাকে। যে পাত্র উত্তমরূপে মার্জ্জিত হয় নাই, তাহাতে দুগ্ধ রাখিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়; নষ্ট দুগ্ধ খাইতে অম্ল বোধ হয়। এই দুগ্ধ খাইলে অম্লশূল, আমাশয় ও মুখে ক্ষতরোগ জন্মে।

দুগ্ধ পুষ্টিকর বটে; কিন্তু সকলের সহ্য হয় না; তিন অংশের এক অংশ চূণের জল মিশাইয়া পান করিলে, দুগ্ধে অম্ল বা অজীর্ণতা জন্মাইতে পারে না; বরং নিয়ম মত পান করিলে ঐ সকল রোগের শান্তি হয়। যাঁহার দুগ্ধ জীর্ণ হয় না, তিনি কোনরূপ অম্লরস মিশাইয়া ব্যবহার করিতে পারেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, লবণ সহিত দুগ্ধ পান করা অকর্ত্তব্য; কিন্তু সে কথা বড় সঙ্গত নহে; কারণ দুগ্ধ গলাধঃকরণ হইয়াই জমিয়া যায়।

আহারের পূর্ব্বে বা কোন খাদ্যের সঙ্গে দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ আহারের পূর্ব্বে দুগ্ধ পান করিলে, ক্ষুধা মন্দ হয়; আর যাহা চিবাইয়া খাইতে হয়, তাহা দুগ্ধের সহিত পান করিলে সহজে জীর্ণ হয় না। আহারের পর এবং শয়নের পূর্ব্বেই দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। জ্বর, আমাশয় ও অন্যান্য নাড়ীপ্রদাহ রোগে দুগ্ধ উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

দুগ্ধের দোষনাশ করিবার জন্য অনেকে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া পান করিয়া থাকেন। কিন্তু যেখানে দুধ স্তনদুগ্ধের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে হইবে, সে স্থলে কদাচ তাহা জ্বাল দিবে না; উহাতে কুসুম কুসুম উষ্ণ জল মিশাইয়া লইবে।

দুগ্ধ থিতাইলে উহার উপরে যে তৈলের মত পদার্থ ভাসিতে থাকে, তাহাকেই মাটা বলে। মাটা হইতে মাখন জন্মে। উদরে যখন অন্য কোন দ্রব্যই না তলায়, তখনও মাটা অনায়াসে ভক্ষণ করা যায়। মাটা তোলা দুগ্ধে ঘৃতের ভাগ অল্প দেখা যায়; সুতরাং যে রোগীর দুগ্ধ জীর্ণ না হয়, তিনি স্বচ্ছন্দে মাটা তোলা দুগ্ধ ব্যবহার করিতে পারেন।

দুগ্ধ জ্বাল দিলে উহার উপর যে ঘৃতের ভাগ জমিয়া যায়, উহাকে সর বলে। সরও উৎকৃষ্ট খাদ্য।

মাখন তুলিয়া লইলে যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে মাখন তোলা দুগ্ধ কহে। মাখন তোলা দুগ্ধে ঘৃতের ভাগ, মাটা তোলা দুগ্ধ অপেক্ষাও অল্প; কিন্তু ইহা বিলক্ষণ পুষ্টি-কর। টাটকা না হইলে ইহাতে অম্ল অম্লরস জন্মে। টাটকা মাটা তোলা দুগ্ধ প্রায় সকল রোগীর পক্ষেই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

দধিও পুষ্টি-কর খাদ্য। ঘোল তাদৃশ পুষ্টি-কর নহে; কিন্তু সহজেই জীর্ণ করা যায়। ইহাতে আমাশয় জন্মাইবার বা পেট কামড়াইবারও কোন আশঙ্কা নাই। পেয় দ্রব্যের মধ্যেও ঘোল অতি তৃপ্তি-জনক। গাত্র-দাহের পক্ষে ঘোল বিশেষ উপকারক।

দুগ্ধের জল মারিয়া কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া কোন এক পাত্র মধ্যে পূরিয়া যদি এরূপভাবে পাত্রের মুখ রদ্ধ করা যায় যে, তাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে দুগ্ধ ২।১ বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। উহা রোগীর পক্ষে বিশেষ ব্যবহার্য্য।

দুগ্ধ বা দধি মন্থন করিয়া যে ঘৃতের ভাগ পাওয়া যায়, তাহাকেই নবনীত বা মাখন বলে। মাখন তুলিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া ও ফেটাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উহা টাটকা থাকে; এবং বিস্বাদ হয় না। মাখন টাটকা রাখিবার জন্ত উহাতে লবণও মিশান হইয়া থাকে। বাতাস না লাগে, এরূপ করিয়া কোন পাত্র মধ্যে রাখিয়া দিলেও মাখন টাটকা থাকে। উপরে প্রত্যহ পরিষ্কার জল ঢালিয়া রাখিলেও মাখন টাটকা থাকিবে।

যাহাদিগের পাক শক্তি ক্ষীণ, তাহারাও বিশুদ্ধ টাটকা মাখন সহজেই জীর্ণ করিতে পারে; কিন্তু অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। বাসি, বিস্বাদ, দুর্গন্ধ বা উত্তপ্ত মাখন অজীর্ণ ও অন্তান্ত রোগে অখাদ্য; খাইলে আমাশয় উৎপাদন করিবে। মাখন বিশুদ্ধ কি না, দৃষ্টি, আস্বাদ ও গন্ধ দ্বারা তাহা অনায়াসেই জানিতে পারা যায়। বিশুদ্ধ মাখনের বর্ণ উজ্জ্বল পীত। মাখনে একখানি পরিষ্কার ছুরি শীঘ্র চালাইলে যদি ডোরার মত দেখা যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, তাহাতে অন্ত দ্রব্য মিশান হইয়াছে। বিশুদ্ধ মাখন গলাইলে অতি পরিষ্কার ঘৃত প্রস্তুত হইবে। বিশুদ্ধ মাখন

খাঁটী দুধই প্রশস্ত। কিন্তু উহা জ্বাল দিতে গেলে ঘন হইয়া যায়; অথচ কিঞ্চিদধিক ক্ষণ জ্বাল না দিলে দোষযুক্ত দুগ্ধের দোষনাশ হয় না। এই জন্যই আর্য্যদ্রব্যগুণবিৎ বলিয়াছেন;

চতুর্থভাগং সলিলং নিধায় যত্নাদ্যদাবর্ত্তিতমুত্তমংতৎ।
সর্ব্বাময়ঘ্নং বলপুষ্টিকারি বীর্য্যপ্রদং ক্ষীরমতিপ্রশস্তম্॥

তিন ভাগ খাঁটি দুগ্ধে এক ভাগ জল দিয়া তাহা যত্ন পূর্ব্বক জ্বাল দিবে; সেই দুধ সর্ব্বরোগনাশক এবং বলবীর্য্য পুষ্টিকর।

গাভীদুগ্ধ পূর্ব্বাহ্নে এবং মহিষীদুগ্ধ অপরাহ্নে পথ্য। দুধের সহিত শর্করা দিলে দোষ নাই। কিন্তু কদাচ অতপ্ত দুধ পান করিবে না, আর তপ্ত দুগ্ধও যেন কদাচ লবণ মিশ্রিত না হয়। মাষ কলায়, মুগ, মৎস্য, মাংস, কন্দ, মুল, গুড় প্রভৃতির সহিত দুধ খাইবে না। মৎস্য, মাংস, গুড়, মুগ এবং মাষ কলায়ের সহিত দুধ পান করিলে কুষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা। শাক, জামের রস প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত দুধ পান করিলে বিষবৎ হইয়া থাকে।

দুধ সুপেয় বলিয়া যে দিবারাত্র যখন তখন পান করিতে হইবে, তাহার কোন কথা নাই।

স্নিগ্ধশীতং গুরুং ক্ষীরং সর্ব্বকালং ন সেবয়েৎ।
দীপ্তাগ্নিং কুরুতে মন্দং মন্দাগ্নিনং নষ্টমেবচ॥

নবপ্রসূতা গাভী, ছাগী প্রভৃতির দুধ মধুর বটে, কিন্তু অধিক ক্ষারযুক্ত, রুক্ষ, পিত্তদাহ এবং রক্তরোগ উৎপাদন করে, এই জন্য ইহা অপেয়। প্রথম প্রসূতা গাভী, ছাগী প্রভৃতির দুধ গুণহীন এবং অসার; মধ্যম বয়সের দুধই তেজস্কর; বৃদ্ধ বয়সের দুধ দুর্ব্বল। প্রসূতা গাভীর তিন মাসের পর যে দুগ্ধ হয়, তাহাই অতি প্রশস্ত।

উদ্ভিদ জাত খাদ্য।

মনুষ্যের খাদ্যের মধ্যে উদ্ভিদই অধিক। বীজ, মূল, পত্র, এবং অন্যান্য নানা প্রকার উদ্ভিদ আহার করা হইয়া থাকে।

যে সকল শস্যে ময়দা বা তদ্রূপ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাই অধিক পরি-

মাণে ও সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সমস্ত খাদ্যই অধিক পুষ্টি-কর। সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে এবং অধিক পরিমাণে সর্ব্ব দেশেই জন্মে।

গোধূম বা গোম।—অন্যান্য শস্য অপেক্ষা গোম বিশেষ পুষ্টি-কর। এই জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র অধিক পরিমাণে গোমের অধিক চাষ করা হইয়া থাকে, গোম পুষ্টি-কর বটে, কিন্তু অধিক শাদা ময়দা বা সুজিতে ততদূর পুষ্টি-কর অংশ থাকে না। আটা বা রাঙা সুজিই বিশেষ পুষ্টি-কর। বিশেষতঃ বালক-দিগের পক্ষে আটা বা রাঙা সুজির রুটিই ব্যবহার্য্য। বিলাতি বা পাঁওরুটি টাটকা অপেক্ষা দুই তিন দিনের বাসী হইলেই শীঘ্র জীর্ণ হয়। টাটকা পাঁউরুটি সহজে জীর্ণ হয় না, এবং অনেকের পক্ষে অম্ল জন্মায়। কিন্তু পাঁউ-রুটী টক ও ছাতা পড়া হইলে আহারের অনুপযুক্ত। পাঁউরুটী পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া আগুণে সেঁকিয়া লইয়া আহার করিলে অতি শীঘ্র জীর্ণ হয়; কিন্তু এরূপ করিয়া সেঁকিতে হইবে যে, যেন তাহার ধার পুড়িয়া না যায়। বিস্কুট পাঁউরুটী অপেক্ষা অধিক পুষ্টি-কর এবং অল্প দিনে নষ্ট হইয়া যায় না। যাহাদিগের অন্য খাদ্য জীর্ণ হয় না, দুধের সহিত বিস্কুটের গুঁড়া তাহারা অনাবাসে ব্যবহার করিতে পারে। জৈয়ের ময়দাও বিলক্ষণ পুষ্টি-কর, ইহা অনেক দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যবের মণ্ড অজীর্ণ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু যবের ছাতু গুরু-পাক। ভুট্টাও অনেক দেশের লোকে আহার করিয়া থাকে, কিন্তু ভুট্টায় ময়দা ভাল হয় না।

পৃথিবীতে যত মনুষ্য আছে; তাহার তিন ভাগের এক ভাগ চাউল আহার করিয়া থাকে। চাউল সুসিদ্ধ করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। চাউলে তৈলের ভাগ অল্প সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত সংযুক্ত করিয়া আহার করা উচিত। দুগ্ধ-পক্ক চাউল বা পরমান্ন সহজে জীর্ণ হয়, সুতরাং উহা রোগীর পক্ষেও উপযোগী। উহাতে যতদূর সম্ভব মিষ্ট দ্রব্য অল্প মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। গ্রহণী ও আমাশয় রোগের পক্ষে চাউলের জল বা ফেলনী বিশেষ উপযোগী।

দাইল।—চাউল, গম, যব ইত্যাদি অপেক্ষা দাইল অধিক পুষ্টিকর কিন্তু কেবল দাইল ভক্ষণ করা অকর্ত্তব্য। ভাত বা রুটির সঙ্গে, আহার

করা উচিত। দাইলও বিলক্ষণ সুসিদ্ধ না হইলে আহার করিবে না। চাউল অপেক্ষা দাইল আরও সুসিদ্ধ করা উচিত।

চাউল, গম, যব ইত্যাদি অন্যান্য প্রকারে ভক্ষণ করা অপেক্ষা মণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিলে শীঘ্র জীর্ণ হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্য কিছু আহার করিতে পারে না, তাহার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহাতে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, উদর পূর্ত্তিও বিলক্ষণ বোধ হয়।

সাগু।—দুদ ও জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া রোগীকে আহার করিতে দিলে রোগী উহা সহজেই জীর্ণ করিতে পারে। সাগু অত্যন্ত লঘু পাক।

আরারুট।—আরারুটের পুষ্টি-কর শক্তি অতি অল্প। উহাতে অধিক-ক্ষণ ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে পারে না। ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং অনায়াসেই গলাধঃকরণ করা যায়, কিন্তু ইহাতে অন্যান্য পুষ্টি-কর দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। যে রোগী অন্য কোন দ্রব্য আহার করিলেই তুলিয়া ফেলে, আরারুট তাহার উদরেও জীর্ণ হইবে।

গোলআলু।—আলু অতি পুষ্টি-কর ও সুখাদ্য। আলু স্বচ্ছন্দে অধিক দিন রাখিয়া [illegible] হ পাক করা যায়। কিন্তু অনেক স্থলেই সহজে জীর্ণ হয় না। যে ব্যক্তি উদর ভরিয়া খাইতে পারে না, সে অন্য দ্রব্য না খাইয়া যদি আলু খায়, তাহা হইলে শীঘ্র তাদৃশ দুর্ব্বল বা রুগ্ন হইয়া পড়ে না। আলু, মাংস, মৎস্য ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিলে আরও অধিক পুষ্টি জন্মে। যে আলু উত্তমরূপ পুষ্ট হয় নাই তাহা সহজে জীর্ণ হয় না। পরিপুষ্ট আলুও সুসিদ্ধ না হইলে জীর্ণ হয় না, সিদ্ধ আলু বা আলু ভাতে আহার করিতে হইলে আলুর খোসা সমেত সিদ্ধ করিবে, কারণ আলু ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিলে উহার সারভাগ অনেক নষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং ততদূর পুষ্টি-কর হইবে না। সিদ্ধ আলু বা আলু ভাতে নামাইয়া আহার করিবে, পুরাতন আলু পূর্ব্বদিন রাত্রিতে ছাড়াইয়া চন্দ্রালোকে ভিজাইয়া রাখিলে পর দিন উহা প্রায় নূতন আলুর মত হইবে, সিদ্ধ বা অন্য প্রকারে রন্ধন করা আলু অপেক্ষা দগ্ধ বা ভাজা আলু অধিক পুষ্টি-কর।

আলুর কল বাহির হইলেই আলু নষ্ট হইয়া যায়।

যে আলু বড় ও বিলক্ষণ পরিপুষ্ট এবং শক্ত, যাহার উপরে ছাতাপড়া মত হয় নাই, যাহাতে কল বাহির হয় নাই, সেই আলুই উৎকৃষ্ট এবং সেই আলুই আহারের বিশেষ উপযোগী। রন্ধন করিলে যে আলু আঠা আঠা ও জলযুক্ত বোধ হয়, সে আলুও ভাল নহে। যাহা ধূলির মত হইয়া যায়, তাহাই উৎকৃষ্ট।

কপি।—কপি তত পুষ্টি-কর নহে। কারণ উহাতে জলীয় অংশ অধিক। বাঁধা কপির যে সকল পাতা মচমচিয়া তাহাই খাদ্যের উপযুক্ত। বাঁধা কপির যে সকল পত্র উপরিভাগে খুলিয়া পড়ে, তাহা অত্যন্ত শক্ত এবং রন্ধনে সুস্বাদ হয় না। রৌদ্র প্রবল হইলে অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে কপি আহার পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ কপি সহজে জীর্ণ হয় না, সুতরাং গরমের সময় অজীর্ণ-জনক দ্রব্য আহার করিলে পেটের পাড়া হইবার সম্ভব। রৌদ্র প্রবল হইলে কেবলমাত্র যে, কপি পাড়া-জনক হয় এরূপ নহে, তখন উহা খাইতেও তত সুখাদ্য হয় না, এই সময় কপিতে একপ্রকার পোকা জন্মে।

ফুলকপি বেশ সুখাদ্য। ফুল কপির ফুল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিলে অসময়ে আহার করিতে পারা যায়। শুষ্ক ফুল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে তদ্দ্বারা ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে হয়। ফুল কপির ফুল একেবারে ফুটিয়া গেলে এবং তাহাতে একপ্রকার কাল কাল দাগ পড়িলে তাহা বিস্বাদু হইয়া উঠে।

ইঁচড়।—ইঁচড় অতি সুখাদ্য তরকারী। ভাল করিয়া পাক করিতে পারিলে উহা পাঁঠার ন্যায় সুখাদ্য হইয়া থাকে। ইঁচড়ে উত্তম ডাঁল্লা হয়। ইঁচড় বেশ পুষ্টি-কর তরকারী। উদরাময় রোগী ইঁচড় আহার করিলে সহজে পরিপাক করিতে পারে না।

বৈদ্য শাস্ত্রে ইঁচড়ের গুণ। যথা—কষায়, স্বাদু, এবং বায়ুকারী।

ইঁচড়ের ন্যায় কাঁঠালের বিচিও নানাপ্রকার ব্যঞ্জনে পাক হইয়া থাকে। কাঁঠালের বিচি অত্যন্ত পুষ্টি-কর। আয়ুর্ব্বেদ মতে কাঁঠাল বিচির এই কয়টী গুণ উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ রক্তপিত্ত-নাশিত্ব, স্বাদুত্ব, ঈষৎ কষায়ত্ব, মধুরত্ব, রুচি-বায়ু বৃদ্ধিকারিত্ব, গুরুত্ব, ত্বগ্‌দোষ-নাশিত্ব শুক্র-বল-রক্ত-কারিত্ব, গুল্ম-রোগাক্রান্ত এবং মন্দাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে কাঁঠাল বিচি ভক্ষণ অনুচিত।

কাঁঠাল অতি সুখাদ্য ফল। উহার রস অতি সুমিষ্ট এবং বলকারক। কাঁঠালের রস অত্যন্ত গুরু-পাক, অর্থাৎ সহজে জীর্ণ হয় না। কিন্তু জীর্ণ করিতে পারিলে দেহের উপকার হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে কাঁঠাল রস আহার করিয়া পরিপাক করিতে পারিলে দেহ স্থূল হইয়া থাকে।

বৈদ্য-শাস্ত্রে পাকা কাঁঠালের গুণ—সুমধুরত্ব, রক্তবর্দ্ধকত্ব, স্নিগ্ধত্ব, শীতলত্ব, দুর্জ্জরত্ব, বায়ু-পিত্ত-নাশিত্ব, শ্লেষ্ম-শুক্র-বল-প্রদত্ত, গুরুত্ব, হৃদ্যত্ব, শ্রমদাহ পিপাসা-নাশিত্ব, এবং রুচি-কারিত্ব।

কলা।—কলা পুষ্টি-কর, সুখাদ্য, স্নিগ্ধ এবং সুমিষ্ট ফল। কয়েক জাতীয় কলা কাঁচাবস্থায় তরকারীর কার্য্য করিয়া থাকে। কাঁচকলা অত্যন্ত পুষ্টি-কর। এজন্য গ্রহণী ও আমাশয় রোগে রোগীকে কাঁচাকলা ব্যঞ্জনে রাঁধিয়া খাইতে দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কাঁচকলা কষায় গুণযুক্ত।

মানকচু।—মানকচু অত্যন্ত উপকারী। অনেক প্রকার ব্যঞ্জনে উহা ব্যবহার হইয়া থাকে। শোথ ও আমাশয় রোগে মানমণ্ড অত্যন্ত উপকারী। সুস্বাদুত্ব, শীতত্ব, গুরুত্ব, শোথ-হরত্ব এবং কটুত্ব, বৈদ্য-শাস্ত্রে মানকচুর এই কয়টী গুণ উক্ত হইয়াছে।

মানকচুর ন্যায় আরও কয়প্রকার কচু এতদ্দেশে তরকারিতে ব্যবহার হইয়া থাকে।

ওল।—ওল কেবল যে সুখাদ্য তরকারী তাহা নহে, অর্শ রোগে ওল ঔষধ ও পথ্যের কার্য্য করে। ওল আহার করিলে কোষ্ঠ সরল হয়। ওলের দ্বারা নানাপ্রকার আচার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ওল অগ্নি-বর্দ্ধক, রুচিকারক, কফ-নাশক ও লঘু; অর্শ রোগীর সদাপথ্য।

স্নানবিধি।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার একটী প্রধান সাধন। অপরিষ্কৃত দেহে নানাবিধ রোগ আশ্রয় করিয়া থাকে। আমাদের দেহে যে অসংখ্য লোম-কূপ আছে, তদ্দ্বারা শরীরস্থ দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু শরীর অপরিষ্কৃত হইলে লোম-কূপ পথ রুদ্ধ হইয়া যায়;

সুতরাং শরীরস্থ দূষিত পদার্থ নির্গত হইতে ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য প্রতি-দিন স্নান করা আবশ্যক।

প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নান করা উচিত। নতুবা অনিয়মিতরূপে অর্থাৎ আজ এক সময়ে কাল অপর সময়ে স্নান করিলে সর্দ্দি লাগিবার সম্ভব।

স্নান করিলে কেবলমাত্র যে, শরীরস্থ লোম-কূপ পরিষ্কৃত থাকে এরূপ নহে, তদ্বারা মন প্রফুল্ল হয় এবং স্ফূর্ত্তি বোধ হইতে থাকে।

অবগাহন করিয়া স্নান করাই প্রশস্ত। অল্প জলে স্নান করিলে শরীরে তৃপ্তি-বোধ হয় না। পরিষ্কৃত শীতল জলে স্নান করিলে শরীর সুস্থ থাকে। নিকটবর্ত্তী নদী কিম্বা পুষ্করিণীতে স্নান করা ভাল। যে জলাশয়ের জল পরিষ্কৃত এবং স্রোতযুক্ত, তীরে মল মূত্রাদি ত্যাগ করে না তাহাতে স্নান করিলে কোন অপকারের আশঙ্কা থাকে না। স্নানের উদ্দেশ্য যখন শরীর পরিষ্কার রাখা, তখন অপরিষ্কৃত জলে স্নান করিলে যে, সেই উদ্দেশ্য বিফল হইয়া থাকে, তাহা সকলেই বেশ বুঝিতে পারেন।

যে জলাশয়ের জল দূষিত হইয়া উঠে, তাহাতে স্নান করা অবৈধ। তাদৃশ জলাশয়ে স্নান করা অপেক্ষা কূপের জলে স্নান করা ভাল।

স্নানের সময় সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি উত্তমরূপে মার্জ্জনা না করিলে স্নানের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

নীরোগাবস্থায় শীতল জলে স্নান করিলে শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ হয়। সুস্থ শরীরে গরম জলে স্নান করা ভাল নয়। তদ্বারা শরীর দুর্ব্বল এবং চর্ম্ম ও মাংস শিথিল হইয়া উঠে। তবে পীড়িতাবস্থায় শীতল জলে স্নান করিলে সর্দ্দি লাগিয়া নানাপ্রকার পীড়া হইবার সম্ভব। পীড়িত ব্যক্তিকে অনাবৃত স্থানে স্নান করিতে দেওয়া উচিত নহে; কারণ স্নান করিলে শরীর শীতল হয়, সেই সময় আবার বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর আরও শীতল করিয়া তুলে, সুতরাং পীড়া হইবার কথা। এজন্য গৃহ মধ্যে স্নান করা ভাল। স্নান করিয়া শুক্‌না কাপড়, অর্থাৎ টুয়ালে প্রভৃতি দ্বারা উত্তম-রূপে গা মুছিয়া একটা জামা গায়ে দিলে ভাল হয়। দুর্ব্বল কিম্বা পীড়িত ব্যক্তির স্নানের সময় গরম জলে অল্প পরিমাণে লবণ দিয়া সেই জলে স্নান

করিলে উপকার দর্শে। কি রোগী কি সুস্থকায় কোন ব্যক্তিরই পক্ষে স্নানের অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ স্নান করিয়াই আহার করা উচিত নহে, কারণ তদ্বারা পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে।

স্নান করিয়াই যেমন আহার করা অবিধি, সেইরূপ আবার আহারান্তে স্নান করাও অহিত-কর। অতএব আহারান্তে যদি স্নান করার প্রয়োজন হয়, তবে আন্দাজ এক প্রহরের পর স্নান করা সুপরামর্শ। কারণ তদ্বারা কোন অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না।

অত্যন্ত পরিশ্রমের পর অর্থাৎ ঘাম মরিয়া শরীর শীতল না হইলে স্নান করা উচিত নহে। কারণ স্নান করিলে শীতল জলে ঘর্ম্ম-রোধ হইয়া মহা অনিষ্ট হইতে পারে, এমন কি কখন কখন ইহাতে মৃত্যুও উপস্থিত হইবার সম্ভব। আর সহসা গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি ও জ্বর হইবারও কথা।

স্নানের সময় অধিকক্ষণ ধরিয়া জলে অবগাহন করিয়া থাকা উচিত নহে; কারণ শরীর অধিক শীতল হইলে সর্দ্দি ও জ্বর হইবার আশঙ্কা থাকে।

স্নানের সময় অগ্রে মস্তকে জল দিয়া পরে অন্যান্য অঙ্গে জল দেওয়া ভাল। কারণ প্রথমে শীতল জলে অঙ্গ নিমগ্ন করিলে রক্ত মস্তকে উঠিতে পারে, তদ্বারা শিরঃপীড়া হইবার সম্ভব। এইজন্যই বোধ হয় ঊর্দ্ধকের আশঙ্কায় অনেকেই স্নানের পূর্ব্বে মস্তকে জল দিয়া পরে স্নান করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়, স্নানের সময় জলে গলা পর্য্যন্ত অবগাহন করিয়া গরম জল মস্তকে ঢালিয়া থাকেন, এরূপ করা যে মহা অনিষ্ট-কর তাহা বোধ হয় তাঁহারা অবগত নহেন। কারণ এরূপ করিলে সত্বরেই শিরঃ-পীড়া উপস্থিত হইয়া থকে।

স্নান করিবার সময় সহসা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়া বড় অনিষ্ট-জনক। তদ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমূহ আঘাত প্রাপ্ত হইতে পারে। কোন কোন বালকদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা ঊর্দ্ধ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া জলে পড়িয়া থাকে, ইহাতে হস্ত, পদ এবং বক্ষঃস্থলে গুরুতর আঘাত লাগিবার সম্ভব। কখন কখন এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে।

শীতকালে যে দিন অত্যন্ত শীত পড়িতে থাকে কিম্বা খুব বর্ষা হইলে সে দিন স্নান না করিলেও তত অনিষ্ট হয় না। তবে ভিজা গামোচা দ্বারা সর্ব্ব শরীর উত্তমরূপে পুঁছিয়া ফেলা এবং শীতল জলে মস্তক ধুইয়া ফেলিলে স্নানের কার্য্য হইতে পারে।

যে সকল ব্যক্তির চর্ম্মরোগ থাকে, তাহাদিগের গামোচা লইয়া স্নান করা অবিধি। কারণ সেই গামোচা ব্যবহার করিলে ঐ সকল রোগ হইবার আশঙ্কা।

স্নানের সময় তৈল মাখা বেশ বুদ্ধির কায। তৈল মাখিলে চর্ম্ম ও কেশ বেশ চাকৃচিক্য থাকে এবং চর্ম্মের যে স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে, তাহারও উপকার হয়। আর লোম-কূপ দিয়া তৈলের কতক অংশ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বাস্থ্যেরও উপকার করিয়া তুলে। অনেকে সাহেবদিগের দেখাদেখি তৈল মাখা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু সাহেবেরা যে, সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া থাকেন এবং তদ্বারা যে তৈল ব্যবহারের কাজ মিটিয়া থাকে, তাহা তাঁহাদিগের বোধ নাই। ফলতঃ স্নানের পূর্ব্বে তৈল মাখায় উপকার ভিন্ন অপকারের কোন আশঙ্কা নাই। তবে তৈল মাখিয়া স্নানের সময় তাহা তুলিয়া ফেলা ভাল।

কাহারও কাহারও মনে এইরূপ বিশ্বাস যে, সর্দ্দি লাগিলে শীতল জলে স্নান করিলে সর্দ্দি ঝরিয়া পড়িবে, এজন্য তাঁহারা সর্দ্দি লাগিলে শীতল জলে স্নান করিয়া থাকেন,। এরূপ করা অত্যন্ত অন্যায়। কারণ তদ্বারা শরীর আরও শীতল হইয়া জ্বর হইবার সম্ভব। সর্দ্দি লাগিলে ঈষ-দুষ্ণ জলে স্নান করা সুপরামর্শ।

যে সময় সর্দ্দি লাগিয়া অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে থাকে, তখন গরম জলে পা ডুবাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

অত্যন্ত শীতের সময় গর্ভবতী রমণী যদি হটাৎ শীতল জলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন, তবে তদ্বারা গর্ভপাতের সম্ভব।

রোগ বিশেষে আবার স্নানের বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর আমরা দুই প্রকার নিয়মে স্নান করিয়া থাকি, অর্থাৎ ডুব দিয়া

ও মাথায় জল ঢালিয়া। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ডুব দিয়া স্নান করা সুপরামর্শ। আর পীড়িত বাক্তির পক্ষে মাথায় জল ঢালিয়া স্নান করা ভাল। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান শ্লেষ্মাধিক্যের পক্ষে প্রশস্ত। অধিক গরম জলে স্নান করিলে নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য অধিক হয়। সামান্য সর্দ্দিতে গরম জলে স্নান করিয়া একখানি শুকনা মোটা কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে গা পুঁছিয়া একটা জামা কিম্বা একখানি মোটা চাদর গায়ে দিলে অল্প ঘাম হয় এবং তদ্বারা শরীর অতি সুস্থ বোধ হয়। বাতরোগে স্নান করিতে হইলে বড় এক ঘড়া গরম জলে একছটাক সোড়া মিশাইয়া সেই জল অল্প গরম থাকিতে থাকিতে স্নান করিতে হইবে। বাতের পক্ষে শীতল জল অত্যন্ত অপকারী। চর্ম্মরোগে আধ ছটাক গন্ধক চূর্ণ বড় এক ঘড়া জলে দুই তিন ঘণ্টা দিয়া রাখিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে তাহা নাড়িয়া দিতে হইবে। পরে সেই জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। এই জল যে গরম হইবে তাহা যেন মনে থাকে।

পৃথিবীর সকল দেশেই সকল জাতির মধ্যেই সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে স্নানের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। স্নানের সময় অর্থাৎ প্রথমেই শরীরে জলের স্পর্শনে যে একটু কম্পন হয়, তদ্বারা শোণিত প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া সমুদায় যন্ত্রাদি উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনায় শরীর ও মনের একপ্রকার স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া থাকে। অনেক সময় স্নান ঔষধের কার্য্য করে। প্রাতঃ-স্নান যে কতদূর উপকারী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বোধ হয় এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে প্রাতঃস্নানের বিশেষ বিধি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের সর্ব্বদা সর্দ্দি লাগিয়া থাকে, প্রাতঃস্নান তাহাদিগের প্রশস্ত নহে। চৈত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রাতঃস্নান অভ্যাস করা ভাল। অত্যন্ত গরমের সময় প্রাতঃস্নান আরম্ভ করিলে কোন প্রকার অসুখ হইবার আশঙ্কা থাকে না। ফলতঃ সুস্থ ব্যক্তি শরীরের অবস্থা বুঝিয়া আর পীড়িত ব্যক্তি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া স্নান করিবেন।

আহারের সুব্যবস্থা।

কি সুস্থ কি অসুস্থ, উভয় অবস্থাতেই আহার বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আহারে যে, কেবল রসনা তৃপ্তি ও ক্ষুধা শান্তি হয়, এমন নহে, আহারে জীবন রক্ষা হয়। কোন্ দ্রব্য বা কত পরিমাণে আহার করা উচিত, সুস্থ অবস্থায় তাহা ভোক্তার প্রবৃত্তি ও রুচির উপর নির্ভর করা যাইতে পারে; কারণ, অতিরিক্ত ঘৃত ও মসলা দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য সর্ব্বদা আহার করিয়া যাহার রুচি বিকৃত না হইয়াছে, রুচি অনুসারে আহার করিলে, তাঁহার স্বাস্থ্যের হানি হয় না। তথাপি, বিবেচনা করিয়া আহার করা, তাহার পক্ষেও কর্ত্তব্য; বিবেচনা করিয়া আহার না করিলে, মনুষ্য ক্রমেই সামান্য পশুর অবস্থায় অধঃপাতিত হইবে।

পক্ষান্তরে, রুগ্ন অবস্থায় রুচিকে বিশ্বাস করা যায় না, রোগের সময় আহার সম্বন্ধে বুদ্ধি ও বিবেচনার সাহায্য লইতে হইবে। কোন্ দ্রব্য বা কত পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য, সুস্থ অবস্থা অপেক্ষা রুগ্ন অবস্থায় তাহার সুব্যবস্থা করা অধিক প্রয়োজনীয়। রোগীর জিহ্বা এতদূর বিকৃত হইয়া যায় যে, যে দ্রব্যে অপকার হইবে, সে তাহাই খাইতে ইচ্ছা করে, আর যাহাতে উপকার হইবে, সে দ্রব্য খাইতে তাহার আদৌ রুচি হয় না। তাহার ক্ষুধাও অধিকক্ষণ থাকে না, সুতরাং কত পরিমাণে আহার দেওয়া উচিত তাহার ক্ষুধা দেখিয়া তাহার ব্যবস্থা করা যায় না। অতএব রোগীর রুচি ও ক্ষুধার উপর নির্ভর করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিলে, রোগ বৃদ্ধি পায় এবং রোগীর জীবন সংশয় হইয়া উঠে। সুতরাং বিশেষ দেখিয়া শুনিয়া ও বিবেচনা করিয়া রোগীর আহারের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রোগের প্রকৃত শান্তিকারক ঔষধের ব্যবস্থা যেমন প্রয়োজনীয়, অনেক রোগে, উপযোগী আহারের সুব্যবস্থাও তেমনি প্রয়োজনীয়। কারণ, অনুপযোগী আহার করিলে, সে সকল রোগে অদৌ ঔষধের গুণ দর্শিবে না। আহারের কিরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা না জানিলে কিছুতেই চলিবে না; কারণ নিয়ত একরূপ আহার করিলে রোগীর হঠাৎ অরুচি জন্মিবে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, রোগীর আহার কিরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা প্রায় অনেকেই জানেন না। নানাবিধ সুস্বাদু সুখাদ্য কিরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থও এ যাবৎ প্রকাশ

হইয়াছে, কিন্তু রোগীর খাদ্য কিরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন প্রবন্ধই বাহির হয় নাই। আমরা এক্ষণে নানা প্রামাণিক গ্রন্থ দেখিয়া এই অভাব পূরণে সচেষ্ট হইয়াছি। ভরসা করি গৃহিণীগণ বিশেষ মনোযোগ করিয়া এই মহোপকারী বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা লাভ করিবেন। রোগীর খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে, কোন্ দ্রব্য রোগীর উপযোগী এবং কিরূপে উহা পাক করিতে হইবে, তাহা জানা উচিত। কোন্ দ্রব্যটি কোন্ দ্রব্যের পর খাইতে দিতে হইবে, পাচক বা পাচিকার তৎপক্ষেও জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য।

কোন্ দ্রব্য কিরূপে ও কি পরিমাণে আহার করিলে, শরীরে পরিষ্কার রক্ত জন্মিবে, তাহা না জানিলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না; ভগ্ন স্বাস্থ্যেরও পুনরুদ্ধার করা যায় না। জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ কর্ম্ম করিয়া দেহের যে অপচয় হইতেছে, তাহার প্রতিপূরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রোগে রক্তের গুণ দূষিত হইলে, রক্তকে পুনর্ব্বার বিশুদ্ধও করিতে হইবে। তাহা না করিলে কদাচ দেহ রক্ষা হইবে না। রক্ত, আহার হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং আহারের ন্যূনতা ও আধিক্য এবং গুণ অনুসারে রক্তেরও ন্যূনতা, আধিক্য ও গুণের তারতম্য জন্মে; এবং তদনুসারেই স্বাস্থ্য রক্ষা বা স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এই জন্যই সাধারণতঃ খাদ্য দ্রব্য ও পথ্যাপথ্যের জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। খাদ্য ও পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা ও নিয়ম আছে, তাহা ভঙ্গ করিলেই নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দরিদ্র লোকে উত্তম দ্রব্য আহার করিতে পায় না; যে সকল দ্রব্য আহার করে, তাহাও রীতিমত রন্ধন করা হয় না; সুতরাং তাহাদিগের দেহ তাদৃশ পুষ্ট হয় না, তাহারা প্রায় নানা রোগেও ভুগিয়া থাকে। এইরূপ রোগের পক্ষে উপযোগী দ্রব্য রীতিমত রন্ধন করিয়া উদর পূরিয়া আহার করিতে দিলে যতদূর উপকার দর্শে, ঔষধে ততদূর উপকার হয় না।

খাদ্য জীর্ণ ও রক্ত মাংসে পরিণত হওয়া, ভোক্তার শারীরিক অবস্থার উপর যতদূর নির্ভর করে, পাক প্রক্রিয়ার উপরেও ঠিক ততদূর নির্ভর করিয়া থাকে। বিশেষতঃ রোগীর আহার প্রস্তুত করিতে হইলে, পাক-

প্রক্রিয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুস্থ অবস্থায় যে খাদ্য আহার করা যায়, অসুস্থ অবস্থায় সে খাদ্য আহার করিলে অনুপকার দর্শে; কিন্তু রন্ধনের বা পাকের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিলে আবার সেই খাদ্যই স্বচ্ছন্দে আহার করা যায়, কোন্ অনুপকারই দর্শে না; সহজে জীর্ণ করিতেও পারা যায়। অনেক পুরাতন অজীর্ণ রোগে ক্ষুধা মন্দ হয় না; বরং অসাধারণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহাতেও পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ এরূপ অবস্থায় ক্ষুধার অনুরোধে বুদ্ধি বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া অপরিমিত অনুপযোগী দ্রব্য আহার করিবারই বিশেষ সম্ভাবনা; সুতরাং বিপদের অধিক আশঙ্কা।

সুস্থ ও পীড়িতাবস্থায় কোন্ কোন্ খাদ্য কিরূপে আহার করিতে হইবে, সে বিষয়ে সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করা এক প্রকার অসম্ভব; কারণ জাতি, (স্ত্রী পুরুষ) বয়স, ব্যবসায়, অবস্থা, দেহের গঠন, মেজাজ ইত্যাদি ভেদে প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষে খাদ্যের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়। পরিবারের প্রয়োজন কি, গৃহের কর্ত্তার তদ্বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত; দুর্ব্বল ক্ষীণ প্রকৃতি বালক বালিকার উপযোগী কি, গৃহিণী সে বিষয়ে ভাবনা করিবেন, আর রোগীর আহারের কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, চিকিৎসক তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। তবে চিকিৎসা শাস্ত্রের সাহায্য লইয়া এবং অনেক দেখিয়া শুনিয়া খাদ্য সম্বন্ধে সামান্যতঃ কতকগুলি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে সেই সকল ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া কষ্ট ভোগ করেন। সুস্থ-কর ও পীড়া-নাশক আহার সম্বন্ধে যে সকল সামান্য ব্যবস্থা আছে, সমস্তই বিশেষ মঙ্গলকর; কিন্তু অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও অনবধানতা অন্তরায় হইয়া অনেক সময়ে তাহাদিগের সুফল ফলিতে দেয় না। চিকিৎসক বিশেষ বিবেচনা করিয়া ঔষধ ও আহারের ব্যবস্থা করিলেন। রোগীকে ঔষধ ব্যবস্থা মত সেবন করান হইতে লাগিল; কিন্তু ব্যবস্থামত আহার হয় ত আদৌ দেওয়া হইল না; না হয় ত অন্যরূপ আহার দেওয়া হইল। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রোগী এবং রোগীর আত্মীয় বন্ধু সকল আহার সম্বন্ধে চিকিৎসককে

বঞ্চনা করিয়া থাকেন; আবার বিশেষ দোষ এই যে, সে কথা চিকিৎসকের নিকট স্বীকার করেন না। তাহাতে ফল এই হয় যে, রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ করিতে পারে না; চিকিৎসকেরও নিন্দা হয়। অনেক স্থলে রোগের অকারণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না দেখিলে আর চিকিৎসক আহারের ব্যতিক্রম ধরিতে পারেন না।

আহার সম্বন্ধে অভ্রান্ত সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করা যে, অসম্ভব, তাহার আরও হেতু এই যে, এক ব্যক্তি যে দ্রব্য স্বচ্ছন্দে আহার করিতে পারেন, অপরের তাহা সহ্য হয় না। কথাই আছে, যে, একের খাদ্য অপরের বিষ। অধিক কি, একরূপ অজীর্ণ রোগাক্রান্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন যে খাদ্য সহজে জীর্ণ করিতে পারে, অপর ব্যক্তির তাহাতে অপকার দর্শে। ভাজা মাছ, কপি, ঘৃত ইত্যাদি গুরুপাক দ্রব্য আহার করিয়া কোন কোন অজীর্ণ রোগী স্বচ্ছন্দে জীর্ণ করিতে পারে; কিন্তু সেই রোগে আক্রান্ত আর এক জন তাহা কোনরূপেই জীর্ণ করিতে পারেন না, সুতরাং বিশেষ কষ্ট ভোগ করেন।

কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে স্মরণ রাখা উচিত যে, সুস্থ অবস্থাতেও এক দ্রব্য সকলে সমানরূপে পরিপাক করিতে পারে না। এক দ্রব্য এক জনের উদরে বিলক্ষণ পরিপাক পাইয়া রক্ত মাংসে পরিণত হয়; কিন্তু আর একজনের উদরে পড়িলে, জীর্ণ হয় না; তাহার অধিকাংশ মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়; সুতরাং তাহার পক্ষে ধরাট স্বরূপে কিঞ্চিৎ অধিক আহার করা কর্ত্তব্য। যে পরিমাণে যে খাদ্য বৃদ্ধের পুষ্টি-সাধন করে না, সেই পরিমাণে সেই দ্রব্য এক জন সবল যুবা পুরু-ষের পক্ষে বিলক্ষণ পুষ্টি-কর হইয়া থাকে। আর যে খাদ্য বৃদ্ধের পক্ষে সহজে জীর্ণ ও পুষ্টি-কর হয়, এক জন শরিশ্রমশীল যুবার তাহাতে উদর পুর্ত্তি হয় না; সুতরাং সে খাদ্য তাহার পক্ষে উপযোগী নহে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অর্থাৎ কাজ কর্ম্ম অনুসারেও আহারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করা কত্তব্য। সকল সময়ে কেবল ক্ষুধা ও রুচি দেখিয়া উপযুক্ত আহারের বিধান করা যায় না। যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদিগের পক্ষে যে আহার উপযোগী,

যাহারা মানসিক পরিশ্রম করে, তাহাদিগের পক্ষে সে আহার উপযোগী নহে। ষষ্ঠী বৎসর বয়স্কা প্রৌঢ়া যে দ্রব্য যত পরিমাণে আহার করিয়া থাকেন, যাঁহারা সন্তানকে স্তনপান করান, তাঁহাদিগের সেরূপ আহার উপযোগী নহে। এইরূপ নানাবিধ কারণে আহার সম্বন্ধে সাধারণ অভ্রান্ত নিয়ম নির্দ্দেশ করা কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার পারিবারিকাদি অবস্থা বিবেচনা করিয়া অথবা অন্যের সুপরামর্শ লইয়া স্বাস্থ্য-কর পুষ্টি-জনক আহার করিবেন। উপযোগী আহার না করিলে পীড়া জন্মে। কোন্ কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ ব্যক্তির কিরূপ আহার করা কর্ত্তব্য, তাহা জানিতে হইলে স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ পাঠ করা সকলেরই অবশ্য কৃত্তব্য।

মাদক দ্রব্য।

সুরা।—সুরা রক্তের সহিত অতি শীঘ্র মিশ্রিত হইয়া যায়। সুরা পান করিলে তাহার কতক অংশ ফুসফুসের মধ্য দিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে উপিয়া যায়। কতক যকৃত ও মূত্রাশয়ে যাইয়া বিশ্লিষ্ট হয়, আর কতক শরীরে থাকিয়া অন্যরূপে পরিণত হয়। চিকিৎসকেরা অনেক পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, সুরায় দেহ পুষ্ট হয় না; ইহাতে কেবল উত্তেজনামাত্র করিয়া থাকে, সেই উত্তেজনায় আবার দেহ ভেদে নানারূপ অপকার দর্শে। সুরায় প্রকৃত উষ্ণতা উৎপাদন বা ক্ষীণতার প্রতিকারও করিতে পারে না। সুরায় গাত্রে যে উষ্ণতা জন্মায় তাহা স্ফোটকাদির উষ্ণতার ন্যায় আভাসমাত্র। সুরায় বল উৎপাদন বা বল ধারণও করিতে পারে না। সুরায় মাংস পেসীর উত্তেজনা-মাত্র হইয়া থাকে; কিন্তু উহাকে মাংস পেসীর প্রকৃত বল বলা যায় না। বরং ক্ষীণতা বলিতে হইবে। সুরা পান করিলে যতটুকু উত্তেজনা হয়, মাদক-তার অবসানে তাহার অধিক অবসাদ হইয়া থাকে। তথাপি অনেক সময় কেবল এইমাত্র উপকার পাইবার জন্য সুরা ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু সুরায় স্থায়ীবল উৎপাদন করে, এই যে মত আছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অল্প পরিমাণে পান করিলে সুরায় প্রস্রাব সরল হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, এবং মানসিক

ও ইন্দ্রিয় শক্তি সবল হয় সত্য; কিন্তু যে অপকার দর্শে, তাহার নিকট এই উপকার অতি তুচ্ছ। কারণ অল্প পরিমাণেও সুরাপান অভ্যাস করিলে শেষে নিশ্চয়ই দেহ অধঃপাতিত করে। অল্প পরিমাণ হইলেও সুরাপানে হৃৎপিণ্ড ও যকৃত স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এবং অবশেষে মারাত্মক রোগ উৎপাদন করে। সুতরাং সুরা অপেয় ও অসেব্য; বিশেষতঃ আমাদিগের ন্যায় উষ্ণ প্রধান দেশে সুরা হলাহল অপেক্ষাও মারাত্মক। সুরা পানের বিষময় ফল, নিয়তই আমাদিগের প্রত্যক্ষ হইতেছে।

অহিফেণ বা আফিম।

আফিম ঔষধমাত্রায় সেবন করিলে, বিশেষ উপকার দর্শে। কিন্তু কেবল নেশা করিবার জন্য অপরিমিত মাত্রায় সেবন করিলে শরীরে বিষের ন্যায় অপকার জন্মায়। প্রায়ই দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, অনেক দুর্ব্বুদ্ধি হতভাগ্য আফিঙ খাইয়া আত্মহত্যা করে। অহিফেণজাত বিষের লক্ষণ;—রোগী ঝিমাইতে থাকে ও স্তম্ভিত হইয়া যায়। কর্ণের নিকট অত্যন্ত উচ্চ শব্দ করিলে রোগীর সহসা চৈতন্য হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অচৈতন্য হইয়া পড়ে। নাড়ী চঞ্চল ও ক্ষীণ হইয়া আইসে; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে থাকে, অঙ্গ হিম ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠে। কিছুক্ষণের পর এই সকল চিহ্নের পরিবর্ত্তন হয়; রোগী সম্পূর্ণ অচৈতন্য হইয়া পড়ে, নিশ্বাস ধীরে ধীরে বহিতে আরম্ভ করে এবং নাসিকায় ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে। অঙ্গ আরও হিম হয়; নাড়ী মন্দ মন্দ বহিতে আরম্ভ করে। স্বাভাবিক অপেক্ষা চক্ষুর তারা ক্ষুদ্র হইয়া আইসে। রোগীর মুখ আঘ্রাণ করিলেও অহিফেণের গন্ধ পাওয়া যায়। রোগী অহিফেণ খাইয়াছে, জানিবামাত্র যাহাতে বমন হয়, এরূপ দ্রব্য সেবন করাইবে। লবণ ও জল উষ্ণ করিয়া বা কেবল উষ্ণ জল অধিক পরিমাণে খাইতে দিবে। তালুতে বা টাকরায় একটা পালকের দ্বারা শুড়শুড়ি দিবে; অথবা গলায় আঙ্গুল দিয়া বমন করাইবার চেষ্টা করিবে। রোগীর মস্তকে, বক্ষে ও মেরুদণ্ডে জোরে শীতল জলের ছিটা দিবে এবং একখানি ভিজা গামোছা বা নেকড়ার ঝাপটা মারিবে। চা বা

কাফি বেশ কড়া করিয়া অনবরত সেবন করাইবে। রোগীকে অনাবৃত স্থানে উপর নীচে দুই তিন ঘণ্টাকাল ক্রমাগত চলাইবে। ফলকথা এই রোগী বেশ নিদ্রা যাইতে না পায়। রোগীর অঙ্গে তাড়িত শক্তি সঞ্চার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। রোগী যদি ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে থাকে, তাহা হইলে পায়ের তলায় এবং পায়ের ডিম ও উরুর ভিতর, পৃষ্ঠে শরিষার পুলটিশ লাগাইবে। মস্তক সোজা ও অনবরত শীতল রাখিবে। যদি অধিক সময় যাইয়া না থাকে, তাহা হইলে এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে।

সিদ্ধি বা ভাঙ!

সিদ্ধিও ঔষধ মাত্রায় সেবন করিলে, উপকার দর্শে। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও পাক শক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং অজীর্ণ উদরাময় রোগীর পক্ষে সিদ্ধি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলে, রোগ শান্তি হয়।

গাঁজা ও চরস।—অপকার ভিন্ন কোন উপকারই করে না। অতএব সর্ব্বথা অসেব্য।

—০—

তামাক।—অতি অল্পদিন মাত্র আবিষ্কৃত হইলেও, তামাক পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই নানাপ্রকারে অত্যন্ত ব্যবহার্য্য হইয়া

তামাকুর ধূম পান সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে। কিন্তু অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক স্থির করিয়াছেন যে, পরিমিতরূপে তামাক খাইলে স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন অনিষ্ট হয় না, বরং অনেক স্থলে উপকার করিয়া থাকে। কিন্তু অপরিমিতরূপে তামাক খাইলে অপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

নস্যও ছর্দ্দির পক্ষে উপকারক। কিন্তু অপরিমিতরূপে অনবরত ব্যবহার করিবে না। অনবরত নস্য লওয়া অভ্যাস করিলে স্বর বিকৃত হইয়া পড়ে। আর যিনি অনবরত নস্য লইয়া থাকেন, তাঁহাকে অপরিচ্ছন্ন হইতে হয়, সুতরাং লোকে তাহার নিকট বসিতেও বিরক্ত বোধ করেন।

ওলাউঠার সময় সাবধানতা।

ওলাউঠা যে প্রকার ভয়ানক রোগ সে পরিচয় কাহাকেও দিতে হয় না। প্রকৃত ওলাউঠার উপযুক্ত ঔষধ এ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই বলিলেই হয়। কি কারণে এই ব্যাধি দেশ মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, এ পর্য্যন্ত তাহারও সটিক কারণ নির্দ্দিষ্টও হয় নাই, এ সম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের মধ্যে নানা প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিলে যে, এই ভয়ানক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অন্যান্য সময় অপেক্ষা যে সময় পল্লী মধ্যে এই রোগ প্রকাশ হয়, সেই সময় বিশেষরূপে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। রোগীর মল মূত্রাদি যে জলাশয়ে ধৌত করা হইয়া থাকে, সে জলাশয়ের জল আদৌ পান করা উচিত নহে। কারণ জলাশয়ে ঐ সকল ময়লা পতিত হইলে, জলে ওলাউঠার বীজ পতিত হয় এবং সেই জল পানাদি করিলে নিশ্চয় ওলাউঠা হইবার সম্ভব। এজন্য কোন জলাশয়ে রোগীর মল মূত্রাদি সংযুক্ত বস্ত্র প্রভৃতি ধৌত করা সম্পূর্ণ অবৈধ। অনেক সময় এরূপ দেখা যায়, পল্লী মধ্যে কোন ব্যক্তির এই রোগ হইলে এবং তাহার বস্ত্রাদি যে জলাশয়ে ধৌত করা হয়, সেই জল পান করিয়া অবশেষে পল্লী মধ্যে রোগ বিস্তার হইয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপ বিস্তারে পরিশেষে দেশ মধ্যে মহামারি উপস্থিত হয়। অতএব বিশেষরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

ওলাউঠা রোগীর মল মূত্র পুতিয়া ফেলা অতি কর্ত্তব্য। জলাশয়ে ধৌত করা কোন মতে উচিত নহে। পানীয় জল বিশোধিত করিয়া লইলে ভাল হয়

যে নদী বা পুষ্করিণীতে মলাদি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার জলপান করা কখনই উচিত নহে। এতদ্ব্যতীত পল্লী গ্রামে যে সকল জলাশয়ে পাট কিম্বা বাখারি প্রভৃতি পচাইয়া থাকে, সেই সকল জলাশয়ের জল পান করা বিপজ্জনক তাহাও মনে রাখা উচিত। যে সকল নদীতে অধিক পরিমাণে নৌকাদি যাতায়াত হইয়া থাকে, তাহারও জল দূষিত হয়, অতএব তাদৃশ জলাশয়ের জল শোধন করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

জলের ন্যায় বায়ুরও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। দূষিত জলে যেমন নানা প্রকার পীড়া জন্মে, সেইরূপ দূষিত বায়ুও নানা প্রকার রোগের মূল তাহাও যেন মনে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় নানা প্রকার দ্রব্যাদি পচিয়া তাহা হইতে এক প্রকার দূষিত বিষাক্ত বাষ্প উদ্গত হইয়া দেশ মধ্যে মহামারি সঞ্চার করিয়া তুলে। অতএব বায়ু যাহাতে নির্ম্মল থাকে সর্ব্বতোভাবে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আবাস বাটীর চতুর্দ্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে দূষিত বাষ্প উত্থিত হইতে পারে না। আবর্জ্জনাদি দূরে পুঁতিয়া ফেলিলে এই অনিষ্টের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ লাভ করা যাইতে পারে। মল মূত্রাদি হইতে যাহাতে কোন প্রকার দূষিত বাষ্প সঞ্চার হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ওলাউঠা রোগীর মল মূত্র কোন জলাশয়ে ধৌত করা উচিত নহে। উহা ধৌত না করিয়া মলাদি মাটী চাপা দেওয়া আবশ্যক এবং বস্ত্রাদি সাবান বা ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আবাস বাটীর যে সকল স্থানে ময়লা পতিত হইয়া কিম্বা জমিয়া থাকে, তথায় কার্ব্বলিক পাউডার মধ্যে মধ্যে ছড়াইয়া দিলে অনেকটা উপকার হয়। এই পাউডার ডাক্তারখানায় ও বেনের দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে, দামও প্রতি সের তিন চারি আনার অধিক নহে। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে গৃহে অর্দ্ধেক গন্ধক ও অর্দ্ধেক ধূনার গুঁড়া পোড়ান ভাল। আমাদের দেশে গ্রহ শান্তি জন্য যে হোমবিধি প্রচলিত আছে, তদ্বারাও বিস্তর উপকার হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত দগ্ধ করিলে তাহা হইতে যে এক প্রকার সৌগন্ধ নির্গত হইয়া থাকে, তাহা দুর্গন্ধ-নাশক।

ওলাউঠার সময় রাত্রিকালে যে স্থানে শয়ন করা যায়, তাহার সম্মুখের দ্বারাদি খুলিয়া রাখা উচিত নহে। সচরাচর প্রায় দেখা যায় ফাল্গুন মাসের শেষ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ওলাউঠার প্রবল সঞ্চার হইয়া থাকে, এজন্য প্রায়ই দেখা যায় অনেকেই শয়নের সময় [illegible] বশতঃ জানালাদি খুলিয়া শয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনে করেন একটু শীতল হইলেই উহা বন্ধ করিয়া দিবেন। কিন্তু অবশেষে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন,

সুতরাং ইহার ফল এই হয় যে, বাহিরের শীতল বাতাস লাগিয়া শরীর এত ঠাণ্ডা করিয়া তুলে যে, দেহের আভ্যন্তরিক তাপ ঘুচিয়া গিয়া অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়ে, তাহাতে সহজেই ওলাউঠা রোগ আক্রমণ করিয়া থাকে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, অধিকাংশ ব্যক্তিরই ওলাউঠা প্রায় রাত্রির শেষে হইয়া থাকে। ওলাউঠা সঞ্চারে রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় বাহিরের শীতল বাতাস লাগাইলে যে, কি ভয়ানক বিপদের সম্ভব তাহা এখন গৃহস্থগণ বেশ বুঝিতে পারিলেন।

যে বাতাস আমাদের জীবন স্বরূপ, যাহার অভাবে আমরা কোনক্রমেই জীবন ধারণ করিতে পারি না, সেই বাতাস আবার দূষিত হইলে আমাদের জীবন নাশের কারণ হইয়া উঠে। অতএব বায়ুর বিশুদ্ধিতা রক্ষা করিবার জন্ত কোন প্রকার আবর্জ্জনা সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত নহে। জল দূষিত হইবার যেমন নানাবিধ কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ অনেকগুলি কারণে বায়ুও বিদূষিত হইয়া উঠে।

(১) আবাস বাটীর চতুর্দ্দিক অপরিষ্কার থাকিলে, বায়ু দূষিত হইয়া থাকে।

(২) আর্দ্র অর্থাৎ স্যাঁতাস্থানে বাস করিলে তথা হইতে এক প্রকার সজল বায়ু উত্থিত হয়, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে মহা অনিষ্টকারী।

(৩) এক গৃহে অধিক লোক শয়ন করিলে পরস্পরের শ্বাস প্রশ্বাসে বায়ু বিষাক্ত হইয়া উঠে।

(৪) গৃহের দ্বারাদি পরস্পর রুদ্ধ না থাকিলে সুন্দররূপ বায়ু সঞ্চার হইতে পারে না, সুতরাং বদ্ধ বাতাস ক্রমে দূষিত হইয়া থাকে।

(৫) রাত্রিকালে বৃক্ষতলে শয়ন করিলে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অনিষ্ট করিয়া তুলে।

(৬) যে ঘরে রোগী থাকে, তথাকার বাতাসও খারাপ হইয়া থাকে।

(৭) যে গৃহে সর্ব্বদা আগুণ থাকে, তথাকার বায়ুও অস্বাস্থ্যকর।

উপরে যে সাতটী মোটামুটি কারণ দেখান গেল, তদ্ভিন্ন আরও অনেক কারণে বায়ু বিদূষিত হইয়া থাকে। বিদূষিত বায়ু যে ওলাউঠা প্রভৃতি

বহুবিধ মারাত্মক রোগ আনয়ন করিয়া থাকে, তাহা যেন প্রত্যেক গৃহস্থের মনে থাকে।

যে গৃহে ওলাউঠার রোগী থাকে, তথায় এক ঝুড়ি কাঠের কয়লা রাখিলে বায়ু বিশোধিত হয়। রোগীর মল, মূত্র এবং শ্বাস প্রশ্বাসে যাহাতে বায়ু দূষিত হইতে না পারে, সে জন্য সৌগন্ধ দ্রব্য গৃহে রাখা ভাল।

কেবল যে, জল ও বায়ুর প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই ওলাউঠার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় এরূপ নহে। এ সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। যে যে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, আমরা তাহার স্থূল স্থূল বিষয় উল্লেখ করিয়া—গৃহস্থবর্গকে সাবধান হইতে অনুরোধ করিতেছি। আহার সম্বন্ধে—সাবধানতা অবলম্বন করা যে, একটী গুরুতর প্রয়োজন তাহা বোধ হয়, নিতান্ত বালকে পর্য্যন্তও বুঝিতে পারে। আহারের দোষে যে, অনেক সময় এই ভয়ানক রোগের আক্রমণে পড়িতে হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ওলাউঠা সঞ্চারের সময় কোন প্রকার গুরু-পাক দ্রব্য আহার করা উচিত নহে। যাহা সহজে পরিপাক হয়, অথচ বেশ স্বাস্থ্য-কর এরূপ দ্রব্য পরিমিত আহার করা আবশ্যক। কদর্য্য দ্রব্য আহার করিলে যে, রোগকে ডাকিয়া আনা হয়, তাহা যেন সকলের মনে থাকে। এই সময় অধিক রাত্রে আহার করা সম্পূর্ণ অন্যায়। যে দুইবার আমরা আহার করিয়া থাকি, তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপণ থাকা আবশ্যক।

যে সকল খাদ্য সহজে জীর্ণ হয় না এরূপ কাঁচা ফল, খেঁসারি, মটর প্রভৃতি দাইল, পচা মৎস্য এবং বাসী দুগ্ধাদি কোন মতেই খাওয়া উচিত নহে। ছাতু, কড়াই-ভাজা, চিড়া, মুড়ী, মুড়কী, চাউল ভাজা, অথবা শিম, বরবটি, কাঁঠালের বিচি ও মটর প্রভৃতি ভাজা, নানা প্রকার পিষ্টক, নানাবিধ মিষ্ট সামগ্রী, উষ্ণ দুগ্ধ, কিম্বা আধ সিদ্ধ দাইল, চর্ব্বিযুক্ত মৎস্য বা মাংস, শাক, বিলাতী-কুমড়া, কাঁচা কিম্বা আধপাকা ফল, কাঁঠাল আতা প্রভৃতি যাহা আহার করিলে পেটের অসুখ হইবার সম্ভব, তৎসমুদায়—একেবারে আহার নিষেধ। পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মদ, তপ্ত চা বা কাফি পান নিষেধ,

এমন কি পরিষ্কার জলও অধিক পরিমাণে পান করিলে উদরের অসুখ জন্মায়। লোনা, পচা, মড়া বা শুকানা মৎস্য মাংসও অজীর্ণকর এবং পরিত্যজ্য।

এই সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করা অবৈধ। যাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয় এরূপ কাজ করা অত্যন্ত অনিষ্টকর। সুতরাং রাত্রি জাগরণ ও রমণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করা ভাল।

যে স্থানে এই ভয়ানক রোগ দেখা দেয়, সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলেও বিশেষ উপকার।

ওলাউঠার রোগীকে যে সকল ব্যক্তি সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে, তাহারা খাদ্যাদি প্রস্তুত করিলে, হস্ত পদাদি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহা করা উচিত। কারণ ওলাউঠার বীজ যেন তাহাদিগের হস্তের সহিত খাদ্যাদিতে সঞ্চার হইতে না পারে। মেলা প্রভৃতি বহু লোক সমাগম স্থানে এই রোগ দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করা উচিত।

দুর্ব্বল শরীরে সহজেই নানা প্রকার রোগ আশ্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে যদি দেহ ভগ্ন থাকে, তবে সহজেই এই রোগ আক্রমণ করিতে পারে।

বালকদিগকে অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া, পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া উচিত নহে। যাহাতে সুনিদ্রা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। নিদ্রা হইতে ব্যাঘাত জন্মিলে শীতল জলে হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করত শয়ন করিলে সুনিদ্রা হইতে পারে। কোন প্রকার দুশ্চিন্তা মনে উদয় হইলে তাহা পরিত্যাগ করত ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে ক্রমে ক্রমে নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

ওলাউঠার সময় তীব্র বিরেচক ঔষধ লওয়া উচিত নহে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে মৃদু বিরেচক জোলাপ লওয়া উচিত। সহজ অবস্থায় একবারমাত্র পাতলা বাহে অথবা বমি হইলে তৎক্ষণাৎ ঔষধ সেবন করা আবশ্যক। অনেকে এইরূপ অবস্থায় তাচ্ছিল্য করিয়া পরিশেষে এই ভয়ানক ব্যাধির গ্রাসে পতিত হইয়া জীবন হারাইয়া থাকেন।

ওলাউঠা সঞ্চারে কোন মতেই ভয় পাওয়া উচিত নহে। ভয় করিলে লাভের মধ্যে এই হয় যে, যদিও রোগ হইতে বিলম্ব থাকে, তবে তাহাকে যত্ন করিয়া ডাকিয়া আনা হয়। ভয় যে একটী ওলাউঠা রোগের কারণ তাহা যেন মনে থাকে। অতএব মনে সাহস থাকা আবশ্যক। সর্ব্বদা আমোদ-জনক বিষয়ে মনোনিবেশ রাখিতে হয়।

ওলাউঠা অতি ভয়ানক রোগ; অতএব ইহার আক্রমণ হইতে এক মুহূর্ত্ত সময়ও অপব্যয় না করিয়া প্রথম হইতেই সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেক পরিবারেই এই রোগের মোটামুটি চিকিৎসা জানিয়া রাখা গুরুতর কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা গৃহস্থালীতে উহার এমন সহজ চিকিৎসার উপায় শিখাইয়া দিব যে, তাহা সকলেই অনায়াসেই শিখিতে পারিবেন। ওলাউঠা সঞ্চারে সাবধানতা সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিত হইল, এক্ষণে তাহার স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য নিয়ম কয়টী উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব। চিকিৎসা প্রণালী অন্য স্থানে লিখিত হইবে।

(ক) শরীর, কাপড়, ঘর, বিছানা প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

(খ) নূতন চাউলের কিম্বা পান্তাভাত, অত্যন্ত শীতল অথবা অত্যন্ত গরম জিনিস, কাঁচা বা পচা ফল, পচা, শুক্‌টে বা তেলাল মাছ, অথবা চর্ব্বি ওয়ালা মাংস, তেলে ভাজা দ্রব্য, পিয়াজ, রসুন, বিলাতী বা মিঠা কুমড়া প্রভৃতি তরকারী এবং যাহা সহজে জীর্ণ হয় না এরূপ গুরু-পাক দ্রব্য আহার করিবে না।

(গ) নিয়মিত পুষ্টি-কর আহার করিবে।

(ঘ) শীতল জলে স্নান করিবে। অধিকক্ষণ জলে থাকিবে না।

(ঙ) খারাপ জলে স্নান অথবা সেই জল পান করিবে না।

(চ) অনিয়মিত পরিশ্রম, কিম্বা দুশ্চিন্তা না করিয়া সর্ব্বদা শান্তভাবে থাকিবে।

(ছ) অধিক রাত্রি জাগরণ, অনিয়মিত ভ্রমণ কিম্বা সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।

(জ) এক ঘরে অধিক লোক বাস কিম্বা নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে।

[ঝ] শরীরে অধিক হিম লাগাইবে না।

[ঞ] কোন স্থানে মহামারি আরম্ভ হইলে যত শীঘ্র পার সে স্থান ত্যাগ করিবে।

[ট] রোগীর মল মূত্রাদি সংযুক্ত বস্ত্রাদি চব্বিশ ঘণ্টার অধিকক্ষণ না রাখিয়া পুড়াইয়া ফেলিবে। মল ও বমি মাটি চাপা দিবে।

[ঠ] একবার পাতলা বাহ্যে বা বমি হইলেই সতর্ক হইবে।

[ড] প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ঘরে গন্ধক ও ধূনা পুড়াইবে।

[ঢ] সর্ব্বদা কর্পূরের ঘ্রাণ লইবে।

কৃমি।

কৃমি অতি যন্ত্রণাদায়ক শত্রু; উদরে কৃমি জন্মিলে নানা প্রকার অসুখ আনয়ন করিয়া থাকে। এজন্য ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা সাবধান থাকা আবশ্যক।

সচরাচর দেখা যায়, ছেলেদেরই এই রোগ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। দূষিত খাদ্যাদিতে যে, কৃমি জন্মাইয়া থাকে, তাহা যেন প্রত্যেক গৃহস্থের মনে থাকে। আমরা যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে কৃমির বীজ উদরে প্রবিষ্ট হইয়াই উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পানীয় জল, দুধ এবং নানাপ্রকার আ-ঢাকা খাদ্য দ্রব্যে কৃমির বীজ পতিত হয়, কখন কখন এরূপও ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ পতঙ্গাদি অন্যত্র হইতেও উক্ত বীজ লইয়া খাদ্যাদিতে দিয়া যায়। পরে সেই সকল খাদ্য উদরে প্রবিষ্ট হইলে উক্ত বীজ হইতে কৃমি সঞ্চার হইতে থাকে। পরে তাহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইয়া অসংখ্য কৃমি উৎপন্ন হয়।

এদেশে দোকানে যে সকল মিষ্ট দ্রব্য এবং আধপচা ফল বিক্রীত হইয়া থাকে, তৎ সমুদায় প্রায় সুন্দররূপ আচ্ছাদিত থাকে না, সুতরাং নানা-প্রকার কীট পতঙ্গ তাহাতে আসিয়া বসিয়া থাকে। এইরূপ কীট পতঙ্গাদির সঞ্চার যে, মহা অনিষ্ট-কর, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। অত-

এর স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে ইচ্ছা হইলে দোকানের আ-ঢাকা মিষ্ট দ্রব্যাদি আহার না করিয়া ঐ সকল গৃহে প্রস্তুত করিয়া লইলে কোন প্রকার স্বাস্থ্য ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না। আমাদের দেশের শিশুরা সর্ব্বদা যেরূপ মিষ্ট খাইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়। এজন্য শিশুদিগের আহার সম্বন্ধে গৃহস্থগণের বিশেষরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

ক্লমির মধ্যে কয়েকটি জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। মলদ্বারে সুঁতার মত যে ক্লমি জন্মে, লবণ জল, চূণের জল, সির্কাজল এবং তিক্তরস মিশ্রিত জলের পিচকারী তথায় প্রবিষ্ট করাইলে ঐ সকল ক্লমি বিনষ্ট হইয়া থাকে। কারণ এই ক্ষুদ্র জাতীয় ক্লমি মলদ্বারের অতি নিকটেই থাকে। শিশুদিগের নিদ্রাবস্থায় বড় যন্ত্রণা দায়ক হয়। এজন্য মলদ্বারে তৈল অথবা ভিজা নেকড়া দিয়া রাখিলেও উপশম হয়।

আর এক প্রকার ক্লমি জন্মে, তাহা গোলাকার এবং বড় বড়। এই জাতীয় ক্লমি নষ্ট করিতে হইলে এক কিম্বা দুই গ্রেণ স্যাণ্টোনাইন, চারি পাঁচ গ্রেণ রেউচিনি অথবা কাশীর চিনির সহিত মিশাইয়া দুই তিন দিন প্রত্যহ দুই তিনবার করিয়া সেবনের পর, কাষ্টর অইলের জোলাপ দিলে ক্লমি মরিয়া যাইবে।

আর এক জাতি ক্লমি আছে, তাহা ফিতার মত দেখিতে। উহা সাত আট হাত লম্বা হইয়া থাকে। যাহারা কাঁচা কিম্বা অর্দ্ধ সিদ্ধ মাংস আহার করিয়া থাকে, তাহাদিগের পেটেই ঐ ক্লমি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে এই ক্লমির চিকিৎসা করা উচিত।

ক্লমি রোগে ছেলেদের শরীর শীর্ণ করিয়া তুলে। এজন্য তাহাদিগের খাদ্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং সেই সঙ্গে পেটে যে সকল ক্লমি জন্মিয়াছে, তাহার বিনাশ করিতে হয়। উদরে ক্লমি জন্মিলে কয়েকটি লক্ষণ দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায়, অর্থাৎ মলদ্বার ও প্রস্রাব দ্বার সর্ব্বদা চুলকাইতে থাকে, অর্থাৎ শুড়শুড় করে, গলার ভিতর যেন পুটলি পুটলি হইতে থাকে, সর্ব্বদা বমির ইচ্ছা হয়, মুখে জল উঠে, নাক চুলকাইয়া থাকে। কখন কখন শিশুরা নিদ্রিতাবস্থায় প্রস্রাব ত্যাগ করে। পিপাসা, মন্দাগ্নি,

মুখে দুর্গন্ধ, হাত পা সোরু সোরু হয়, এবং পেটে বেদনা ও নিদ্রিতাবস্থায় চম্‌কিয়া চম্‌কিয়া উঠে, দাঁত কিড়মিড় করিতে থাকে। এই সকল লক্ষণ দেখিলেই চিকিৎসা করা আবশ্যক।

বন্ বন্ খাওয়াইলেও ক্রিমি নিবারণ হইয়া থাকে। নালিতা, সিউলি ফুলের পাতার রস প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য ক্রিমির মহৌষধ। যে চূণ, পানে খাওয়া যায়, একখানি নূতন সরাতে খানিকটা সেই চূণ রাখিয়া পূর্ব্ব দিন তাহার উপর বেশী করিয়া জল ঢালিয়া রাখিলে পরদিন দেখা যাইবে, তাহা থিতাইয়া রহিয়াছে, তখন তাহা একখানি পরিষ্কার নেকড়ায় ছাঁকিয়া সেই জল খালি পেটে সেবন করিলেও ক্রিমি নিবারণ হইয়া থাকে। আনারসের পাতার রস মিছরির গুঁড়ার সহিত সেবন করিলেও উপকার দর্শে। সোমরাজের বীজ লবণের সহিত খাইলেও উপকার হইয়া থাকে।

ক্রিমি যে কত প্রকার এবং উদরের কোন্ স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা জানিবার তত প্রয়োজন নাই, তবে যে সকল লক্ষণ লিখিত হইল, ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে ক্রিমি বিনাশ করিতে হইলে প্রথমে ক্যাষ্টর অইল দ্বারা জোলাপ দেওয়া উচিত। কারণ প্রথমে জোল্লাপ দিলে মল নির্গত হওয়ায় ক্রিমি সকল পরিষ্কৃত অবস্থায় থাকে, জোলাপের পর দিন সেণ্ট-নাইন পূর্ব্বোল্লিখিত পরিমাণে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। মলের মধ্যে ক্রিমি অবস্থিতি করিলে ঔষধে অধিক কাজ করিতে পারে না। জোলাপের পর সেবন করাইলে নিশ্চয় ক্রিমি মরিয়া যায়। মরা ক্রিমি আপনা হইতেই নির্গত হয়। কিন্তু ক্রিমির ঔষধ সেবন করাইয়া পরে আর একবার জোলাপ দিলে মরা ক্রিমি সমুদায় নির্গত হইয়া পড়ে। লিখিত নিয়মে চিকিৎসা করিলে যদি উপকার না দর্শে, তবে সময় নষ্ট না করিয়া সুচিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া চিকিৎসা করা উচিত।

গবাদি পশুর কাশ রোগ।

কাশ রোগাক্রান্ত হইলে গবাদি পশু অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। বিশে-

যতঃ বাছুর কিম্বা মেষ শাবকের হইলে তাহাকে গলাফুলা কহিয়া থাকে। গলাফুলা রোগের প্রতিকার না করিলে শেষে কাশি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। বাছুরের কাশি রোগ উপস্থিত হইলে শ্বাস নালীতে এবং তাহার নানা শাখায় সূতার মত কৃমি থাকাতে যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

কারণ।—বাছুর কিম্বা মেষের কাশি হইলে প্রায়ই খাইবার সময় আহারের সহিত অথবা অন্য কোন প্রকারে সূতার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির ডিম উদরস্থ হইয়া কৃমি জন্মে। সেই কৃমি শ্বাস নালীতে গেলে এই রোগ হইয়া থাকে।

যুবা কিম্বা বৃদ্ধ গবাদির কাশ রোগ হইলে, কিম্বা গরম হইতে হটাৎ ঠাণ্ডা লাগাইলে অর্থাৎ বৃষ্টির সময় কি শীতে বাহিরে থাকাতে বা গরম গায়ে সহসা শীতল বাতাস লাগাতে অথবা অন্য যে কারণে সর্দ্দি ও গলাফুলা রোগ হয়, সেই কারণেই কাশ রোগ হইয়া থাকে। কখন কখন আবার এরূপও দেখা যায়, গলাফুলা রোগের সঙ্গে সঙ্গে এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—গবাদি পশুর এই রোগ হইলে গলাফুলা রোগের ন্যায় লক্ষণ দেখা যায়। এই রোগে প্রথমে শুষ্ক অর্থাৎ কাট কাশি ও গলায় কর্ কর্ শব্দ হইতে থাকে। পশু সর্ব্বদাই হাঁস ফাঁস করিতে থাকে এবং গলার নীচে কাণ পাতিলে এক প্রকার ফোঁস ফোঁসানি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। শ্বাসনালী, তাহার নানা শাখা ও ঝিল্লী শ্লেষ্মা পূর্ণ হয়, তজ্জন্য অল্প সময় পরে কাশি নরম হইয়া গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকে। রোগাক্রান্ত পশু কাশিলে পর নাকের ছিদ্র এবং মুখ দিয়া শ্লেষ্মা ও কফ পড়িতে থাকে।

বাছুর কিম্বা মেষের কাশ রোগ হইলে অর্থাৎ সূতার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি জন্মিয়া রোগ উপস্থিত করিলে সর্ব্বদাই কাট কাশি হইতে থাকে। ঘন ঘন কাশি হয়, ঐ কাশির শব্দ অর্দ্ধেক কাশি এবং অর্দ্ধেক ফোঁস ফোঁস শব্দ। পশু সহজে কাশিবার জন্য সম্মুখের পা বাড়াইয়া দিয়া হাঁটু বাঁকাইয়া মাথা ও গলা বাড়াইয়া অল্প নীচু করিয়া থাকে। শ্বাসনালির মধ্যে গাঢ় শ্লেষ্মার সঙ্গে ক্লেশ-জনক যে কীট থাকে, তাহা এই প্রকারে কাশিয়া তুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। পশু ক্রমশঃ কৃশ ও অস্থি-চর্ম্ম সার হয় এবং সচরাচর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে মরিয়া যায়।

পালের মধ্যে একটি পশুর এই রোগ হইলে অন্যান্য পশুকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। এজন্য কাশ-রোগাক্রান্ত পশুকে পাল হইতে পৃথক রাখাই সুব্যবস্থা। রোগ কঠিন আকারে উপস্থিত হইলে গলা ও ঘাড়ের নীচে তপ্ত লৌহ দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়া ভাল। অথবা নিম্ন লিখিত ঔষধটি ঘাড়ের নীচে ও গলদেশে মলিয়া দেওয়া উচিত।

ঔষধ।

তেলাপোকা … … … …	এক ভাগ।
মসিনার তৈল … … … …	ছয় ভাগ।
মোম … … … …	ছয় ভাগ।

মোম গলাইয়া তৈলের সঙ্গে মিশাইয়া তাহাতে তেলাপোকা ফেলিয়া দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। যখন রোগ কঠিন বোধ হইবে, তখন এই ঔষধ ও পোড়ান উভয় প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

উপরি লিখিত ঔষধে কোন ফল না দর্শিলে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

ঔষধ।

তার্পিণ তৈল … … … …	এক ছটাক।
মসিনার তৈল … … … …	তিন ছটাক।

উভয় প্রকার তৈল এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া একসের গরম মাড়ের সহিত দুই কিম্বা তিন দিন অন্তর দেওয়া যাইতে পারে।

এই রোগে পশুকে ভাল স্থানে অর্থাৎ যেখানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত থাকে, আর মল মূত্রজনিত ময়লা না থাকে, এরূপ স্থানে পশুকে রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রাত্রিতে শীত হইলে শুষ্ক বিচালি পাতিয়া এবং পশুর গায়ে একখানি কম্বল ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। ভাত, তিষি কিম্বা ভুষির মাড় আহার

করিতে দেওয়া উচিত। প্রয়োজন হইলে হিরাকসের গুঁড়া ছয় আনা এবং চিরতার গুঁড়া সওয়া তোলা এক সঙ্গে মিশাইয়া ঐ মাড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে পারা যায়। এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নি-বর্দ্ধক।

শ্বাসনালীতে সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট জন্মিয়া বাছুর কি মেষ শাবকের রোগ হইলে গবাদির নিমিত্ত এক ছটাক তার্পিণ ও তিন ছটাক মসিনার তৈল এক সঙ্গে মিশাইয়া মাড়ের সঙ্গে খাওয়াইতে হইবে। আর মেষের হইলে মসিনার তৈল এক ছটাক এবং তার্পিণ তৈল এক কাঁচ্চা এক সঙ্গে মিশাইয়া মাড়ের সহিত সেবন করাইলে মেষের কৃমি রোগ নিবারণ হইয়া থাকে।

এই রোগে পশুকে কোন ঘরে রাখিয়া চারিধারের দ্বারাদি বন্ধ করত গন্ধকের ধূঁয়া দিলেও অনেক উপকার হইয়া থাকে। আন্দাজ আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহাদের নাকে ধূঁয়া গেলে যদি অধিক কাশিতে থাকে, তবে আর ধূঁয়া না দিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

গবাদি পশুর কাশ রোগে তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করা উচিত নহে; কারণ প্রথমে ইহা সামান্য আকারে উপস্থিত হয়, পরিশেষে রোগ প্রবল হইলে পশুর জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে পারে। বিশেষতঃ বাছুর কিম্বা বৃদ্ধ পশুর রোগ হইলে সহজেই দুর্ব্বল করিয়া তুলে।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গো-জাতি আমাদের অত্যন্ত উপকারী। এজন্য সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে প্রতিপালন করা আবশ্যক।

ধাত্রী বা শিশুপালিকা।

ইয়ুরোপে প্রায় সকল ভদ্র পরিবারেই শিশু পালনের জন্য সুশিক্ষিতা সুনিপুণা ধাত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকে। ধাত্রী পরিচারিকাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি, তাহার কার্য্যও অতি গুরুতর। আমাদিগের দেশে গৃহস্থের মধ্যে মাতাই ধাত্রীর কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রাচীন পুরাণ ও কাব্যাদিতে ধাত্রী বা ধাত্রেয়িকাকে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। তাহাতেই নিশ্চয় করা যায় যে, পূর্ব্বকালে শিশুপালনের জন্য আমাদিগের গৃহেও

ধাত্রী নিযুক্ত হইত। এক্ষণেও ধনবান্‌দিগের গৃহে শিশুপালনের জন্য ধাত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকে। অন্ততঃ শিশু অনেক দিন পর্য্যন্ত দাসী বা দাসের অধীনে পালিত হইয়া থাকে। সুতরাং ধাত্রীর গুণাগুণ আমাদিগেরও জানিয়া রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহস্থ লোকের মধ্যে মাতাই ধাত্রীর কাজ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারও শিশুপালন পক্ষে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

যে সকল পরিবারে ধাত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকে; শিশু স্তন ছাড়িলেই ধাত্রী তাহার লালন পালনের ভার প্রাপ্ত হয়। তখন ধাত্রীই তাহাকে স্নান করায়, কাপড় পরায়, আহার করায়; লইয়া বেড়াইয়া বেড়ায় এবং সে যাহা যাহা চাহে বা তাহার যাহা যাহা প্রয়োজন হয়,বিবেচনা ও বন্দোবস্ত করিয়া তাহার সেই সকল অভাব পরিপূরণ করে।

এই সকল কার্য্য সামান্য বটে, কিন্তু রীতিমত সম্পাদন করিতে হইলে এই সকল সামান্য কার্য্যেও অনেক সদ্‌গুণের আবশ্যক। ধৈর্য্য শান্ত-স্বভাব; সত্যবাদিতা, সচ্চরিত্রতা, অতি সামান্য সামান্য বিষয়েও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, এবং অনুবর্ত্তিতা ও বশীভূততা, ধাত্রীর এ সকল গুণ না থাকিলে সে কোনরূপেই শিশুপালনের উপযুক্ত নহে। সামান্য সামান্য শিল্পকার্য্যে ধাত্রীর নৈপুণ্য থাকা আবশ্যক।

শিশুকে কিরূপে ক্রোড়ে করিলে বা ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইলে তাহার বা নিজেরও কষ্ট হইবে না, ধাত্রীর সে জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যদি ধাত্রী শিশুকে সোজা ভাবে বাহুর উপর বসাইয়া বুকের উপর অত্যন্ত চাপিয়া রাখে, তাহা হইলে শিশুর পাকস্থালী সঙ্কুচিত এবং পৃষ্ঠে শ্রান্তি বোধ হইবার সম্ভাবনা। নিপুণা ধাত্রী তাহার নিজের কষ্ট নিবারণের জন্য বাহু পরিবর্ত্তন করে। অর্থাৎ শিশুকে এক বাহু হইতে অন্য বাহুতে লয়; কখন কখন মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নত রাখিয়া দুই বাহুতেই তাহাকে শয়ন করায়। যখন শিশুকে হাত ধরিয়া চলন শিখাইতে হইবে, তখন ক্রমাগত এক হাত ধরিয়াই চলাইবে না; কারণ তাহা হইলে তাহার এক স্কন্ধ অন্য স্কন্ধ অপেক্ষা অধিক উন্নত হইতে পারে। চলন শিক্ষা পক্ষে হাত ধরিয়া

শিখানই কর্ত্তব্য; দড়ি বা অন্য কোন রূপ উপায় অবলম্বন করিবে না; কারণ শিশু তখন ভালরূপ অঙ্গ চালন করিতেই অসমর্থ, সুতরাং দড়ি ধরিবার জন্য তাহাকে জোর করিয়া হস্তাদি প্রসারণ করিতে হইবে।

অনেক শিশুর মন্দ স্বভাব থাকে; সে সকল সংশোধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ধমক দিয়া সংশোধন করিবার চেষ্টা করিলে, সুফল না ফলিয়া বরং কুফলই ফলিয়া থাকে। অতএব স্বভাব সংশোধন পক্ষে স্নেহ, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যগুণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শিশুর সামান্য সামান্য দোষের মধ্যে আঙ্গুল চোষা একটী মন্দ স্বভাব। এই স্বভাব সংশোধন করিতে হইলে, কোনরূপ জোর না করিয়া, আঙ্গুলে একটু তিক্ত দ্রব্য মাখাইয়া দিবে। এইরূপ উপায়েই অন্যান্য স্বভাবও সংশোধন করিবে। কোন কোন শিশু স্বভাবতঃ অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন; হয় ত অনর্থক কাদা মাটি বা হয় ত নিজেরই মলমূত্র চটকাইয়া গাত্রে মাখিয়া থাকে। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত ক্রমে ক্রমে এই মন্দ স্বভাব সংশোধন করিতে হইবে। ধাত্রী এই সকল বিষয়ে কখনই শিশুকে প্রহার বা তাহার অন্য কোন রূপ দণ্ড করিবে না। কেবল এই সকল বিষয়েই অথবা অন্য কোন বিষয়েই শিশুর উপর কোন রূপ জোর করিবে না। যেমন জোর করা অকর্ত্তব্য; অত্যন্ত প্রশ্রয় বা নাই দেওয়া, কিম্বা তাহার মতেই চলা, ধাত্রীর পক্ষে তেমনই দূষণীয়। শিশু নানারূপ আবদার করিয়া থাকে; তাহার সমস্ত আবদার পূরণ করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে শিশু সকলকেই আপনা অপেক্ষা হীন ও নিকৃষ্ট মনে করিতে শিক্ষা করিবে; সুতরাং ধাত্রী এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে। শিশুকে কুকুর বিড়াল মারিতেও দিবে না। দেখিতে পাওয়া যায়, শিশু পড়িয়া যাইলে, ধাত্রী, মাতা, অন্যান্য আত্মীয় ব্যক্তি তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিয়া থাকেন, ঐ স্থানে লাথি মার। কিন্তু উপরোক্ত কারণে এইরূপ আচরণ নিতান্ত দূষণীয়। ধাত্রী সামান্য সামান্য বিষয়ে শিশুকে কখনই ভয় দেখাইবে না। কারণ তাহাতে শিশুর মনে অতি তুচ্ছ ভয়ের সঞ্চার করিয়া তাহাকে ভীরু করিয়া তুলিবে। অতএব সামান্য সামান্য ভয়ের বিষয় যাহাতে শিশুর সমক্ষে উপস্থিত না হয়,

ধাত্রী তৎ পক্ষেই সাবধান থাকিবে এবং যদিও উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শিশু যাহাতে ভীত না হয়, তাহারই চেষ্টা করিবে।

ধাত্রী শিশুকে যতদূর সম্ভব, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। বিশেষতঃ যাহাতে সে স্বয়ং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভাল বাসে, তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিবে। এমন কি তাহাকে এরূপ অভ্যাস করাইবে যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকিলে, সে কষ্ট বোধ করে। আহার করিবার সময় শিশু আহারীয় দ্রব্য গাত্রে মাখিয়া অপরিষ্কার না হয়। ধাত্রী তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে অথচ সাবধান হইতে হইবে, যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস করিতে যাইয়া শিশু এই সম্বন্ধে বৃথা শিক্ষা না করে। অর্থাৎ যাহাকে বাবু বলে, শিশু বাল্যাবস্থাতেই সেই বাবু হইয়া না উঠে।

শিশুর স্বভাব ও প্রবৃত্তিতে যে সকল দোষ দৃষ্ট হয়, ধাত্রী কোনরূপ গোপন বা অন্যথা না করিয়া শিশুর পিতা মাতাকে সে সকল সর্ব্বদা জানাইবে। মাতা স্বয়ং ধাত্রী হইলে, তিনি অতি সতর্কতার সহিত স্বয়ং এই সকল দোষ লক্ষ্য করিবেন। যথা সময়ে দমন করিলে দোষ সকল সম্ভবই দূর হইবে। কিন্তু এই প্রকার দোষ অতি গুরুতর না হইলে, তৎপক্ষে ততদূর অনুসন্ধান করিবে না। কারণ তাহা হইলে শিশু স্বভাবত বুদ্ধিবলে অনর্থক পরের দোষ উদ্‌ঘাটন ও দোষ কীর্ত্তন করা শিক্ষা করিবে। ইহা আবার মনুষ্যের পক্ষে অতি প্রধান দোষ।

ধাত্রীর কার্য্য যখন অনেক এবং অতি গুরুতর হইতেছে, তখন গৃহস্থের বিবেচনা ও কর্ত্তব্য যে, ধাত্রী তাহার সমস্ত সময় এই সকল কার্য্যেই ব্যয় করিতে পারে। সুতরাং শয্যা করা, বস্ত্র ধৌত করা, গৃহ মার্জ্জন করা ইত্যাদি অন্যান্য কার্য্যে ধাত্রী যাহাতে অন্যের সাহায্য পায়, তৎপক্ষে সুবন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

শিশু পালনের পক্ষে সামান্য সামান্য রোগের সাধারণ মুষ্টিযোগ এবং ঔষধ জানিয়া রাখা পালিকার আবশ্যক। পূর্ব্বে আমাদিগের প্রৌঢ়া গৃহিণীরা এই বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণা ছিলেন। এমন কি শিশু চিকিৎসা তাঁহারা নিজেই করিতেন; গুরুতর পাড়া না হইলে চিকিৎসক ডাকিতেন না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এক্ষণে গৃহিণীগণ এবিষয়ে কিছুই জানেন না; সামান্য সর্দ্দি হইলেও ভয়ে কাঁদিয়া ব্যাকুল হন এবং ডাক্তার কবিরাজের জন্য ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়েন; গৃহস্থকেও অনর্থক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। এক্ষণে আমাদিগের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা—আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ভরসা করি অন্যান্য শিক্ষার পক্ষে—অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা শিশু পালন,শিশু—চিকিৎসা—ও পথ্যাপথ্য বিষয়ে ভাবিনী জননীও গৃহিণীদিগকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

শিশুর লালন পালন পক্ষে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি জানিয়া রাখা এবং তৎপক্ষে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

পরিষ্কার বিশুদ্ধ বায়ু, আবশ্যক মত উষ্ণতা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ, পরিচ্ছদ, শয্যা ও দেহ, শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা ও দেহ পুষ্টির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। অনিয়মিতরূপে অনুপযোগী আহার এবং আলোক ও উপযোগী গাত্রাবরণের অভাব শিশুর পক্ষে—অত্যন্ত অপকারক, অধিক কি এই সকল বিষয়ে সাবধান হইলে, অনেক শিশু অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। দূষিত বায়ু ও বদ্ধ গৃহ শিশুর যম স্বরূপ। ফলতঃ যে গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং রীতিমত প্রশস্ত, যাহাতে বিশুদ্ধ পরিষ্কার বায়ু ও আলোকের গতি বিধি আছে, এরূপ শীতল শয়নাগার, গৃহের বাহিরে আবশ্যক মত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ভ্রমণাদি ব্যায়াম, যথেষ্ট আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া, স্বাধীনতা, পাঠশালা বা পাঠে অধিক সময় ব্যয় করা, শিশুর কাল স্বরূপ হইয়া থাকে। আর ঔষধ অপেক্ষা শিশুর পথ্যাপথ্যেই অধিক মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

—:০:—

রোগীর পরিচর্য্যা।

কোন ব্যক্তি রুগ্ন হইবামাত্র তাহার সেবা-সুশ্রূষার জন্য একজনকে প্রায় সদা সর্ব্বদা তাহার নিকটে থাকিতে হয়। ইয়ুরোপে এই কার্য্যের জন্য শিক্ষিত বহুদর্শী পরিচারক বা পরিচারিকাদিগকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের দেশে মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি

আত্মীয় স্বজনেরাই রোগীর সেবা সুশ্রূষা করিয়া থাকেন। উৎকট পীড়া স্থলে, আত্মীয় বন্ধু কুটুম্ব বা প্রতিবেশীদিগেরও সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু রোগীর সুশ্রূষা অতি গুরুতর কার্য্য; রোগীর পরিচারক বা পরিচারিকা-দিগের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। ইয়ুরোপে এই জন্য রোগীর পরিচর্য্যা শিখান হইয়া থাকে। যাহারা সেই সকল শিক্ষায় পারদর্শী হয়, রোগীর শুশ্রূষায় তাহাদিগকেই বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আমাদিগের দেশে সে রীতি নাই। সুতরাং পরিচর্য্যার দোষে অনেক সময় অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

রোগীর পরিচারক বা পরিচারিকার পক্ষে স্নেহ একটী প্রধান গুণ; কিন্তু কেবল স্নেহে কাজ চলিবে না। বরং কেবল স্নেহে অনেক সময় অপকারই করিয়া থাকে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জননী, ভগ্নী, স্ত্রী, দুহিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ রোগীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়া স্নেহের অনুরোধে রোগীর আবদার অনেক সহ্য করেন এবং রোগীর যাহা কুপথ্য স্নেহের অনুরোধে রোগীকে তাহাই প্রদান করিয়া রোগের বৃদ্ধি করিয়া তুলেন। আর অনেক রোগে রোগীর নিকট হয় ত দিন রাত্রি সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। অতএব পরিচারকের তদুপযুক্ত বল থাকা আবশ্যক। স্নেহের অনুরোধে, মাতা স্ত্রী প্রভৃতি আত্মীয়দিগের তাদৃশ বল না থাকিলেও এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু দুই এক দিনেই শ্রান্ত ও অসমর্থ হইয়া পড়েন। অতএব যাঁহাদিগের তাদৃশ শক্তি আছে, এরূপ ব্যক্তিকেই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার সাহায্য করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অধিক বল-বান্ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবে না; কারণ অধিক বলবান্ ব্যক্তি তাদৃশ কর্ম্ম-পটু হয় না অর্থাৎ কাজে চালাকি প্রদর্শন করিতে পারে না।

যে ব্যক্তি প্রফুল্ল স্বভাব, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শান্তভাবাপন্ন; যে অধিক কথা না কহে, যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান ও সতর্ক, যাহার বধিরতা, ক্ষীণ দৃষ্টি, প্রভৃতি শারীরিক দোষ নাই এবং যাহার রোগী পরিচর্য্যায় বহুদর্শিতা আছে, তাহাকেই রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। রোগীর পরিচারক সর্ব্বদা সতর্কে রোগীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিবে; কবিরাজ ঔষধাদির যেরূপ ব্যবস্থা

করিয়া দেন, তদনুসারে রীতিমত সেই সকল দান করিবে। এবং রোগী যাহা চাহে প্রয়োজন মত সমস্ত তৎক্ষণাৎ যোগাইবে।

যে ব্যক্তির এই সমস্ত গুণ আছে, রোগীর পরিচর্য্যায় তাহাকেই নিযুক্ত করিবে। ঔষধ ও পথ্যাপথ্যের ন্যায়, সুশ্রূষার উপরেও রোগ শান্তি অনেক নির্ভর করে।

রোগের অবস্থা, রোগীর স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসকের উপদেশ এই কয়টীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সুশ্রূষা করা আবশ্যক। রোগ বিশেষে আবার সুশ্রূষার প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল রোগে দিবারাত্র রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে হয় ; সেই সকল রোগে পর্য্যায় অর্থাৎ পালাক্রমে সেবা করা ভাল। নতুবা এক ব্যক্তির দ্বারা তাহা কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না।

রোগীর গৃহে অধিক লোক উপস্থিত হইয়া গোলযোগ করা উচিত নহে। রোগী যাহাতে সুস্থ ও শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা পরিচর্য্যার একটী প্রধান অঙ্গ তাহা যেন মনে থাকে।

স্পর্শ সংক্রামক অর্থাৎ হাম ও বসন্ত প্রভৃতি ছুঁয়াচে রোগে পরিচারক বা পরিচারিকার বিশেষরূপে সাবধান হইয়া সেবা সুশ্রূষা করা আবশ্যক। নিজের শরীর রক্ষা ও অন্যান্য পরিবার মধ্যে যাহাতে সেই রোগ বিস্তার হইতে না পারে সে পক্ষেও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

রোগীর মল মূত্র এবং বমি প্রভৃতিতে ঘৃণা হইলে তাহা দ্বারা পরিচর্য্যা হওয়া সুকঠিন। ফলতঃ যখন রোগীর জীবন, পরিচারিকা বা পরিচারকের যত্ন, পরিশ্রম এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতেছে, তখন তাহাতে অবহেলা করা কখনই ধর্ম্ম বুদ্ধির অনুমোদনীয় নহে।

কৃষকের কার্য্য।

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ঘরে হা ভাত॥

চা-ষের পক্ষে শির্ষ লিখিত প্রবাদটী যে জ্বলন্ত উপদেশ তাহা সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। যে ব্যক্তি নিজে পরিশ্রম করিয়া কর্ম্মচারী-দিগকে খাটাইতে পারে, তাহার কৃষি কাজে সম্পূর্ণ লাভ হইয়া থাকে, আর যে কৃষক নিজে পরিশ্রম না করিয়া ছাতা মাথায় দিয়া মধ্যে মধ্যে তদারক করিয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধেক লাভ হয়। কিন্তু যে কৃষক ক্ষেত্রাদি পরিদর্শন অথবা স্বয়ং পরিশ্রম না করিয়া এবং লোক জনকে না খাটাইয়া ঘরে বসিয়া কৃষি কার্য্যের তত্ত্ব লইয়া থাকে, তাহার চাষে লাভ হয় না, সুতরাং চিরদিন তাহার অন্নের কষ্ট বর্ত্তমান থাকে। এজন্য কৃষি-কার্য্য করিতে হইলে নিজের পরিশ্রম করিতে হয়।

কৃষকের কার্য্য অতি গুরুতর; কৃষকের পরিশ্রম ও বিচক্ষণতার উপর চাষের লাভালাভ এবং উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিয়া থাকে। কিরূপ নিয়মে এবং কিরূপ কার্য্য করিলে লাভের সম্ভব তাহাতে জ্ঞান থাকা আব-শ্যক। যে, যে কাজ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার দক্ষতা না থাকিলে হাজার পরিশ্রম কর এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় কর কিছুতেই সে কার্য্যে লাভের মুখ দেখা যায় না। কৃষকের সচরাচর এই কয়টী বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক যথা—

(১) চাষাদির সময় নিরূপণ।
(২) বীজ পরীক্ষা।
(৩) মৃত্তিকার অবস্থা।
(৪) সার।
(৫) জল সেচন।
(৬) অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির সময় সাবধানতা।

(৭) ক্ষেত্র পরিষ্কার।

(৮) গো, মেষাদি পশু ও পতঙ্গের আক্রমণ হইতে রক্ষা।

(৯) কৃষি-জাত দ্রব্য ও বাণিজ্য সম্বন্ধে লাভালাভ।

যে নয়টী বিষয়ের উল্লেখ করা হইল, তাহাতে কৃষকের দৃষ্টি না থাকিলে কেবলমাত্র চাষ করিলে তাহাতে লাভের কোন আশা থাকে না।

কোন্ সময়ে কোন্ শস্যের চাষ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি না থাকিলে কোন ক্রমেই আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। দেশের প্রকৃতি ও ঋতুভেদে চাষ আবাদ করিতে হয়; এক এক জাতীয় উদ্ভিদের এক এক প্রকার প্রকৃতি সুতরাং সেই সকল প্রকৃতি লক্ষ্য রাখিয়া চাষ করিলে সহজেই লাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আইসে। মনে কর বর্ষাকালে যে সকল চাষ আবাদ করিতে হয়, গ্রীষ্মকালে তাহার চাষ করিলে ঐ সকল উদ্ভিদ্ পরিপুষ্ট ও উপযুক্ত ফল প্রসবে সমর্থ হয় না। যদিও কৃত্রিম উপায়ে অসময়ে কোন কোন শস্যাদির চাষ করা হইয়া থাকে, কিন্তু সময়ের ন্যায় তাহাতে ফলন হয় না। এজন্য চাষাদির সময় নিরূপণ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

বীজই চাষের জীবন; বীজের মধ্যেই কৃষকের লাভালাভ নির্ভর করিয়া থাকে, এজন্য বীজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা কৃষকের একটি গুরুতর কর্ত্তব্য। বীজ রক্ষণ, বীজ নিরূপণ এবং বীজের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া চাষে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বীজের দোষ গুণানুসারে যে, কৃষি-জাত দ্রব্যের উন্নতি অবনতি হইয়া থাকে, তাহা প্রত্যেক কৃষকের জানা আবশ্যক। যে সকল বীজ পরিপুষ্ট, সেই সকল বীজের চাষে যেমন শস্য হইয়া থাকে, অপুষ্ট বীজে কখনই সেরূপ হইবার সম্ভব নহে। চাষের উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে বীজের উন্নতি করিতে হয়। শস্য কিম্বা ফল বৃক্ষের চাষ করিতে হইলে বীজের মধ্যে যে সকল বীজ—অপুষ্ট, কীটযুক্ত এবং পুরাতন সেই সকল বীজ পরিত্যাগ করিয়া পরিপুষ্ট ও টাটকা বীজ লইয়া চাষ করিলে, তজ্জাত বৃক্ষাদিও যে সতেজ ও অধিক পরিমাণে ফল শস্যাদি প্রসব করিয়া থাকে, তাহা সকলেই সহজেই বুঝিতে পারেন। রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তির সন্তান যেমন তদনুরূপ হইয়া থাকে। চাষ সম্বন্ধেও যে ঠিক সেইরূপ ঘটে তাহা যেন মনে থাকে।

চাষের জন্য বীজ বাছিয়া লওয়া আবশ্যক। চাষে দুর্ব্বল প্রকৃতির চারা হইলে সেই সকল গাছ মারিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট সতেজ গাছ রাখা আবশ্যক।

মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া চাষ করা উচিত। অর্থাৎ কোন্‌রূপ মৃত্তিকায় কোন্ কোন্ জাতি উদ্ভিদ জন্মিতে পারে তাহা জানা আবশ্যক। উদ্ভিদের প্রকৃতির সহিত মৃত্তিকার যে, অতি ঘনিষ্টতা সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ হয় কৃষকমাত্রেই অবগত আছেন। কারণ বেলে, এটেল, দোঁ-আশ প্রভৃতি নানা প্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ বিশেষ মৃত্তিকায় বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে। যে সকল উদ্ভিদ বালুকাময় ভূমিতে জন্মিয়া থাকে, এটেল মাটিতে তাহার চাষ করিলে কখনই আশানুরূপ ফল লাভ হইবে না। মৃত্তিকাই উদ্ভিদের জীবন, মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদের জীবন রক্ষনোপযোগী পদার্থ গ্রহণ করিয়া উহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং যে মৃত্তিকায় যে উদ্ভিদের জীবন ধারণোপযোগী পদার্থ না থাকে, সেই মৃত্তিকায় সেই জাতীয় উদ্ভিদ রোপণ করিলে তাহারা কোনক্রমেই জীবন ধারণ এবং পরিপুষ্ট হইতে পারে না। এজন্য মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া চাষে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

আহার গ্রহণ করিয়া যেমন জন্তুগণ জীবন ধারণ ও দেহের পুষ্টি-সাধন করিয়া থাকে, সেইরূপ উদ্ভিদগণ মৃত্তিকা হইতে যে এক প্রকার পদার্থ গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা ও দেহের পরিবর্দ্ধন করিয়া থাকে, তাহাকে উদ্ভিদের সার কহে। সকল মৃত্তিকায় সকল জাতীয় উদ্ভিদের পরিপোষণোপযোগী পদার্থ থাকে না, এজন্য ভূমিতে সার দিয়া ঐ অভাব পরিপূরিত হইয়া থাকে। কিন্তু সার সম্বন্ধে একটী কথা আছে, অর্থাৎ সকল জাতীয় সারে সকল জাতীয় উদ্ভিদের দেহ রক্ষা হইতে পারে না। যে জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে যে জাতীয় সার উপযোগী কৃষক তাহা যদি বিবেচনা না করিয়া ক্ষেত্রে সার প্রদান করেন তাহা হইলে কখনই উপকার দর্শে না। মনেকর আমরা অন্ন আহার করিয়া জীবন রক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু অন্নের পরিবর্ত্তে তুষ প্রভৃতি অসার অংশ আহার করি, তবে কোন ক্রমেই শরীর সুস্থ থাকিবে না, অল্প দিনের মধ্যেই দেহ ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। সেইরূপ ধান্য রোপিত ক্ষেত্রে যে সারের প্রয়োজন, তাহার পরিবর্ত্তে যদি অন্য সার দেওয়া হয় তবে ধান্যের পক্ষে উহা

কখনই উপকারী হইবে না। এই নিমিত্ত কৃষকের কর্ত্তব্য মৃত্তিকার অবস্থা ও উদ্ভিদের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া কৃষি-কার্য্য করা।

উদ্ভিদের জীবন রক্ষা করিতে হইলে জল একটী প্রধান প্রয়োজনীয় পদার্থ। জলের অভাবে প্রায় উদ্ভিদ জীবন ধারণ করিতে পারে না। বৃষ্টি-পাত, শিশির সঞ্চার, মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ, বায়ুর জলীয় অংশ এবং জল সেচন এই কয়টী উপায় দ্বারা জল সঞ্চারের কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু তন্মধ্যে বৃষ্টির জলই অধিক উপকারী। সকল জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে আবার বৃষ্টির জল আদৌ উপকারী নহে। শিশিরপাত অনেক প্রকার উদ্ভিদের পক্ষে অত্যন্ত উপকার-জনক।

মৃত্তিকাভেদে ও উদ্ভিদের প্রকৃতি বুঝিয়া জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিতে হয়। অর্থাৎ সজল ভূমি অপেক্ষা নীরস ক্ষেত্রে যে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা অধিক করিতে হয়। তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সকল জাতীয় উদ্ভিদে সমানরূপ জলের প্রয়োজন করে না। এতদ্ব্যতীত ঋতুভেদে আবার জল সিঞ্চনের অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। মহর্ষিকুলতিলক পরাশর তাঁহার কৃষি-সংহি-তায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে প্রাতে ও সায়ংকালে, শীতকালে একদিন অন্তর জল সিঞ্চন করিবে এবং বর্ষাকালে জল সিঞ্চনের কোন প্রয়োজন নাই; কারণ তখন সর্ব্বদা বৃষ্টিপাতে মৃত্তিকা রসাল থাকে, সুতরাং তাহার উপর আবার জল সিঞ্চন করিলে উদ্ভিদ পচিযা যাইবে। অতি বৃষ্টির সময় ক্ষেত্রে যাহাতে অতিরিক্ত জল সঞ্চিত হইয়া শস্যাদি পচিয়া না যায়, তজ্জন্য জল নিকাশের উপায় করিযা দেওয়া আবশ্যক। অনাবৃষ্টির সময় সর্ব্বদা জল সিঞ্চন করিয়া যাহাতে মৃত্তিকা রসাল থাকে, তদপক্ষে কৃষ-কের দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ক্ষেত্র পরিষ্কার রাখা কৃষকের আর একটি কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। কারণ ক্ষেত্রে অপরিষ্কৃত তৃণাদি জন্মিয়া জঙ্গল পূর্ণ হইলে মৃত্তিকা হইতে আব-শ্যকীয় রসাদি পুষ্টি-কর পদার্থ ঐ সকল আ-গাছায় গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং রোপিত শস্যাদির দেহ পোষণের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। এজন্য ক্ষেত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হয়। ক্ষেত্রে আলোক ও বাতাস যাহাতে

সুন্দররূপ আসিতে পায় তাহার উপায় করিয়া দেওয়া আবশ্যক। অনেকে ঘন ঘন করিয়া বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া থাকেন, শস্য কিম্বা গাছ পালা ঘন ঘন হইলে তাহা চারি পাশে গা-মেলিয়া বাড়িতে পায় না। এজন্য প্রায় দেখা যায়, ঘন ঘন গাছ সোরু হইয়া থাকে এবং ফসল কম হয়। দেহ রক্ষার জন্য যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে চেষ্টা করা উচিত, সেইরূপ গাছ পালার পরিষ্কার সম্বন্ধেও দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রায় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন বর্ষা-কালে বৃষ্টিপাতে গাছ পালা ধৌত হইলে কেমন এক প্রকার সৌন্দর্য্য ও সতেজ ভাব হইয়া থাকে। ফলতঃ ক্ষেত্র ও উদ্ভিদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পবিষ্কার রাখা যে, উন্নতির একটি লক্ষণ তাহা যেন কৃষকের মনে থাকে।

গো মেষাদি পশু এবং কীট পতঙ্গ, শস্য ও বৃক্ষাদির পরম শত্রু। অতএব এই সকল শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা কৃষকের একটি কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। ক্ষেত্রাদি সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করা এবং কোন প্রকার অনিষ্ট হইবার উপক্রম হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করা আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায়, কৃষকের সামান্য ত্রুটি বশতঃ প্রভূত অপকার সাধিত হইয়া থাকে। সন্তান প্রতিপালন আর গাছ পালা পালন অত্যন্ত যত্ন সাপেক্ষ। কোন প্রকার পশু যাহাতে ক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। কোন প্রকার অনিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সেই প্রকার অনিষ্ট যাহাতে সংঘটন না হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই বিচক্ষণ কৃষকের পরি-চয়। নতুবা প্রভূত পরিশ্রম, যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া সামান্য ত্রুটি বশতঃ তাহাতে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কৃষক দীর্ঘকাল ধরিয়া যে আশা-ভরসা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখেন, পশুতে অল্প সময়ের মধ্যে সে আশা ভরসা নির্ম্মূল করিয়া দিতে পারে। এজন্য এবিষয়ে বিশেষরূপ মনো-যোগ দিতে হয়।

দেশ মধ্যে যখন যে বিষয়ের চাষ আবাদ করিতে হয়, তখন দেখা উচিত সেই চাষে যে ফলন হইবে, বিক্রয় দ্বারা তাহা লাভ-জনক হইবে কি না। যাহাতে লাভ নাই, তাহার চাষে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া কখন সুপরামর্শের পরিচয় নহে। কৃষকই বাণিজ্যের ভিত্তি স্বরূপ। কৃষকের পরিশ্রম ও বিচক্ষণতার

উপরই বাণিজ্যের জীবন ; কৃষি-জাত দ্রব্য লইয়াই বাণিজ্যের শ্বাস বায়ু নির্ভর করিয়া থাকে। এক পক্ষে যেমন কৃষি ভিন্ন বাণিজ্য চলিতে পারে না, পক্ষান্তরে আবার বাণিজ্য ভিন্ন কৃষি-জাত দ্রব্যে লাভ দেখা যায় না। কৃষি-জাত দ্রব্য বাণিজ্যে পরিণত করিলে লাভ হইয়া থাকে। কৃষি-জাত দ্রব্যের সহিত বাণিজ্যের অতি নিকটতর সম্বন্ধ। আমাদের দেশে কৃষি-কার্য্যের আদর নাই এবং কৃষকও তাঁহার কার্য্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। তাহার কারণ এদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রায় কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। তাঁহারা উদরান্নের জন্য অন্যের পদ-দলিত হইবেন, মুষ্টি ভিক্ষার নিমিত্ত পর পদ লেহন করিবেন, লেখা পড়া শিখিয়া অধীনতার পাদুকা মস্তকে বহন করিবেন সেও ভাল, তত্রাপি স্বাধীন কৃষিতে মনোনিবেশ করিবেন না। আর তাঁহাদিগের দৃষ্টির সম্মুখে চা-কর ও নীল-কর ইংরাজ কৃষকগণ কৃষি-কার্য্য ও তজ্জাত দ্রব্যাদি বাণিজ্যে পরিণত করিয়া যে বিপুল অর্থরাশি উপার্জ্জন করিয়া ধন-কুবের হইতেছেন, তাহাতেও তাঁহাদিগের চক্ষু ফুটিতেছে না। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশে শিক্ষিতগণ সুমার্জ্জিত বুদ্ধির সহিত কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কৃষি-কার্য্যের যার-পর-নাই উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ঐ সকল দেশে কৃষি-কার্য্যের প্রতি যেরূপ যত্ন প্রকাশিত হইয়া থাকে, এদেশে যদি সেইরূপ যত্ন সহকারে কৃষি-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে যে, প্রভূত উপকার হইয়া উঠে তাহা বলা বাহুল্য।

শ্রম ও ক্লেশ সহিষ্ণু ব্যক্তিই কৃষি-কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র। কারণ কৃষককে সর্ব্বদাই পরিশ্রম না করিলে তাঁহার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। যাঁহারা পরিশ্রম ও ক্লেশকে ভয় করিয়া থাকেন, কৃষি-কার্য্য তাঁহাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এরূপ অনুপযুক্ত ব্যক্তি কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কখনই তাঁহার ভাগ্যে লাভের মুখ দর্শন ঘটিয়া উঠে না।

সশার চাষ।

বঙ্গদেশের সকল স্থানেই সশা জন্মিয়া থাকে। মাটীর গুণে ফলের আকার ও আস্বাদন ভাল মন্দ হইয়া থাকে। সরস ক্ষেত্রে সশার চাষ করিতে হয়। খিয়ার মাটীতে গাছ করিলে যদিও ফল বড় হয় না কিন্তু আস্বাদন উত্তম হইয়া থাকে। দোঁ-আশ ও বেলে মাটীর সশার ফলন অধিক ও আকার বড় হইয়া থাকে।

মাদা করিয়া সশার বীজ রোপণ করিতে হয়। চৈত্র মাসের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠের এক পক্ষ পর্য্যন্ত বীজ রোপণের উপযুক্ত সময়।

এক একটী মাদায় এক ঝুড়ি গোবরের সার দিলে ভাল হয়। সার না দিলেও তত ক্ষতি হয় না। পূর্ব্ব দিন বীজ জলে ভিজাইয়া পর দিন রোপণ করিবার নিয়ম। পরিপুষ্ট বীজই রোপণে উপযুক্ত। এক একটী মাদায় তিন চারিটীর অধিক চারা রাখা উচিত নহে। মাদাতে প্রথমে পাঁচ ছয়টী বীজ রোপণ করিতে হয়। অধিক পরিমাণে বীজ রোপণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, চারার মধ্যে যে সকল নিস্তেজ দেখা যায়, তাহা তুলিয়া ফেলিয়া সতেজ চারা রাখিতে হয়। নিস্তেজ গাছে অধিক ফল ধরে না এবং শীঘ্র গাছ মরিবার সম্ভব।

মাদাতে এক একটী বীজ লম্বাভাবে পুতিতে হয়। বীজ পুতিয়া তাহার উপর ঝুরা মাটী আল্‌গাভাবে ছড়াইয়া বীজ ঢাকিয়া দিতে হয়। কারণ উহা ঢাকিয়া না দিলে পাখীতে বীজ তুলিয়া খাইয়া ফেলে। বীজ রোপণের পর হইতেই মধ্যে মধ্যে মাদায় জল দিতে হয়। অনন্তর চারা বড় হইলে অর্থাৎ যখন ডগা ছাড়িতে আরম্ভ করে, তখন তাহাতে লম্বা বাখারি কিম্বা ডাল পালা ধরাইয়া দিতে হয়। এবং বাখারির উপর মাচা করিয়া সেই মাচাতে বাখারি লাগাইয়া দিলে গাছ গা-মেলিয়া চারিদিক বিস্তারিত হইতে থাকে।

সশার চারার অবস্থায় অনেক প্রকার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। এক প্রকার পোকায় ডগা পাতা কাটিয়া দেয়; পিপীলিকা ধরিয়া চারার অনিষ্ট সাধন

করে। এজন্য ছাই, হরিদ্রার গুঁড়া এবং হুঁকার জল দিলে ঐ সকল উৎপাত নিবারণ হইয়া থাকে।

সাত আট মাসের অধিক সশার গাছ জীবিত থাকিয়া ফল দেয় না। বীজ পুতিবার অগ্র পশ্চাৎ নিয়মানুসারে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ফল ধরিয়া থাকে।

বর্ষার সময় যে ফল ধরিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা শিশিরের সময় ফল ফলিলে তাহা অতি সুস্বাদু হইয়া থাকে। কিন্তু আকার ছোট হয়।

এই সশাকে পালা সশাও কহিয়া থাকে। পালা সশা দুই জাতি অর্থাৎ কাল ও শাদা। আবার শাদা সশাকে হুদে সশাও কহিয়া থাকে। এই উভয় জাতীয় সশার রোপণাদি সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই। কচি সশা জল-পানে সুখাদ্য, কিন্তু পাকা সশা খাইতে ভাল নহে। সশা দ্বারা অনেক প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গাছের প্রথম ফল অর্থাৎ প্রথমে যে সকল সতেজ ফল ফলিয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেটী বেশ তেজাল সেইটীই বীজের জন্য রাখিতে হয়।

বৈদ্য-শাস্ত্রে সশার গুণ যথা; রুচ্যত্ব, মধুরত্ব, শিশিরত্ব, গুরুত্ব, শ্রম, পিত্ত, বিদাহ, আর্ত্তিনাশিত্ব এবং বহু মূত্রদত্ব।

পিপারমেণ্টের চাষ।

ইহা এক প্রকার শাক বিশেষ। পিপারমেণ্টের পাতা অত্যন্ত জারক, পেটের পীড়ায় উহা ব্যবহার করিলে বিশেষরূপ উপকার হইয়া থাকে।

পিপারমেণ্টের চাষ আবাদ অতি সহজ। এমন কি মনে করিলে প্রত্যেক গৃহস্থই উহা স্ব স্ব আবাস বাটীতে রোপণ করিতে পারেন।

বৎসরের মধ্যে সকল সময়ই উহার চাষ আবাদ হইতে পারে। শিকড় কাটিয়া রোপণ করিলে চারা জন্মিতে পারে। যে স্থানে পিপারমেণ্ট রোপণ করিতে হয়, অগ্রে তথায় চাষের উপযুক্ত মৃত্তিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক। প্রথমে একটী স্থানে কতকগুলি কাঁকর কিম্বা খোলার কুচি ছড়াইয়া দিয়া

তাহার উপর বালি আঁশযুক্ত মাটী উচু করিয়া দিবে। পরে সেই ঢিপির উপর পিপারমেণ্টের শিকড় কাটিয়া রোপণ করিলেই গাছ হইয়া উঠিবে। ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ভাল হয়। মূলে তৃণাদি আগাছা হইলে তাহা তুলিয়া ফেলিতে হয়। চাষ আবাদের পক্ষে অন্য কোন প্রকার নিয়ম নাই।

পিপারমেণ্টের ন্যায় পুদিনা শাকেরও চাষ আবাদ করিতে হয়। পুদিনা যে, অত্যন্ত হজমী তাহা বোধ হয়, অনেকেই অবগত আছেন। পুদিনা দ্বারা মুখ-প্রিয় অথচ উপকারী চাট্‌নী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চৈ।

ইহার লতা জাতীয় গাছ হইয়া থাকে। মূল তরকারীতে ব্যবহার হয়। গাছের ধরণ অনেকটা পান লতার গাছের ন্যায়। চৈ যখন ডগা ছাড়িতে থাকে, তখন বড় বড় গাছে, তাহা তুলিয়া দিতে হয়। চৈ আবাদ করিতে অন্য প্রকার সার প্রয়োজন করে না, গাছের মূলে কেবলমাত্র ছাই ঢালিয়া দিলেই গাছ সতেজ হইয়া উঠে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র লাগে, এরূপ স্থানে গাছ ভাল হয় না। ছায়াযুক্ত জমিতে উহার উত্তম চাষ আবাদ হইয়া থাকে।

গাইট সমেত লতার কিছু অংশ কাটিয়া ভূমিতে রোপণ করিলেই গাছ হইয়া থাকে। চৈ আহারে কটু স্বাদযুক্ত।

পুদিনা।

চাট্‌নী জন্য পুদিনার অত্যন্ত আদর। পুদিনা বেশ জারক। সামান্য যত্নে এই শাক জন্মিয়া থাকে। বিলাতে বিনা চাষে স্বাভাবিক জন্মিতে দেখা যায়।

টবে ও ক্ষেত্রে উভয় স্থানেই পুদিনা জন্মিয়া থাকে। পুদিনার চাষ করিতে হইলে কাঁকর, ভাঙ্গা খোলা এবং ইটের কুচি নীচে পাতিয়া তাহার

উপর বেলে মাটী দিতে হয়। উহা একটু উচু হইলে ভাল হয়। এই মাটীর উপর পুদিনার ডগা কিম্বা শিকড় কাটিয়া পুতিয়া দিলেই পুদিনা জন্মিয়া থাকে। পুদিনা গাছে মধ্যে মধ্যে জল দিতে হয়।

প্রতি গৃহস্থের গৃহে দুই একটী ঝাড় পুদিনার গাছ রোপণ করিয়া রাখা ভাল। কারণ উহা দ্বারা আহার ও ঔষধ উভয় প্রকার কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

পুঁই শাক।

গৃহস্থ গৃহে বিনা যত্নে পুঁই জন্মিয়া থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পুঁই পুতিতে হয়। গোবরের সার হইলেই উত্তম পুঁই জন্মিয়া থাকে। এজন্য প্রত্যেক মাদায় এক ঝুড়ি গোবরের সার দিয়া তাহাতে চারি পাঁচটী বীজ রোপণ করিতে হয়। চারা বড় হইলে মাচা কিম্বা চালে উহার ডগা তুলিয়া দিতে হয়। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুসিয়া এবং তৃণাদি পরিষ্কার করিয়া দিলেই উহার পাইট করা হইল। তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পাইট প্রয়োজন হয় না। পুঁইয়ের ডগা যত কাটা যায়, ততই উহা বাড়িয়া উঠে।

কলার আবাদ।

কলার-চাষে বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। কলার পাতা, থোড়, মোচা এবং ফল সমুদায়ই আয়-জনক। এজন্য দেশ মধ্যে একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

কলা রুয়ে না কেট পাত।
তাইতে কাপড় তাইতে ভাত॥

বাস্তবিক একটী কলা বাগান দ্বারা একটী গৃহস্থের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। তবে যে পাতা কাটিতে নিষেধ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই, পত্র কাটিলে গাছে ফল ধরিতে বিলম্ব হইয়া থাকে। পাতা অপেক্ষা ফল বিক্রয় দ্বারা লাভ অধিক হয়।

বঙ্গদেশের মধ্যে অধিকাংশ স্থানেই কদলী জন্মিয়া থাকে, তবে সকল স্থানে ফলন সমান হয় না। মাটীর দোষ গুণানুসারে যে, এইরূপ ফলনের তারতম্য হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। তোলা মাটিতেই কলার চাষ উত্তম হইয়া থাকে। এজন্য প্রায় দেখা যায়, পুষ্করিণী প্রভৃতি খাদ করিয়া সেই তোলা মাটিতে কলার চাষ করিলে যেমন ফলন হইয়া থাকে, অন্য স্থানে সেরূপ হয় না।

যে মৃত্তিকা রস হীন, শুষ্ক এবং বালুকাময় তথায় ভালরূপ গাছ হয় না। যদিও গাছ হইয়া থাকে, কিন্তু গাছের বৃদ্ধি এবং ফলন সামান্যরূপ হইয়া থাকে।

বৎসরের মধ্যে সকল সময় কদলী রোপণের পক্ষে প্রশস্ত নহে। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত কলার চাষের ঠিক উপযুক্ত সময়। বোধ হয় তজ্জন্য চাষারা কহিয়া থাকে।

ডাক ছেড়ে বলে রাবণ।
কলা পোত আষাঢ় শ্রাবণ॥

সকল প্রকার চাষেরই এক একটি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, সেই সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চাষ করিলে লাভের আশা করা যাইতে পারে। কলার বাগান করিতে হইলে চারি ধারে পগার দিয়া ক্ষেত্রে এক হাত উচ্চ করিয়া মাটি ফেলিতে হয়। পরে সেই মাটি ভাঙ্গিয়া জমি তৈয়ার করিতে হয়। মাঠে কলার আবাদ করিতে হইলে লাঙ্গল দিয়া ভূমি কর্ষণ করিয়া লইলে ভাল হয়।

ভূমি প্রস্তুত হইলে শারি করিয়া গাছ রোপণ করা উচিত। কলার ছোট ছোট তেউড় অর্থাৎ চারা তুলিয়া আনিয়া পুতিতে হয়। রোপণের পর চারা লাগিয়া গেলে গাছের গোড়া কাটিয়া জমিতে একবার চাষ দেওয়া ভাল। এইরূপ কাটিবার তাৎপর্য্য এই যে, তদ্বারা গাছ ছোট ছোট হইয়া থাকে এবং উহা বেশ ঝাড়ল হইয়া উঠে। গাছের স্বাস্থ্য অনুসারে যে, ফলন নির্ভর করিয়া থাকে, তাহা যেন মনে থাকে।

প্রথমে একটী তেউড় পুতিলে পরে তাহার মূল হইতে আবার চারা

বাহির হইয়া কলার ঝাড় হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক ঝাড়ে অধিক গাছ রাখা উচিত নহে। সচরাচর দেখা যায়, প্রায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কলা বাগান বেশ তেজাল থাকে, তাহার পর উহা হীন-তেজ হইয়া পড়ে। তখন ফলন অধিক হয় না। এজন্য ক্রমান্বয়ে এক স্থানে চাষ না করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন অথবা ক্ষেত্রস্থ সমুদায় গাছ মারিয়া পুনর্ব্বার তাহাতে মাটী তুলিয়া নূতন নূতন চারা রোপণ করা ভাল।

ঝাড়ের মধ্যে যে গাছটিতে ফল ধরিয়া থাকে, ফল পাকিলে ঐ গাছের মূল সমেত উৎপাটন করিয়া ফেলা উচিত।

কোন কোন গাছের ফলে এক প্রকার কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেই তাহাকে "মশা খাওয়া" কহিয়া থাকে; বাস্তবিক তাহা মশা খাওয়ার জন্য দাগ হয় না; যে সকল গাছের গোড়ায় অপরিষ্কার তৃণাদি জন্মিয়া থাকে, সেই সকল গাছের ফলে ঐরূপ দাগ হইতে দেখা যায়। ফলতঃ গাছের ভালরূপ পাইট করিলে ঐরূপ হইবার কোন কারণ থাকে না।

অন্যান্য চাষের ন্যায় কলার চাষেও জমিতে সার দিতে হয়। বোদ মাটি ও ছাই কলার পক্ষে উত্তম সার। এজন্য গাছ পুতিবার সময় বোদ মাটির সার দিয়া উহা রোপণ করিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে গাছের মূলে ছাই দিলে গাছের তেজ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কলা বৎসরের মধ্যে সকল সময়ই ফলিয়া থাকে, কিন্তু সকল সময় উহা সুস্বাদু হয় না। গ্রীষ্ম হইতে বর্ষা পর্য্যন্ত উহার যেমন আস্বাদন হইয়া থাকে শীত কালের ফলে সেরূপ আস্বাদন হয় না।

বাগান ভিন্ন গৃহস্থের গৃহে দুই এক ঝাড় কলার গাছ থাকিলে সর্ব্বদা উপকারে লাগিয়া থাকে। এজন্য আবাস বাটীর নিকট কোন একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় উহা রোপণ করা উচিত। বিশেষ যত্ন না করিয়া অমনি পুতিয়া দিলেও কলার গাছ হইতে পারে। কিন্তু অযত্ন করিলে আশানুরূপ ফল লাভ হয় না।

কলা দুই প্রকার অবস্থায় আমাদের ব্যবহারে লাগিয়া থাকে; অর্থাৎ কোন কোন জাতি কাঁচা অবস্থায় ব্যঞ্জনে লাগিয়া থাকে, অপর কতকগুলি

সুপক্ক হইলে খাদ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ফল অতি সুখাদ্য সুমিষ্ট। কাঁচকলা অতি পুষ্টি-কর তরকারী।

নানা জাতি কদলী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গদেশের সকল স্থানে ঐ সকল চাষ হয় না। কোন জাতীয় কদলী প্রায় এক হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। কলার মধ্যে যে সকল কলা উৎকৃষ্ট তৎসমুদায়ে প্রায়ই বীজ বা বিচি হয় না। মর্ত্তমান, অনুপম, রামকলা, মানভোগ, চম্পক বা চাঁপা, চিনি চাঁপা, কনাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, পিনাং প্রভৃতি কদলী অতি উপাদেয় এবং বীজ-শূন্য।

আর কতকগুলি পক্ক অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের আস্বাদন তত ভাল নহে এবং ফলে বীজ দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন কাঁচকলা প্রভৃতি যে সকল কলা ব্যঞ্জনে ব্যবহার হইয়া থাকে, তৎসমুদায় পাকিলে ভাল লাগে না। ফলতঃ উহা তরকারীর পক্ষেই ভাল।

কোন কোন জাতীয় কদলী হিন্দুদিগের নিকট অতি পবিত্র জ্ঞানে দৈব-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৈদ্যক মতে পক্ক কদলীর গুণ যথা—কষায়ত্ব, মধুরত্ব, বলকারিত্ব, শীতলত্ব, পিত্তনাশিত্ব, সদ্যঃ শুক্র বিবর্দ্ধনত্ব, ক্লম-তৃষ্ণা-হরত্ব, কান্তি দাতৃত্ব। কফা-ময়কারিত্ব।

সামান্য ব্যয়ে এবং সামান্য পরিশ্রমে কলার চাষ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ গৃহস্থদিগের উহা যেমন নিত্য ব্যবহারে লাগিয়া থাকে, তাহাতে উহার চাষে অবহেলা করা কখনই উচিত নহে।

—:০:—

অশ্ব শাসন।

অশ্ব যেরূপ আমাদের উপকারী পশু তাহাতে তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করা কোনমতেই উচিত নহে। তবে কেহ কেহ দুষ্ট স্বভাব অশ্বকে বশীভূত করিতে নানা প্রকার দণ্ড দিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় দণ্ড না দিয়া সংব্যবহার করিলে অতি সহজেই অশ্ব বশীভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ কথায় কথায় অশ্বকে কশাঘাত না করিয়া অগ্রে সংব্যবহার দ্বারা

তাহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। এবং যখন দেখা যাইবে সাধু ব্যবহারে তাহার দোষ সংশোধন হইবার কোন উপায় নাই, তখন তাহাকে কশাঘাত করিয়া বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবে। নতুবা সামান্য দোষ-জনিত অপরাধে সর্ব্বদা প্রহার করিলে অশ্বের স্বভাব মন্দ হইয়া উঠে।

কোন প্রকার অপরাধ জন্য অশ্বকে প্রহারের প্রয়োজন হইলে তাহাও আবার তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিবেচনা করিয়া প্রহার করা উচিত। যে যে অপরাধে অশ্বকে প্রহার করিবার ব্যবস্থা আছে, সাধারণের অবগতি জন্য নিম্নে সেই সকল দোষ উল্লেখ করা হইল।

(ক) আরোহীর ইচ্ছার বিপরীত বল প্রকাশ করিলে।

(খ) ভয় বা দুষ্টামী করিয়া নির্দ্দেশিত পথে গমন কবিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে।

(গ) হ্রেষা রব করিলে।

(ঘ) ক্রোধ বশতঃ উদ্ধতভাব প্রকাশ করিলে।

(ঙ) গমনকালে উন্মত্ত ভাব অবলম্বন করিলে।

(চ) যথোপযুক্তরূপে আরোহীর আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইলে।

যে কয়েকটী অপরাধ উল্লেখ করা হইল, এই সকল অপবাধে অশ্বকে প্রহার কবিতে আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু আবশ্যক হয় বলিয়াই যে, নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে হইবে তাহাও কর্ত্তব্য নহে।

অশ্ব যখন আরোহীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রকাশ করিতে থাকিবে, তখন তাহার জানুদ্বয়ে প্রহাব করিলে তাহার সে দোষ ঘুচিয়া যাইবে।

আরোহী যখন দেখিবেন অশ্ব ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে; তখন তাহার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিবেন, তাহা হইলে সে শান্তভাব ধারণ করিবে।

ভয়প্রাপ্ত হইলে অশ্বের পশ্চাৎ ভাগে প্রহার করিতে হইবে।

উন্মত্তবৎ হইলে তাহার উদরে প্রহার করিয়া তাহার সে দোষ পরিহার করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

আর গমনকালে অশ্ব ঊর্দ্ধমুখ হইয়া উঠিলে তাহার মুখে আঘাত করিতে হয়।

অশ্বকে হ্রেষারব করিতে দেখিলে তাহার মস্তকে প্রহার করিয়া সেই দোষের পরিহার চেষ্টা করিবে। কিন্তু এবিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

জয়দত্ত কৃত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উক্ত অপরাধে মস্তকে প্রহার করিতে বিধান আছে, কিন্তু আধুনিক ইয়ুরোপীয়দিগের মতে অশ্বের মস্তকে কোন প্রকার আঘাতের ব্যবস্থা নাই, তাঁহাদিগের মতে কোন প্রকার অপরাধেই অশ্বের মস্তকে আঘাত করা উচিত নহে। কারণ মস্তকে আঘাত করিলে তাহার মস্তিষ্কে আঘাত লাগিয়া বুদ্ধি বিচলিত হইতে পারে।

অনেকের মনে এরূপ ধারণা যে, অশ্বকে গুরুতর আঘাত করিলেই সে সহজে বশীভূত হইয়া আসিবে। এই কুসংস্কারে অনেকেই অশ্বের চরিত্র দূষিত করিয়া তুলেন। যে যে অপরাধে অশ্বের যে যে অঙ্গে প্রহারের বিধি উল্লেখ করা হইল এতদ্ব্যতীত তাহার অন্য কোন অঙ্গে কোন অপরাধের জন্য প্রহার করিলে কোন ফলোদয় হইবে না।

অশ্বকে শিক্ষা দিলে মনুষ্যের ন্যায় অনেক বিষয় শিখিতে পারে। কিন্তু সেই শিক্ষা যত্ন, অধ্যবসায় এবং ভালবাসা সাপেক্ষ। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, সার্কসে অর্থাৎ অশ্ব ক্রীড়ায় যে সকল অশ্ব শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহারা কেমন চমৎকার সুশিক্ষার পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু যদি কেবলমাত্র প্রহারের উপর ঐ শিক্ষা নির্ভর করিত তাহা হইলে কখনই তাহারা ঐ প্রকার শিক্ষা লাভ করিতে পারিত না। সৎব্যবহারই যে, শিক্ষার প্রধান উপায় তাহা মনে করিয়া শিক্ষা দিতে হয়। অশ্ব অত্যন্ত প্রভুভক্ত; সুতরাং প্রভু তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবেন, সেও সেই-রূপ আচরণ করিবে তাহা যেন মনে থাকে।

অশ্ব কোন প্রকার অপরাধ করিতে উদ্যত হইলে দেখা উচিত, কি কারণে সে সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে কারণে সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতেছে, অগ্রে যদি সেই কারণ নিবারণ করা যায়, তবে অনেক স্থলে আদৌ প্রহারের প্রয়োজন হয় না। কোন কোন স্থলে এরূপ দেখা যায়, অত্যল্প আহার প্রাপ্তি কিম্বা সাধ্যাতীত কার্য্যে অশ্বকে নিযুক্ত করিলে তাহা

দ্বারা সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে না, সুতরাং সেরূপ স্থলে তাহাকে প্রহার করা নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য। ফলতঃ অশ্বের প্রতি কোন প্রকার অবৈধ ব্যবহার করা উচিত নহে।

সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী অতি উৎকৃষ্ট অপর শ্রেণী নিতান্ত নিকৃষ্ট। উত্তম জাতীয় অশ্বকে প্রায়ই কোন প্রকার প্রহারের প্রয়োজন হয় না। নিকৃষ্ট জাতীয় অশ্বকে প্রহার করিতে হয়। এজন্য কোন্ অশ্ব কোন্ শ্রেণীর তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। ভাল জাতীয় অশ্বকে প্রহার করিলে তদ্বারা কুফলই ফলিয়া থাকে।

অশ্বের শারীরিক অবস্থা ও কার্য্য ক্ষমতা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া প্রহারের ব্যবস্থা করা উচিত। ফলতঃ কেবলমাত্র প্রহারের উপর যে, অশ্বের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে না, তাহা মনে রাখিয়া অশ্বের শাসন বিধান করা আবশ্যক।

অশ্বের শয্যা রচনা।

অশ্বের শ্রান্তি দূর ও শরীর পরিষ্কারের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। ভালরূপ শয্যা রচনা করিয়া না দিলে অশ্ব ধূলাতে অবলুণ্ঠিত হইয়া শরীর ময়লা করিয়া থাকে। অপরিষ্কৃত দেহে সুনিদ্রা হয় না। এজন্য প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অশ্বের শয্যা রচনা করিয়া দিতে হয়। শয্যার জন্য শুষ্ক অথচ কোমল তৃণই প্রশস্ত।

উল্লিখিত তৃণাদি দ্বারা অন্যূন সাত ইঞ্চি পুরু করিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়; অনেক অশ্বপালককে দেখা যায়, তাহারা কোন প্রকার যত্ন না করিয়া কতকগুলি তৃণ অর্থাৎ ঘাস ও বিচালী প্রভৃতি ছড়াইয়া দেয় কিন্তু তদ্বারা অশ্বের আরাম বোধ হয় না। এজন্য যে স্থানে অশ্ব মস্তক রাখিয়া থাকে, সেই স্থান এবং উভয় পার্শ্ব কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া মধ্য ও পশ্চাৎ স্থল অল্প ঢালু করিয়া দিলে ভাল হয়।

পূর্ব্ব রাত্রে অশ্ব যে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে, পরদিন প্রাতে তাহা তুলিবার সময় যে সকল অংশ ময়লা হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে।

এবং অবশিষ্ট পরিষ্কৃত তৃণাদি তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া শয্যার জন্য রাখিতে হয়। এইরূপ নিয়মে প্রতিদিন শয্যা রচনা ও তুলিতে হয়।

যাঁতা ঘরে অশ্ব থাকিলে শয্যা সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্বের মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে; এরূপ মূল্যবান উপকারী পশুর জীবন সুরক্ষা করিবার জন্য তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়।

মুষ্টিযোগ।

আমাশয়।—ডালিমের খোসার গুঁড়া ও জিরা সমান পরিমাণে সেবন করিলে, রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

আদা ও কাল তুলসী বাটিয়া সম পরিমাণ তিনটী বটীকা করিয়া প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে হীম জলের সহিত সেবন করিবে।

আধ তোলা কাশীর চিনি ও আধ তোলা উত্তম ধূপ চূর্ণ একত্র মিশাইয়া, দুই তিন দিন সেবন করিলে আমাশয় ভাল হয়।

খালি পেটে কচি তেঁতুলপাতার ঝোল আধপোয়া, দুই তিন দিন সেবন করিবে।

ছাগ দুগ্ধ ও জামপাতার রস প্রত্যেক এক ছটাক মাত্রায় দুই তিন দিন খাইবে।

কুরচির ছাল এক তোলা, দাড়িমের ছাল এক তোলা, শাচি শাক এক তোলা, পুরাতন আমশি এক তোলা, আধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া, প্রাতে ও বৈকালে মধুর সহিত সেবন করিবে।

একপোয়া ঘোলের সহিত সিকি তোলা আফুলা মানকচুর শিকড় পেশন করিয়া সেবন করিবে; এইরূপ দুই তিন দিন খাইবে।

থানকুনি পাতার রস পাথরে লইয়া তাহাতে একটা জায়ফলের খানিকটা ঘর্ষণ করিয়া অল্প অহিফেণ মিশাইয়া নাভীর চারিদিকে প্রত্যহ

৩।৪ বার প্রলেপ দিলে, পেটের বেদনা ভাল হয় ; আমাশয় ও রক্ত আমাশয়েও বিশেষ উপকারী।

পায়ের গোড়ালি বা পায়ের তলায় অত্যন্ত বেদনা হইলে, গরম উনানে বা গরম ইটের উপর পা চাপিয়া ধরিলে ভাল হয়।

রক্তস্রাবে ও রক্ত কাশে যজ্ঞ ডুমুর ও পুরাতন দেশী কুমড়া ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে উপকার হয়।

উৎকাশি হইলে তেজপত্র তামাকের ন্যায় সাজিয়া খাইলে উপকার দর্শে।

পিঁপুলের জড়, আধসের জল ও অল্প মিছরির সহিত সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সন্ধ্যার পর একবার খাইবে, দুই তিন দিন খাইলে উৎকাশি ভাল হয়।

লবঙ্গ খৈ করিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে জিহ্বায় রাখিবে।

শুট, পিঁপুল, মরিচ একত্র সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ সন্ধার পর খাইবে, ২।৩ দিনেই উৎকাশি ভাল হইবে।

ভুঁই কুমড়ার মূলবাটা গব্য দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে স্তনের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। মহা সুন্দরীর মূলেও ঐরূপ উপকার হইয়া থাকে।

বাধক বেদনা।—ছোলঙ্গ লেবুর রস খাইলে বাধক ভাল হয়।

ঋতুকালে পাণি শিউলির মূল বাটিয়া সেবন করিলে উপকার হয়।

অনন্তমূলের মূল, রক্তশালী ও তণ্ডুল বাটিয়া কাঁজি ও দুগ্ধের সহিত ঋতুর সময় সেবন করিলে বাধক বেদনা সারিয়া থাকে।

বাত।—এক হাঁড়ি জলে এক সের গোলআলু সিদ্ধ করিয়া এই জল গরম থাকিতে থাকিতে তাহাতে বেতো অঙ্গ ডুবাইয়া রাখিবে, পরে সেই অঙ্গ ঢাকিয়া নিদ্রা গেলে বাত ভাল হয়।

ঘোলের সহিত কোতরা গুড় মিশাইয়া সেবন করিলে বাতের উপকার হয়।

ঈশ্বর মূল ২১ একুশটী মরিচের সহিত কিছু দিন সেবন করিলে বাতের উপশম হইয়া থাকে।

প্রসব।—শিরীষের মূল, বাকসের মূল অথবা নিসিন্দার মূল ইহার মধ্যে যে কোন মূল উপাড়িয়া আনিয়া কোমরে বাঁধিলে শীঘ্র প্রসব হয়।

কাটা ও আঘাতজনিত রক্ত স্রাব।—গঁদ বা বাবলার আঠার গুঁড়া লাগাইয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

ফট্কিরির গুঁড়া লাগাইয়া দিলেও রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

তামাকের পাতা লাগাইয়া দিলেও রক্ত থামিয়া যায়।

ডিমের ভিতর যে শাদা পর্দ্দা থাকে, তাহাও কাটা স্থানে লাগাইয়া দিলে রক্তস্রাব থামিয়া যায়।

বাগ ভেরাণ্ডার আটা দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

জোঁক ধরিলে এবং দাঁত পড়িলে রক্তস্রাবের পক্ষেও এই সকল ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

মাথা গরম।—মাথা গরম অর্থাৎ মস্তক হইতে এক প্রকার তাপ নির্গত ও জ্বালা বোধ হইলে আমলা ঘৃতে সামান্যরূপ ভাজিয়া তাহা জলে কাদার ন্যায় বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে আরাম হয়।

কোন কোন স্থলে আমলা আদৌ না ভাজিয়া কেবলমাত্র জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হইতে পারে।

ঘৃতকুমারী গাছের শাঁস মাথায় প্রলেপ দিলেও উপশম হইয়া থাকে।

মাথার গরম নিবারণের পক্ষে শীতল জলের পটিও বিশেষ উপকারজনক।

চুলকানি। শ্বেত চন্দন বাটিয়া তাহাতে তেঁতুল গুলিবে, এই তেঁতুল গোলা চুলকানি নাশের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

নারিকেল তৈলে কর্পূর মিশাইয়া অল্প পরিমাণে গরম করিয়া মাখিলে চুলকানি ভাল হয়।

নারিকেল তৈলে অল্প পরিমাণে গাঁজা ও চালমুগরার ফলের খোসা দিয়া আগুণে খুব ফুটাইতে হইবে। অনন্তর অল্প গরম থাকিতে থাকিতে মাখিলে চুলকানি ও খোস বা পাচড়া ভাল হইবে।

গাত্রে গো মূত্র মাখিলেও চুলকানি ভাল হয়।

নিমপাতা ও হরিদ্রা বাটিয়া গায়ে মাখিলে চুলকানি ভাল হইয়া থাকে।

স্তন দুগ্ধ শোধন।—মুগ্দ মূষ বা বামনহাটী, দারু ও বচ অতিবিষের স
পেষণ করিয়া পান করা উচিত। পাঠা, মূর্ব্বা, মুতা, চিরতা, দারু, ং
অনন্তমূল ও কটকী এই কয় দ্রব্যের কাথ সেবন করিলেও স্তন্য বিশুদ্ধ
স্তন্য শুদ্ধির জন্য পটোল, নিম্ব, আসন (ঔষধি বিশেষ) দারু, পাটা, মূ
গুলঞ্চ, কট্‌কী ও নাগর এই কয়টী দ্রব্য জলে মিশাইয়া কাথ প্রস্তুত করি
সেই কাথ সেবন করিলেও স্তন্য শুদ্ধি হয়।

স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধি।—ভূমি কুষ্মাণ্ডের রস কিম্বা উক্ত কুষ্মাণ্ড চূর্ণ দুগ্ধের স
পান করিলে স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শালি বা ষাট্‌ ধান্য, মাংস ও ক্ষুদ্র মৎস্যের যূষ, কাল শাক, অল
(লাউ) নারিকেল, কেশুর, পাণিফল, শতাবরী, ভূমি কুষ্মাণ্ড, গোধূম
লশুন প্রভৃতি সেবন করিলে স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

বিবিধ তত্ত্ব।

মছলন্দ মাদুরের রং ময়লা হইলে পাতি, কাগজী কিম্বা গোঁড়া (
ফালি ফালি করিয়া কাটিয়া সেই কাটা মুখ মাদুরের উপর ঘসিবে।
একখানি শুকনা নেকড়া দ্বারা তাহা পুঁছিয়া ফেলিলে আবার নূতনের ন্যায়
রং হইবে।

গাভী পরীক্ষা।—মস্তক পরিমিত, লোম সমূহ চাকচিক্য, কটি ও বক্ষ
প্রশস্ত, উদর স্থূল, চর্ম্ম কোমল, লাঙ্গুল পরিমিত আর ওলান ও স্তন
এই সকল লক্ষণাক্রান্ত গাভী প্রায়ই দুগ্ধবতী হইয়া থাকে।

কুমারী পত্রকে নৈব দত্তঞ্চ লবণং হর। তুরঙ্গম কেশরাণাং কণ্ডুমুৎ-
সাদ হত

লবণের সহিত কুমারীর পাতা [illegible] খাওয়াইলে অ
গাত্র শু অর্থাৎ চুলকানি ভাল হয় এবং দেহ সুন্দর হইয়া থাকে।